শ্যামলীর স্বপ্ন

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

লিকাতা-১২

াকর—জিতেন্দ্রনাথ বসু

প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

মোহনবাগান লেন,

াতা-৪

াট-পরিকল্পনা

ন্দ্যোপাধ্যায়

োঙ্গল বাইণ্ডাস

কা

আট

টেলিফোনের ঝঙ্কনায় পরদিন সকালে সুধাংশুর ঘুম ভাঙলো। তাড়াতাড়ি উঠে ফোন ধ'রে সে জানলো দিল্লী থেকে নরেন তাকে ট্রাঙ্ক কল্ করছে। সুধাংশু বললে, হ্যাঁ, আমিই ধরেছি।

ফোনে অতি দ্রুতভাষায় নরেন জানালো, সরকারী চুক্তির যে সব শর্ত তা তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তাছাড়া সাক্ষী সাবুদ রেখে তোমার হাতের সই দরকার। কিন্তু এদিকে সময় আর একেবারেই নেই। বলো তোমার কি হুকুম?

সুধাংশু বললে, আমাকে কি যেতে বলছ?

সেইটি সব চেয়ে ভালো। আজ সকালের গাড়িতে যদি তুমি রওনা হও, তবে কাল সকালে দিল্লী পৌঁছবে। কাজটা কালই হ'তে পারে। পরশু এগুরুজ সাহেব বম্বে চলে যাবে। তুমি বেলা দশটার গাড়িতেই বেরিয়ে পড়ো।

নরেন ফোন ছেড়ে দিল।

সুতরাং সুধাংশুর আর নিশ্বাস ফেলবার সময় রইলো না। সে তখনই ফোন করলো হাওড়ায় ফার্স্ট ক্লাসের একটি সিট রিসার্ভ করার জন্য। উত্তর এলো, তথাস্তু।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে পদ্মাবতী ও সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ব্যাগ-বিছানা সমেত সুধাংশু বেরিয়ে পড়লো। চাকর গেল সঙ্গে। এবং সেই যে সে বেরুলো তারপর দিন আষ্টেক আর তার কোনো খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। একদিন সকালে যখন সে ফিরে এসে বাড়ির দরজায় নামলো তখন তার সঙ্গে নরেন। নরেন সটান এসে তার মনিব-

পত্নীর উদ্দেশে লম্বা প্রণাম ঠুকলো। বললে, বৌদিদি, দুরাত্মা পামর আবার চড়াও হোলো আপনার তপোবনে। তাকে আশীর্বাদ করুন।

পদ্মাবতী হাসিমুখে বললে, আশীর্বাদ [illegible] আপনার সুমতি হোক।

আরাম কেদারায় বসে সুধাংশু হেসে [illegible]লো। নরেন বললে, বৌদিদি, আপনার আশীর্বাদটা ফললে কিন্তু আমার সর্বনাশ। সুমতি হওয়া মানেই সংসার করা। কিন্তু তেমন দুর্মতি ভগবান নিশ্চয় আমায় দেবেন না!

পদ্মাবতী বললে, তার মানে?

মানে—লক্ষ্মীছাড়া বলেই তো সমাজে আমার এত প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্মীমন্ত হওয়া মানে ঘরকুনো। বৌদিদি, সময় থাকতে সুমতি আমার হয়নি বলেই পাঁচ জায়গায় কল্‌কে পাই। পাঁচজনের কাজে লাগতে পারি।—এবার একটু প্রসাদ দিন, খেয়ে চলে যাই মনিবের কাজে।

নীনা গুপ্তার ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয়নি—মাঝখানে আটটা দিন বিদেশ যাওয়ার গোলমালে কেটে গেছে। সুধাংশুর সঙ্গে নীনার প্রয়োজনটা কি ধরনের ছিল, সে কথাটা জানার জন্য নরেন গেল আগে।

নরেনকে দেখেই নীনা একেবারে গরম হয়ে উঠলো। বললে, টাকা দিয়ে যারা ভালোবাসা কেনে, তাদের জানা উচিৎ, সময় মতো টাকা না আনলে ভাঁড়ার ফুরিয়ে যায়।

নরেন হাসিমুখে বললে, দেবি, প্রসন্ন হও। আমার ওপর তুমি রাগ করেছ সেই তো আমার গৌরব। এখন দয়া করে ব[illegible] কি হুকুম। এই যে, যোগেন ডাক্তার এসেছিলো দেখছি, স্টেথিস্[illegible]টা ফেলে গেছে। —যাকগে, দেবি, আজ আমায় পায়ে ঠাঁই দাও।

তোমার এই বিনীতভাব আমার দুচোখের বিষ।

নরেন বললে, জানো নীনা, সত্যিকার রাগ হোলো সত্যিকার ভালোবাসার লক্ষণ?

নীনা বললে, ভূমিকা তোমার যেমনই হোক, আজ তুমি ঘর থেকে বেরোও। আজ তোমার পালা নয়।

বটে! পাদমেকং ন গচ্ছামি—এই আমার বৃন্দাবনের কুঞ্জ রইলুম আঁকড়ে। প্যাণ্টের ফাঁকে দেশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে দিলেও বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য এক পাও নড়বো না। শুকনো কাঠে আজ ফুল ফুটিয়ে তবে বিদায় নেবো।

নীনা বললে, ছেলেমানষী ক'রো না। এখনই লাহুরাম এসে পড়বে, তোমাকে দেখলে আর রক্ষে নেই!

নরেন মুখ তুলে বললে, শুনেছি হুচারদিন তোমাদেরও শরীর খারাপ হয়—আজ সেই ছুতোয় লাহুরাম বেটাকে তাড়াও না।

নীনা হাসিমুখে বললে, অত নির্বোধ লাহুরাম নয়, সে ঝুনো লোক। পাঁচদিন আসে, পাঁচশো টাকা ঢালে সব খবর রাখে।

ঠিক সেই সময় বাইরে কে কড়া নাড়লো, এবং তারপরই চাকর এসে খবর দিল, লাহুরামের আবির্ভাব ঘটেছে।

নীনা হাত নেড়ে বললে, অশান্তি বাধিয়ো না, বাথরুমের সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি নেমে যাও—যাও?

না—বলে নরেন কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

যাবো না আমি—বলে নরেন সহসা নীনার হাত ধরে বললে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! আজ তোমাকে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রণয়কাণ্ডে লিপ্ত হতে দেবো না। বাঙ্গালীতেই আজ চলুক; এসো আমার সঙ্গে, যা বলি তাই করো।—এই বলে নীনাকে পশমী সোফায় শুইয়ে দিয়ে বললে, চুপ, চোখ বুজে ম্লান হয়ে থাকো, মাঝে মাঝে কাৎরে ওঠো, চুলগুলো খুলে দাও, কাপড় চোপড় একটু আলুথালু করো, বাঁ হাতখানা ঝুলিয়ে রাখো আধমরা সাপের মতন।—ওরে, বিরিজলাল, একটা আলো নিবিয়ে দে, ঘরখানা আবছায়া হোক।

নরেন একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো তার সামনে। তাড়াতাড়ি ছুটো শিশি সংগ্রহ ক'রে রাখলো টেবিলে, এবং স্টেথিস্কোপটা হাতে নিয়ে রোগীর ওপর ঝুঁকে পড়লো। চুপি চুপি চাকরকে বললে, কে এসেছে ডেকে আনো।

উচ্ছলিত পদক্ষেপে লাছুরাম ভিতরে এসে এই দৃশ্য দেখেই সহসা থমকে দাঁড়ালো। রোগিণী অর্ধ অচেতন, আকস্মিক হৃদ্‌রোগে অবসন্ন। ডাক্তারের ভূমিকায় নরেনের অভিনয় হতে লাগলো নিখুঁৎ, নীনা গুপ্তার চোখেমুখে ম্লানিমা।

লাছুরাম কুণ্ঠিত প্রশ্ন করলো, ক্যা হুয়া উন্‌কো, ডাক্তার-সাব?

নরেন নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে বললে, আপ কৌন হ্যায়?

কুচ নেই,—দোস্তি হ্যায়—ব্যস।

নরেন বললে, রোগীকা উপর হামলা নেই করনা চাহিয়ে। ইন্‌কা ব্লড্‌প্রেসার চড় গিয়া। ছাতিমে ভি কুচ দরদ মালুম হোতি হ্যায়। আপ আভি যাইয়ে।

ব্যবসায়ী মাড়োয়ারি রইলো দাঁড়িয়ে। নরেন ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে বললে, আপনার নামই কি লাছুরাম?

জি, হাঁ।

ও, তবে ঠিকই হয়েছে। আপনার কাছে উনি শ' ছুই টাকা চাইছিলেন চিকিৎসার জন্যে—

উন্‌কা মেহেরবাণী!—এই বলে লাছুরাম পকেট থেকে তখনই ছুশো টাকা বার করে রোগীর মাথার কাছে রাখলো।

এমন সময় রোগী ধীরে ধীরে চোখ খুললো। শীর্ণ হাসি হেসে চোখ-ভরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, লালাজী, ভারি কষ্ট হোলো তোমার, কিন্তু কি করবো······অন্তত এক সপ্তাহ না গেলে বোধ হয় উঠতে পারবো না—

ডাক্তার সাহেব তখন অভিনিবেশ সহকারে প্রেসক্রপসন লিখছিলেন।

লাতুরামের প্রতি অতি স্নেহে নীনা একবার হাতখানা নাড়লো। সে হাত যেন যাদু জানে। লাতুরাম তখনই নতজানু হয়ে মেঝের উপর ব'সে সেই হাতখানি নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, নেই, নেই, তুমকো আমি ভুলবে না, আমার জন্যে কাঁদিয়ো না, হামি ঠিক আসবে সাত দিন পরে।

নীনা অতি কাতর কণ্ঠে বললে, সাত দিন! সাত দিন তোমাকে না দেখলে আমি কি বাঁচবো, লাতু?

উ হুঁ হুঁ—মেরে জান!—ব'লে কেঁদে উঠে লাতুরাম নিজের চোখে রুমাল চাপলো।

ডাক্তারসাহেব বলতে এবার বাধ্য হলেন, হৃদ্‌রোগের সময় হৃদয় নিয়ে কাঁদাকাঁদি বিপজ্জনক। লালাজী, দয়া ক'রে আপনি বিদায় নিন, আপনি কাছে থাকলে রোগী আরও চঞ্চল হয়ে উঠবে।

চোখে অশ্রু এবং প্রাণে অসীম পরিতৃপ্তি নিয়ে লাতুরাম পুনরায় পকেট থেকে আর এক শ' টাকা বা'র ক'রে দিয়ে বললে, এ টাকাও থাক্, ভারি অসুখ, দরকার লাগতে পারে। আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবো।

এই ব'লে সে বিদায় নিল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর প্রাণে আনন্দের ঢেউ তুলে। দুজনে উঠে ব'সে তাকালো দুজনের দিকে হাসিমুখে।

নরেন বললে, দেখলে তো 'ভালো ডাক্তারের হাতে পড়লে আধমরা রুগীও শুয়ে শুয়ে রোজগার করে। নাও, টাকা তোলো। চেয়ে আছ যে?

নীনা বললে, চোখে এবার নেশা লাগছে তোমাকে দেখে।

ওই নেশায় ফুল ফুটবে কি?

নিশ্চয় ফুটবে—এসো। ব'লে উঠে নীনা তা'র হাত ধরলো।

নরেন বললে, কোথায় ?

নীনা হেসে বললে, চিতাশয্যায় ! মরিব মধুর মোহে দেহের দুয়ারে !

এমন সময় একটা অস্ফুট কলরব কানে আসতেই দুজনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। নীনার নাম ধ'রে পাশের ফ্ল্যাট থেকে কে যেন চিৎকার করছে।

দরজা খুলে নীনা বেরিয়ে গেল, এবং মিনিট তিনেক পরেই ফিরে এসে বললে, তা আমি কি করব, আমার কোনো দায় নেই। দোষ করেছে, নৈলে পুলিসে ধরা পড়বে কেন ?

নরেন বললে, কে ধরা পড়লো পুলিসে ?

সেই যে শ্যামলীর কাছে আসে সেই লোকটা—নাম বিনয় - তাদের দুজনকেই ধ'রে নিয়ে গেছে থানায়।

ধ'রে নিয়ে গেছে শ্যামলীকে ? দেখি তোমার [illegible]নটা ?—এই ব'লে ছুটে গিয়ে নরেন ফোন ধ'রে নম্বর বললে। সুধাংশুকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। নরেন সাবধানে তা'র কাছে খবরটা পৌছিয়ে দিয়ে বললে, কোন্ থানায় আমি ঠিক বলতে পারিনে। তবে কাছাকাছিই হবে। এ খবর তোমার পাওয়া দরকার, তাই জানালুম। এখন রাত আটটা বাজে। আমি মিস গুপ্তার এখান থেকে বলছি।

নরেন ফোন ছেড়ে দিল।

*

* *

প্রথম আলাপের দিনই শ্যামলী বলেছিল, বিপদের [illegible] যদি তোমার সাহায্য পাই, তবেই জানবো আমার ওপর তোমার লোভ নেই।

টেলিফোনে নরেনের কাছে শ্যামলীর সংবাদ পেয়ে এই কথাটাই প্রথমে সুধাংশুর মনে হোলো। ফোনটা ছেড়ে দিয়ে সে তখনই জামা-কাপড় পরে গাড়ি বার করতে বলে দিল। এ কথাটা শ্যামলীর কাছে এবং নিজের কাছেও নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা দরকার, শ্যামলীর ওপর

তার লোভ নেই কিছুমাত্র, কিন্তু শিল্পীর প্রতি তার স্বাভাবিক অনুরাগ তাকে কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

পদ্মাবতী প্রশ্ন করলো, কতদূরে চললে ?

সুধাংশু বললে, ঠিক বলতে পারিনে, তবে নরেনকে পথে গাড়িতে তুলে নেবো।

কখন ফিরবে ?

তাও ঠিক বলতে পারিনে, বড়বউ।

কোথায় চললে ?

সুধাংশু থমকে দাঁড়ালো। বললে, বড়বউ, এ কথা তুমি তো কোনোদিন জানতে চাওনি ?

পদ্মাবতী ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আজও জানতে চাইনে, তবে ফোন করলো ঠাকুরপো, এ কথা তুমি প্রকাশ করে যাচ্ছ না কেন তা আমি বুঝতে পারলুম না। আজ কি তুমি মোটেই ফিরবে না ?

সুধাংশু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মলিন হাসি হাসলো। এত দূরের থেকে তা'র স্ত্রী কথা বললে, যেন মনে হোলো উভয়ের মাঝখানে যেন নিঃশব্দে প্রকাণ্ড ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সহসা ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে সুধাংশুর বুকের উপর যেন চেপে বসলো। অবাঞ্ছিত সংশয় যেন এই ঘরের মধ্যে একটা করাল ভ্রূকুটির ছায়া বিস্তার করলো।

সুধাংশু আর কিছু বললে না, কেবল মোটরের হর্ন শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললে, মাকে ব'লো ফিরতে হয়ত একটু রাত হতে পারে। —এই বলে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

সম্পূর্ণ অনির্দিষ্টভাবে গাড়ি নিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে সুধাংশু ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আসবার সময় পদ্মাবতী স্থির ভাবে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে তার পথের দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো—তার মুখের সেই কাঠিন্যের দৃশ্যটা পথের আলোকমালার ভিতর দিয়েও তার চোখে

ভাসছিল। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের ভিতরে ‥কাল পরে সন্দেহের কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধবে, এই অস্বস্তির আতঙ্কময় পরিণাম কল্পনা ক'রে সুধাংশু মনে মনে অস্থির হয়ে উঠতে লাগলো।

পথে একজায়গায় গাড়ি থামিয়ে সে ফোন করলো। দুটা তিনটা থানায় ফোন করার পর খবর পাওয়া গেল, উত্তর কলকাতার কোনো একটি থানায় জালিয়াতির অভিযোগে একজন দাগী আসামী ধরা পড়েছে, তা'র সঙ্গে একটি মেয়েও রয়েছে।

এতক্ষণে সঠিক খবর পেয়ে সুধাংশু উৎসাহ বোধ করলো, এবং স্থির করলো যেমন করেই হোক, শ্যামলীকে উদ্ধার করতে হবে। টেলিফোন গাইডে নম্বর দেখে সে পুনরায় ফোন ধরলো, এবং নীনার ওখানে নরেনকে ডাকলো। নরেনকে পাওয়া গেল। সুধাংশু থানার ঠিকানা দিয়ে বললে, আমি সেখানে যাচ্ছি, তুমিও গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো।

নরেন বললে, মায়ামৃগের পেছনে পেছনে ছুটছ তুমি, কিন্তু হায়রানিই তোমার সার হবে, সুধাংশু।

সুধাংশু বললে, দেখাই যাক না—তুমি শীঘ্র এসো।

নরেন বললে, হা ভগবান, লাছুরাম বেটাকে তাড়িয়ে একটা রাত্রের জন্য সুখের ঘরকন্না পাতলুম এখানে, তুমি খোঁচা দিয়ে রাতের পাখীর বাসা ভাঙতে এলে!

সুধাংশু বললে, তামাসা রাখো, শীঘ্র এসো। ‥শতো, কাজ শেষ হ'লে পাখীর বাসায় আবার তোমাকে পৌঁছে দেবো, কথা দিলুম।—এই ব'লে সে ফোন ছেড়ে দিল।

গাড়ি নিয়ে সুধাংশু যখন থানায় গিয়ে হাজির হোলো তখন রাত দশটা বাজে। বাইরে সেপাই দারোগার দল পাহারায় মোতায়েন ছিল, সুধাংশু তাদের প্রশ্ন করলো, থানার কর্তা কোথায়?

একজন জমাদার তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে

সুধাংশু তার কার্ড পাঠালো, এবং এক মিনিট পরেই ভিতর থেকে অফিসার-ইন্‌-চার্জ স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন।

একি, সুধাংশু তুমি?

সুধাংশু তার আবাল্য বন্ধু নীরদ সেনকে দেখে একেবারে স্তম্ভিত। হেসে তার হাত ধরে সুধাংশু বললে, গডসেণ্ট্‌! তুমি এই থানার চার্জে আছ নাকি?

হ্যাঁ, এই বছর খানেক হলো। কিন্তু ব্যাপার কি? এত রাত্রে থানায়? এসো, এসো।—নীরদ সুধাংশুকে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল।

মাঝখানে এসে পড়লো নরেন, সেও গেল ভিতরে। তার পর আধ ঘণ্টাখানেক তিনজনের গোপন আলোচনায় কি স্থির হোলো বলা কঠিন। এক সময় নীরদ একবার বাইরে গিয়ে হাজত থেকে শ্যামলীকে বার করে এনে সামনে হাজির করলো। সুধাংশুকে দেখে শ্যামলী একেবারে অবাক।

সুধাংশু হাসি মুখে বললে, থানায় রাত কাটানো তোমার ভাগ্যে নেই, শ্যামলী। চলো, তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিই।

আমাকে ছাড়বে কেন এরা?

নীরদ বললে, সে ব্যবস্থা হয়েছে, তুমি বাসায় ফিরে যাও।

শ্যামলী বললে, কিন্তু বিনয়কে বিপদে রেখে আমি যাবো কেমন ক'রে?

এমন ভালোবাসা দুর্লভ বৈ কি। নরেন কপাল কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

নীরদ বললে, তোমার বিনয়কে আজ ছাড়তে পারবো না। ছাড়া হয়ত সে পাবে, তবে কাল বিকেলের আগে নয়।

সুধাংশু বললে, আমি তার জন্যে জামিন রইলুম, তোমার ভয় নেই। তুমি ফিরে চলো।—নরেন, তুমি গিয়ে আমার গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমি পরে যাবো ট্যাক্সিতে।

নরেন বেরিয়ে গেল। পরে নীরদের কাছে বিদায় নিয়ে সুধাংশু শ্যামলীর সঙ্গে বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সিতে উঠলো। নরেন আগেই চ'লে গেছে।

শ্যামলীকে নিয়ে সুধাংশু যখন ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায় এসে নামলো তখনও গেট বন্ধ হয়নি, তখনও নিত্যদিনের ন্যায় এপাশে ওপাশে অস্ফুট উল্লাসের চূর্ণস্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। উপরে উঠে এলো তারা দুজনে নিঃশব্দে। ঝি বসেছিল দরজার কাছে। দিদিমণিকে দেখে উল্লসিত হয়ে সে ঘর খুলে আলো জেলে দিল। শ্যামলী বললে, চুপ, চেঁচামেচি করিসনে।

ঝি বললে, সে-মুখপোড়াকে আর তুমি ঘরে ঢুকতে দিয়ো না, সেই আবাগের বেটাই তোমার সব্বনাশ করবে।

থাম্ তুই।—বলে শ্যামলী সুধাংশুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

সুধাংশু বসলো একখানা চেয়ারে। শ্যামলী বললে, ঝি যা বললে তোমারও তাই মত?

সুধাংশু বললে, আমার মতামতের দাম কি তোমার কাছে? সংসারে যারা পশু হয়ে জন্মায় তারাও তো কোনো একজনের ভালোবাসার পাত্র হ'তে পারে।

তুমি আমাকে আনলে কেন ফিরিয়ে?

তুমি যে বিপদের সময় সাহায্য চেয়েছিলে?

আমাকে সাহায্য ক'রে তোমার লাভ কি?

সুধাংশু বললে, লাভ লোকসান দেখে তো সাহায্য করিনি। রাত আটটার সময় বাড়িতে বসে নরেনের ফোনে খবর পেলুম, তাই গিয়েছিলুম দৌড়ে। এবার আমি যাবো।

শ্যামলী বললে, তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

সুধাংশু হাসলো। বললে, শ্যামলী, এইজন্যে তোমরা এত নীচে

নেমেছ। থানায় যে আটকা রইলো, সে তোমার প্রিয়। তাকে এড়িয়ে আমাকে এখানে থাকতে বলার মানে কি বলো তো?

শ্যামলী বললে, কিন্তু তোমাকে আমি কেন বুঝতে পাচ্ছিনে, বলতে পারো? কেন তুমি আসো, কেনই বা আমার ভালো করার চেষ্টা করো, কী তোমার মতলব? শুধু বিপদ থেকে বাঁচাবে, শুধু দিয়েই যাবে, নেবে না কিছু,—এ কি হতে পারে? এ কি সম্ভব?

সুধাংশু বললে, যদি কোনদিন তোমার চোখ ফোটে তুমি দেখবে, এও সম্ভব। সবাই তো নিতে আসে, সবাই আসে ডাকাতি করতে,—কিন্তু সেই অপমান আর লোভের ফাঁদে আমি যদি পা না দিই?

শ্যামলী বললে, হাজার হাজার মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে তুমি আমার জন্যেই বা এত কর কেন?

তুমি নতুন, তুমি নির্বোধ, তুমি শিল্পী,—তাই আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি!

শ্যামলী বললে, আমার কেউ নেই, শুধু বিনয় আছে। বিনয় অত্যাচার করে, অপমান করে, বিনয় আমাকে পথে বসায়—কিন্তু তবু কী রূপ তার, কী সুন্দর তার চেহারা—তাকে আমি ছাড়বো কেমন করে বলতে পারো? ভালোবাসার চেয়ে আরো কি কিছু বড় আছে, যার জন্যে বিনয়কে আমি ছাড়তে পারি?

সুধাংশু বললে, হয়তো আছে, তুমি নিজেই একদিন তার সন্ধান পাবে। আমি চললুম।

সিঁড়ির কাছে এসে শ্যামলী বললে, আবার কবে আসবে বলে যাও।

না।

আর আসবে না?

যেদিন মনে হবে আমি না এলে তোমার চলবে না, সেইদিন আসবো।—বলতে বলতে সুধাংশু সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

লোকটা অদ্ভুত বটে। এমন অসাধারণ লোক জীবনে তার কোনোদিন চোখে পড়েনি। ছলছলে চোখে স্তব্ধ হয়ে শ্যামলী সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে রইলো। আনন্দের প্রবাহে কিশোরকাল থেকে সে ভেসে চলে এসেছে। লোভের উপকরণ পেয়ে এসেছে সে চিরদিন, বিলাসের চেহারা দেখেছে সে প্রতিনিয়ত, হেসেছে, ভালোবেসেছে, নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে মুক্তার দানার মতো, বেপরোয়া বিশৃঙ্খলায় দুরন্তপনা করেছে সে,—কিন্তু এই লোকটার অদ্ভুত আচরণ তার সমস্ত জীবনটাকে যেন ভেঙে দুমড়ে মচ্‌কে নতুন করে ঢেলে সাজতে চায়!

···নয়···

স্বামীর বাইরের জীবনের সঙ্গে পদ্মাবতীর পরিচয় কম ছিল না। ও-বাড়িতে বধূবেশে সে যখন প্রবেশ করেছিল তখন তার বাল্যকাল। সংসারটি ছিল ছোট, সমারোহ ছিল কম। সেই কালে সে দেখেছে সুধাংশুর জীবন সংগ্রামের ভূমিকার আরম্ভ মাত্র। নৈরাশ্যের চেহারা কোথাও ছিল না বটে, কিন্তু আশার পরিধি ছিল গণ্ডীবদ্ধ। সে সব অনেক দিনের কথা বৈ কি।

তারপর অল্পে অল্পে সে দেখেছে সুধাংশুর উন্নতির পথ। স্বামীকে সে সাহস যুগিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে। বড় একটা কাজ আরম্ভের গোড়ায় একদা সে তার সমস্ত অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল। স্বামী তার পরিশ্রমী, সত্যবাদী, চরিত্রবান—এই ছিল তার অহঙ্কার। সেদিন এমন কথা ওঠেনি, পুরুষের গতিবিধিকে সংযত রাখা দরকার; এমন সমস্যা সেদিন কল্পনার অগোচরে ছিল, পুরুষের নৈতিক চরিত্র নিত্য প্রকম্পমান; এমন সংশয় সেদিন দেখা দেয়নি,

উভয়ের অনুরাগের মূলভিত্তি চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেদিন সুধাংশুর স্বভাবের নৈতিক শুচিতার মধ্যে পদ্মাবতীর জীবনের অস্তিত্ব অন্তর্নিহিত ছিল। আজ সেই বিশ্বাসটি কেমন যেন গভীরভাবে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এত বড় দুর্দিন পদ্মাবতীর জীবনে আর আসেনি।

আজ এই সংসারের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে বিপুল ঐশ্বর্যের ঠিক মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। যা অপ্রত্যাশিত ছিল তাই আজ সহজলভ্য। যা কল্পনার অতীত ছিল, তাই আজ সর্বব্যাপী সফলতায় সংসারের সম্মুখে প্রকট। তাদের এই অতুল ঐশ্বর্য ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণপথে আবদ্ধ হয়ে নেই। বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন প্রবাহে তাদের সম্পদের অংশ অপরের কাজে লাগে। কেউ পায় মাসোহারা, কেউ পায় বরাদ্দ, কেউ বা দান। তার স্বামীর হাত কৃপণ নয়—এই তার গৌরব। আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু, পরিজন—এমন কি যারা তাঁদের প্রতি বিরূপ—তারাও এই সংসারের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছে। পুণ্যকাজ, বারব্রত, পাল-পার্বন, পূজা-অর্চনা—সবগুলোই সুধাংশুর অনুপ্রেরণায় সম্পন্ন হয়। যশে, গৌরবে, সম্মানে, প্রতিষ্ঠায়, সমৃদ্ধিতে—তার স্বামী এই সংসারকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। একটা জীবনের এত বড় সাফল্য উদাহরণযোগ্য সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই সংসারে অনটন আর অভাব যেদিন ছিল, সেদিন পদ্মাবতী নিজে ছিল পরিপূর্ণ। তার হৃদয়ের ইতিহাসে কোনো অভাব আর দারিদ্র্যের দাগ বিন্দুমাত্র ছিল না, তার স্বভাবের অন্তঃস্থলে সংশয়ের কীট কোথাও বাসা বাঁধেনি—আনন্দময় ছিল তার স্বরূপ। পরনে সেদিন ছিল তার রাঙাপেড়ে শাড়ী, আর হাতে একজোড়া শাঁখা—মনে হোতো সে যেন বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। তার পর দিনে দিনে বছরে বছরে এই মধ্যবিত্ত সংসারের স্তিমিত ধারায় সম্পদের জোয়ার

একটির পর একটি এসে দুইকূল প্লাবিত করে তুললো, সেইসময় থেকে সেও যেন ধীরে ধীরে শূন্য হতে লাগলো। সংসারে আর কোথাও অভাব রইলো না, কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দারিদ্র্য দেখা দিল সেইকাল থেকে। পদ্মাবতী ইদানীং প্রায় রিক্ত হতে চললো।

হিন্দু স্ত্রী সে। একথা সে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে, সুধাংশু তার জীবন থেকে কোনো পৃথক সত্তা নয়, তারা উভয়ে একাকার। স্বামীর স্বভাবে যদি কোনো কালো দাগ পড়ে থাকে তবে সেটি যেন তারই কলঙ্ক, তারই অপরাধ। সংশয় যদি কিছু তার মনে এসে থাকে তবে সে-বস্তু সুধাংশুর অগোচর নয়।

এই কথাগুলোই মনে মনে সে তোলাপাড়া করছে, এমন সময় একদিন পুনরায় সুরবালার আবির্ভাব ঘটলো।

সুরবালার মুখের চেহারা গম্ভীর, কপালে ভয়ানক দুশ্চিন্তার রেখা—তিনি অভ্যাসমতো আর কোনোদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে সোজা এসে কন্যার শয়নকক্ষে ঢুকলেন। মটকার চাদরটি খুলে অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে একখানা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, পাখা খুলে দাও মা, তোমার বাড়ি আসতে গেলে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরোতে হয়। আমার হয়েছে যত জ্বালা!

পদ্মাবতী স্যুইচ্ টিপে পাখা খুলে দিল। সুরবালা ঘর্মাক্ত কলেবরে চোখ বুজে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন!

বাবা কেমন আছেন, মা?

তাঁর থাকা না থাকা সমান। বাতে পঙ্গু, দাঁতের গোড়া ব্যথা। ফল পেকেছে, বোঁটা থেকে এখন খসলেই হয়। তাঁকে দেখবার তো আর কেউ নেই!—সুরবালার নিত্য নৈমিত্তিক চিত্তক্ষোভটা যেন গলগল করে বেরিয়ে এলো।

পদ্মাবতীর কাছে এটি হেঁয়ালী! মায়ের মন কখনও খুশী নয়,

কোনোদিনই প্রসন্ন নয়। তাঁর অভিমান এবং আক্রোশের ক্ষেত্র কোথায়, বাক্যালাপ কেন তাঁর মনোক্ষোভে পরিপূর্ণ—এ রহস্য উদঘাটন তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণ থেমে পদ্মাবতী বললে, তোমাকে সময় মতো টাকা আমি পাঠাতে পারিনি। এত লোকজনের মাঝখানে লুকিয়ে পাঠানো খুবই শক্ত। তাছাড়া অজিত আজকাল বড় হয়েছে, সব হিসেব রাখতে শিখেছে।

চোখ পাকিয়ে সুরবালা বললেন, তাহলে বল তোমার পেটের ছেলেই এখন ঘরের শত্তুর বিভীষণ? হবেই তো, বন চাঁড়ালের জাত যে! যেমন বাপ-ঠাকুরদাদা, তেমনিই তো হবে!

এমন রুক্ষ মন্তব্য পদ্মাবতীর ভালো লাগলো না। বিশেষত অজিত সম্বন্ধে। বিরক্তি মিশ্রিত একটু হাসি হেসে পদ্মাবতী চুপ করে গেল।

সুরবালা এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, আমি এলেইতো এবাড়ির সাত ময়নার মধ্যে কানাকানি হয়। আড়াল থেকে কেউ আড়ি পেতে নেই তো? তোর শাউড়ীমাগি কোথায়?

তিনি পূজোয় বসেছেন।

ব্যঙ্গ করে সুরবালা বললেন, যতোই পূজো করুন, আর ফুলবেলপাতা পড়ুক, ছেলের মন আর ফেরাতে হচ্ছে না। সে গুড়ে বালি!

পদ্মাবতী উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, কেন মা?

থাক্ মা সে সব কথা। মা হয়ে আমি তো আর মেয়ের কান ভাঙ্গাতে আসিনি। টাকার জন্যে বিপদে পড়েছি, টাকা কটা দাও, পেটকাপড়ে বেঁধে জামাই ছোঁড়া ফেরবার আগে গা ঢাকা দিয়ে চলে যাই। বলি, টাকার ব্যবস্থা তাহলে করতে পারোনি, কেমন? তোমরা সবাই থাকতে কাজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে অপমান হবো আর কি।

পদ্মাবতী বললে, তুমি স্থির হও মা, টাকার ব্যবস্থা আমি করেছি।

সুরবালার মুখের চেহারা এবং গলার আওয়াজ তৎক্ষণাৎ বদলে গেল। বললেন, বাঁচলুম। কাটারির কোপ না দিলে কি ডাবের মিষ্টি জল পাওয়া যায়?—এই বলে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে তিনি একগাল হাসলেন।

সে-হাসিতে যোগ দেওয়া পদ্মাবতীর পক্ষে কঠিন। কথার মাঝখানে একবার সে উঠে গেল, এবং মিনিট দুই পরে ফিরে এসে একতাড়া নোট সুরবালার হাতে দিয়ে বললে, এতে পাঁচশো টাকা আছে—

সে কি মা, আর পাঁচ শো?

আমার হাতে এখন যা ছিল সব দিলুম।

সুরবালা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। বললেন, যার মেয়ে তুমি তার মতন নজর পাওনি—অবস্থা তোমাদের যতোই ভাল হোক।

পদ্মাবতী বললে, কি করবো মা, আমার হাতে আর কিছুই নেই!

সুরবালা বললেন, এটা জেনে রাখিস পদ্মা, জামাইবাড়ি থেকে যে টাকা নিই, এটা জামাইয়ের ভাগ্যি। কী হবে আমার পাঁচশো টাকায়? এতে জাতও গেল পেটও ভরলো না, তা মনে রেখো।—এই বলে তিনি একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুনরায় বললেন, টাকা আর ঘরে থাকবে কেন মা, টাকা যাচ্ছে নর্দমা দিয়ে অন্য রাস্তায়। বলতে গেলে এখন অনেক কথা।

পদ্মাবতী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, কী বলছ মা?

সুরবালা বললেন, তুমি মেয়ে হয়ে আমার কাছে কথা চেপে যাও, কিন্তু তোমার শ্বশুর বাড়ির গোয়েন্দার মুখে সব কথাই শুনতে পাই।

পদ্মাবতী বললে, কে সে?

সে যেই হোক, কথাটা তো সত্যি। সুধাংশুর ঢলাঢলি আজকাল কে না জানে মা?

কানদুটো পদ্মাবতীর গরম হয়ে উঠলো। মায়ের মুখ দিয়ে সমস্ত

পারিপার্শ্বিক সমাজটা যেন সহসা চারদিক থেকে তার স্বামীর নিন্দায় মুখর হোল। পদ্মাবতী সুরবালার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন বিদ্রূপাত্মক, সেই চোখের দৃষ্টি ব্যঙ্গভরা, এবং তাঁর সমস্ত বাক্যভঙ্গী যেন চতুর অর্থপূর্ণ।

তিনি বললেন, কিছু থাকবে না মা, এই ব'লে রাখলুম। আমার আশীর্বাদের জোরেই তোমাদের এই সব যা কিছু হয়েছে। কিন্তু যে-পথে চলেছে তোমার স্বামী—এতে ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি, কাজ-কারবার—সব যাবে উবে। কিছু বাঁচবে না।

পদ্মাবতী বললে, নিজের হাতে সব হয়েছে, নিজের হাতেই যদি সব নষ্ট হয়, আমার তো বলবার কিছু নেই। কিন্তু তুমি আর এ নিয়ে আলোচনা ক'রো না মা, তোমার মুখ থেকে আর এসব শুনতে পারিনে।—বলতে বলতে তার আয়ত চোখ দুটি অতিশয় বেদনায় ছলছল করে এলো।

কন্যার চোখের জল দেখে সুরবালা হেসে উঠলেন। বললেন, তুই গিন্নি হ'তে গেলি, কিন্তু আজও ছেলেমানষী গেল না। আমি যে মা! মা হয়ে মেয়ের ভালোমন্দ ভাববো না, এ কখনও হয়? যা বলি ভালোর জন্যেই বলি মা। এই যে আফিস ফেরতা গাড়ি নিয়ে সুধাংশু এ-মাগি ও-মাগির কাছে যায়, এর খবর কি তুই রাখিসনে? পাঁচটায় তার আপিসের ছুটি, রাত বারোটায় সে ফেরে কেন বলতে পারিস?

পদ্মাবতী বললে, আমি কিছুই জানিনে।

তোর [illegible] জানে?

না।

জানলেও কি ছেলের কীর্তি বলবে নাকি তোকে? মাগির পেটে বোমা মারলেও কথা বেরোবে না, [illegible]। তা ছাড়া ও-মাগি চায়, তোর ওপর থেকে সুধাংশুর মন ঘুরে দাঁড়াক।

শাশুড়ী তার এমন প্রকৃতির মানুষ একথা পদ্মাবতী জানে। কিন্তু মায়ের অতিশয়োক্তির প্রতিবাদ নিষ্ফল জেনে সে চুপ করে রইলো।

সুরবালা এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, বেলা তিনটে বেজে গেল, আজ আমি উঠি। টাকা তুমি সবটা দিলে না, কিন্তু কোথায় যে ধার করতে ছুটবো তাও জানিনে।—কই, চাদরখানা দাও।

চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাসমতো গা ঢাকা দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে সুরবালা বেরিয়ে পড়লেন। পিছন থেকে পদ্মাবতী নিঃশব্দ চিত্তগ্লানি নিয়ে তাঁর পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আজ কয়েকদিন পরে সুধাংশুর কাজকর্ম কিছু হালকা ছিল। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের গুরুভার দায়িত্ব তার একার কাঁধের উপর চেপে রয়েছে, এর উদ্বেগ ও চিন্তা তার কম ছিল না। কিন্তু কর্মকেন্দ্র থেকে কিছু দূরে সরে গেলে ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্তটা বিচার করে দেখা সহজ হয়। সুতরাং নরেনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে সুধাংশু সেদিন নিরিবিলি গঙ্গার ধারে [illegible] হোলো।

ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার কূলে এদিকটা অনেকটা জনবিরল। এদিকে প্রায়ই সুধাংশু সান্ধ্যভ্রমণে আসে, তাই তার একটা বিশ্রামের জায়গা নির্দিষ্ট ছিল। গাড়িখানা কিছুদূরে দাঁড় করিয়ে দুই বন্ধুতে এসে সেই জায়গায় বসলো।

নরেন তামাসা করে বললে, মনিব, পুরনো বউ না হ'লে তুমি নিশ্চয় সকাল-সকাল বাড়ি ফিরতে—কেমন?

সুধাংশু জবাবটা দিল স্পষ্ট। বললে, মনের মতন বৌ কখনো পুরনো হয় না!

তা যদি না হবে তবে বুড়ো বয়সে এক কেত্তনওয়ালীতে তোমার মন মজলো কেন?

তোমার কি ধারণা, মন আমার মজেছে ?

নরেন বললে, নিশ্চয় মজেছে, নৈলে আধেক রাত্রে অত নোংরা ঘেঁটে শ্যামলীকে তুমি উদ্ধার করতে গেলে কেন? তুমি যে তার প্রেমে পড়নি, তারও তো কোনো প্রমাণ নেই।

সুধাংশু বললে, এ তোমার অদ্ভুত কথা, নরেন। প্রথমত সে একটা পতিতা স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়ত বিনয় তার সমস্ত মন জুড়ে ব'সে রয়েছে। আমি কি এমনিই নির্বোধ যে, জেনেশুনে সেই আঘাটায় পা দিতে যাবো? এর নাম ভালোবাসা দিয়ে নিজেকে অপমানিত করবো ?

নরেন বললে, মনে হচ্ছে নিজেকে তুমি পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারছো না। এই যদি তোমার মনোভাব তবে সেদিন অত আগ্রহে নীরদের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করতে গেলে কেন? অত টাকার জামিন দিয়ে বিনয়কে ছাড়িয়ে এনেই বা তোমার কি লাভ হোলো ?

গঙ্গার প্রবাহের দিকে সুধাংশু খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তার পরে বললে, ঘটনাটা যে-পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে এ অতি সাধারণ। সবাই বলবে, শ্যামলীর প্রতি আমি আসক্ত। সবাই জানবে, ঘরে বউ থাকা সত্ত্বেও বাইরে আমি যাতায়াত করি। কোনো নতুনত্ব নেই, কোনো বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু তবু আমি একথা বলবো, তোমাদের এ-ধারণা সত্যি নয়। আমি নিজেকে বুঝতে পারিনি হয়তো, কিন্তু তোমরাও আমাকে বুঝতে পারোনি।

বুঝতে না পারার কারণ তুমিই তৈরী করেছ, মনিব।

তাহ'লে আসল কথাটা শোনো, মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে।

নরেন বললে, এরকম ঘটনার গোড়ায় সবাই এই কথা বলে।

সুধাংশু বললে, কিন্তু আমি তার কাছে কিছুই চাইনে।

তুমি চাও না, কিন্তু সে যদি চায় ?

কী চাইতে পারে?

তোমার ভালোবাসা, তোমার টাকা, তোমার সান্নিধ্য—যেমন সব মেয়ে কামনা করে?

সুধাংশু বললে, দূরের থেকে তিনটে জিনিসই দেবো। আমি তা'র কল্যাণ কামনা করি।

নরেন বললে, খামকা একটি পতিতা স্ত্রীলোকের কল্যাণ কামনার অর্থ? একজন তরুণী পতিতার প্রতি গায়ে পড়া কল্যাণ-কামনা কি হাস্যকর নয়?

যদি এর মধ্যে আসক্তি না থাকে, যদি তার ভোগবিলাসের সঙ্গী না হই—তাহলেও হাস্যকর হবে বলতে চাও?

কিন্তু পতিতাপল্লীতে যাতায়াত করলে এ নৈতিক বুদ্ধি কতদিন টিঁকবে?

সুধাংশু কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, আমি ভুল করিনি, তোমরা দেখে নিয়ো। ও-মেয়ের মধ্যে বড় রকমের সম্ভাবনা দেখেছি, ওর গানের মধ্যে ওর হৃদয়ের চেহারা দেখতে পেয়েছি। ওকে সাধারণ পতিতা বলতে পারবো না। আমার নিজের কথা যদি বলো তবে এই শুধু বলতে পারি, ওর প্রকৃত কল্যাণ আমি চাই কিনা সেইটিই আমার মনুষ্যত্বের অগ্নিপরীক্ষা।

তুমি শূন্যে প্রাসাদ গড়ে তুলছ, মনিব!

কেন?

মেয়েটা রইল নিজের মনে, নিজের নোংরা জীবনযাত্রা নিয়ে। মাঝে মাঝে বিপদে প'ড়ে তোমার মতন অর্বাচীন আদর্শবাদীকে ডাকলো, তুমি উদ্ধার করলে, টাকা দিলে, দুটো হিতোপদেশ আওড়ালে। তারপর মেয়েটা আবার ফিরে গেল বিনয়ের গলা ধ'রে খুশী হয়ে। তোমার কল্যাণবুদ্ধির মা-বাপ নেই দেখছি।—ব'লে নরেন হেসে উঠলো।

সুধাংশু বললে, আমি শ্যামলীকে উদ্ধার করবো।

কোথা থেকে?

ওর ওই জীবন থেকে।

বটে! রক্তবীজকে উদ্ধার করবে রক্তপানের নোংরামি থেকে, কিন্তু রক্ত না খেলে সে বাঁচবে না, একথা ভুলে যাচ্ছ কেন? তুমি উদ্ধার ক'রে রাখবে কোথায়? উর্ণনাভের জাল যতই কাটো, আবার সে জাল ফাঁদবে—এইটি তার স্বভাব।

সুধাংশু বললে, কিন্তু তার স্বভাবকে যদি বদলাতে পারি?

নরেন বললে, কিন্তু বাঘিনী কোনোদিন হরিণীর স্বভাব পাবে?

দেখা যাক্—

নরেন একটু থেমে বললে, কিন্তু আমার মতে তুমি ওকে ত্যাগ করো, মনিব। আমি নিজে নীনার কাছে আনাগোনা করি, তা'কে বুঝতে পারি, সে অস্পষ্ট নয়—হৃদয়ের খেলায় সে মাতে না। সে স্টাইল জানে, ফ্যাশন জানে, নানাপাত্রে নানা রং বদলাতে জানে। কিন্তু তোমার শ্যামলী হোলো বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, অশান্ত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। এমন মেয়ে নিরাপদ নয়। যদি ওকে নিয়ে তুমি বেশী নাড়াচাড়া করতে যাও, তোমার পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দেবে। ওকে তুমি ত্যাগ করো, মনিব।

সুধাংশু বললে, যাকে ভালো লেগেছে তাকে ত্যাগ করাই কি পৌরুষের পরিচয় হবে?

নরেন বললে, কিন্তু সকলের বিচারবুদ্ধি যদি এই কথা বলে, শ্যামলী তোমার অনুগ্রহ পাবার যোগ্য নয়?

আমার বিবেকবুদ্ধি কিন্তু সে-কথা বলে না!—চলো, এবার যাই—ব'লে সুধাংশু সেদিনকার মতো উঠে দাঁড়ালো।

মাইল দুই গিয়ে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সুধাংশু নরেনকে

নামিয়ে দিল। বিদায় নেবার সময় নরেন বললে, যাবার আগে একটা কথা বলি, মনিব। আমি জীবনে বঞ্চিত, তাই নানাজায়গায় জলের তেষ্টা মেটাই—এটা ভালো কি মন্দ কোনোদিন বিচার করিনি। কিন্তু তোমার সামনে রয়েছে সরোবর। তাকে ছেড়ে সামান্য একটা পথের মেয়েকে নিয়ে যদি তুমি আদর্শের সাধনা করো, সেটা শোভন হবে না। হয়তো এত বড় অসম্ভ্রম বৌঠানও সহ্য করতে পারবেন না।

নরেন বিদায় নিয়ে গেল। সুধাংশুর মোটর ছুটলো ভবানীপুরের দিকে।

সমস্যাটা তার সামনে দাঁড়ালো সোজা স্পষ্ট হয়ে। এই মেয়েটির সম্পর্কে সে যদি হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করে তবে তার পরিবারে আসবে অশান্তি, স্ত্রীর হবে অসম্ভ্রম, বন্ধু হবে বিরূপ। অথচ এক্ষেত্রে রূপের সাধনা তার নয়; ভালবাসার জন্য হৃদয়াবেগের ওলোটপালটেও তার প্রশ্রয় নেই; ব্যক্তিগত লাভ, লোভ, স্বার্থ—এদেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু নারীর যে-হ্লাদিনী শক্তি, যে-প্রাণময়তা, যে-চিত্তবিজয়িনী প্রতিভা পুরুষের নির্মল রসচৈতন্যকে আনন্দে অভিভূত করে, প্রশান্ত করে—শ্যামলী সেই অত্যাশ্চর্য সম্পদের অধিকারিণী। অথচ এমন মেয়েকে নীচের থেকে উপর দিকে তুলে ধরা নাকি অবৈধ, অশোভন, অসামাজিক! ভালোবাসার কথাটা সহজেই তার মনে এলো। নিজেকে কেন্দ্র করে একটা মস্ত বড় সংসার সে গ'ড়ে তুলেছে, ক্লাইভ স্ট্রীটের প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে উঠেছে তারই অধ্যবসায়ে। তার প্রিয়তমা স্ত্রী, তার আনন্দের ঘরকন্না, তার স্নেহের ধারায় কত মানুষ সঞ্জীবিত,—এগুলোর পিছনে কি শুধুই ছিল তার পৌরুষ? ভালোবাসা কি এদের পিছনে কিছু ছিল না? তার সেই প্রাণের প্রাচুর্য যদি আজ জীবন থেকে উপচিয়ে প'ড়ে একটি পথবাসিনী পতিতাকে কল্যাণের পথ নির্দেশ করে, তবে সে-আচরণ কি এতই অসামাজিক

আর অবৈধ? ভালোবাসার সাধনা সে করছে—স্ত্রী নিয়ে, সন্তান নিয়ে, সংসার নিয়ে, কাজকারবার ও মানুষের ভালোমন্দ নিয়ে, এবং সেই সাধনা তার সার্থক হয়েছে। কিন্তু আজ সহসা তার সামনে একটা নতুন পথ দেখা দিল—এটা যেন অনেকটা সম্ভোগ-অতিক্রান্ত ত্যাগের পথ, পরের জন্য নিঃস্বার্থ কল্যাণবুদ্ধির পথ, আত্মদানশীল নির্মল আনন্দের পথ। এপথে সে পা বাড়াবে সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে যদি কোনো কঠিন ব্রতের উদ্‌যাপন করতে হয়—সে নিরুৎসাহ বোধ করবে না। যে ভালোবাসা তাকে এই বিরাট সংসার রচনা করার আনন্দ যুগিয়েছে—সেই ভালোবাসাই তাকে অনুপ্রাণিত করবে প্রতিভাশালিনী শ্যামলীকে অধঃপতন থেকে উদ্ধার করার জন্য।

*

*　　　　*

ঘোষাল সাহেব কয়েকদিন থেকে শ্যামলীর ওখানে আনাগোনা করছিলেন। কেন করছিলেন সেটা ঘোষাল সাহেবের রুচির পর্যায়ে না নামলে বলা কঠিন। বিনয় এ সংবাদ জানতো, কিন্তু জেনেও সে এ নিয়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেনি। তার নিজের পাওনাটা যথাসময়ে পেলেই সে খুশী। ইতিমধ্যে আর্থিক সমস্যাটা শ্যামলীর কাছে প্রবল হয়ে উঠেছে। ঝি-এর মাইনে, চাকরের কাপড়, বাড়িভাড়া, ঘরখরচ ইত্যাদি বিবিধ তালিকা নিয়ে বিনয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই বিনয় দেখিয়ে দিত ঘোষাল সাহেবকে। কিন্তু ঘোষালের বদান্যতা কোনোদিন বেহিসাবী হয়ে শ্যামলীর সাংসারিক প্রয়োজনের পথ মাড়িয়ে চলেনি। তার কৃপণতার কঠিন আবরণে কোনো ছিদ্র খুঁজে পাওয়া কঠিন।

শ্যামলী একদিন বিনয়কে বললে, বেশতো টাকা তোমাকে এনে দিচ্ছি—আমাকে মুজারায় যেতে দাও। এই তো কালকেই আমাকে বরানগর থেকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল, তুমি বললেই রাজী হতে পারি।

বিনয় বললে, না।

কেন ?

পাঁচজনের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাকে খোয়াবো ?

আমাকে তুমি এত অবিশ্বাস করো কেন ?

স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করবো এমন নির্বোধ আমাকে ঠাওরাও কেন ?

শ্যামলী বললে, কিন্তু সমস্ত অপমান আমি তো তোমারই জন্যে মেনে নিই! তুমি খরচও দেবে না, অথচ বাইরে গিয়ে উপার্জন করতেও দেবে না—ঘর চলবে কি করে ?

বিনয় বললে, তুমি মিঃ রয়ের কাছে চিঠি লিখে দাও, আমি আবার টাকা আনি।

তিনি বার বার টাকা দেবেন কেন ?

তিনি প্রচুর পরিমাণে নির্বোধ, তাই দেবেন ?

তাহলে তুমি তাঁকে চেনোনি !

বিনয় হাসলো। বললে, শ্যামলী, বুদ্ধির খেলায় তোমার নতুন মক্কেলটি ইতিমধ্যেই হার মেনেছে। লোকটা নির্বোধ, দুশ্চরিত্র হবার সাহস নেই, কেবল শিকার সামনে রেখে আড়ালে আবডালে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। নির্বোধ যদি না হবে, তবে তোমাকে একটুখানি খুশী করার জন্যে অর্ধেক রাত্রে গিয়ে আমাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনলো কেন ? ওর উদারতার পিছনে রয়েছে ভীরুতা, নির্বুদ্ধি [illegible]—কাঙালপণা। টাকা দিয়ে মহত্ত্বের অনুকরণ করে, অহঙ্কারকে [illegible]র করে বদান্যতার ছদ্মবেশে—এ একপ্রকার ইতর মনোবৃত্তি। তুমি চিঠি দাও, আমি ওর কাছ থেকেই টাকা আনবো।

শ্যামলীর মুখখানা ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটাকে চাপা দেবার জন্য সে একটি কীর্তনের কলি গুনগুন করে গেয়ে উঠলো—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মন প্রাণ!"

বিনয় বললে, তাহলে চিঠি দেবে না?

শ্যামলী কাছে এসে বিনয়ের হাত ধ'রে বললে, পরের টাকা এনে বড়মানুষী করতে তোমার ভালো লাগে?

বিনয় বললে, আজকাল তুমি এত বেয়াড়া হচ্ছ কেন বলতো?

শ্যামলী বললে, তোমার বাধ্য হয়ে শুধু তো নিচেই নেমে যেতে হোলো, দেখতে পাচ্ছ না?

তার মানে, বলতে চাও, আমাকে আর তোমার ভালো লাগছে না! বেশ, আমি না হয় চলেই যাবো!

হাসিমুখে শ্যামলী বললে, এমন ভয় তুমি তো অনেকবার আমাকে দেখিয়েছো! চ'লে তুমি যাবে না, আমি জানি! আমাকে ছাড়লে তোমার সংসার চলবে না, বাবুয়ানা হবে না,—জুয়া, নেশা—সব বন্ধ হবে। ভালোবাসার বদলে এমন ক'রে আমার মতন আর তো কেউ ঠকবে না!

বিনয় তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্বর বদলে বললে, তুমি এমন করে আমাকে কঠিন কথা বলতে পারো, আমি জানতুম না।

শ্যামলী বললে, তুমি চতুর, কিন্তু অজ্ঞান চতুর। নৈলে একজন ভদ্রলোক নিঃস্বার্থভাবে তোমার আমোদের খরচ জুগিয়ে চলেছে, আর তুমি তাকে ইতর ব'লে গাল দাও?

থামো শ্যামলী। অমন ঢের-ঢের ভদ্দরলোক আমার দেখা আছে! সিঁধ কাটবার অস্ত্র পুরুষ মানুষের হাতে কত রকমের আছে, তা তুমি জানো কতটুকু? যাকগে—আমি এখন চললুম। চিঠি যখন দিলে না, তখন খরচের টাকা কোথা থেকে জোটাবে, সেই কথা ভাবো।

এই বলে বিনয় মসমস ক'রে চ'লে গেল। কীর্তনের কলিটা আবার

গলার ভিতর থেকে টেনে এনে শ্যামলী ঘুরে ঘুরে গুন গুন ক'রে গাইতে লাগলো।

এক এক সময়ে তার আনন্দের যেন সীমা থাকে না। সেই আনন্দ এত নিবিড় এত ঘন,—যেন সুখের নেশায় তা'র চোখ দুটো আবেশ-বিহ্বল হয়ে ওঠে। আবার এক এক সময় অকারণ অতলস্পর্শ বেদনায় তার বুকের ভিতরটা হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। আনন্দে আর বেদনায় একই সঙ্গে আন্দোলিত তার সর্বাঙ্গ কেমন যেন অসহ্য উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে এক সময় নাচের রসে রসিয়ে উঠে। তখন বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে আলুথালু সাজসজ্জায় সে গান ধরেছে তীব্র দীর্ঘতানে, থরথরিয়ে উঠেছে তার কণ্ঠে সুরের লীলাছন্দ—নেচে উঠেছে দুই পা। সুরের তালে তালে নাচতে নাচতে সে হয়ে গেছে আত্মহারা। একসময় সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে সে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো, সন্ধ্যা থেকে সারারাত অঘোর নিদ্রায় তার কেটে গেল।

আজ আবার যেন সেই অকারণ ব্যথাটা ক্ষণে ক্ষণে তা'র মনে ফেনিয়ে উঠছিল। সে পতিতা, দুশ্চরিত্রা, পথের ধূলায় দলিত একটি বাসি ফুল। কিন্তু চিরদিন সে এমন ছিল না। ওই বিনয়ের ছবিখানা ঝুলছে দেয়ালে। একদিন ওই বিনয়ের জন্য সে ব'সে থাকতো নবদ্বীপের একটি বাড়ির উপরতলাকার জানলায়। ভদ্রঘরের মেয়ে, সে পাসকরা ছাত্রী, চারদিকে তা'র আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। তা'র মনে কত আশা, তার বুকে কত স্বপ্নের বাসা। একদিন সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে বিনয়ের হাত ধ'রে সে রাত্রির অন্ধকারে গঙ্গার ধারে এসে নৌকায় উঠলো। তার জীবন যৌবন গেল অকূলে ভেসে! যাকে কেন্দ্র করে তার ভালোবাসার এই অদম্য আকর্ষণ, সে কিছুকাল পরে গোপনে বিয়ে করলো, সমাজব্যবস্থার মধ্যে সহজে ফিরে গেল—আর সে বাসা নিল পতিতা পল্লীর গহ্বরে। ভেবেছিল সেই বুঝি পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র পথভ্রান্ত নারী, কিন্তু

এইপথে এসে সে আবিষ্কার করলো, চারিদিকে তার অসংখ্য উদাহরণ। একটা অস্বস্তিকর সান্ত্বনা সে পেলো বৈ কি।

কিন্তু এখন তার আর কোন আশা নেই। সে জীবনে যা কামনা করেছিল, সেকথা আজ প্রকাশ করতে গেলে নিজের কাছেই সে লজ্জা পাবে। তার প্রাণশক্তি এখনো অফুরন্ত, একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? হঠাৎ একসময়ে নিজেকে তার নিষ্কলঙ্ক নির্মল মনে হয়, মনে হয় সে অপরাধ করেনি, নীচে সে নামেনি, কমলিনীর দৃষ্টি আজও সূর্যভ্রষ্ট হয়নি, একথা শুনলে লোকে কি পতিতার ক্ষণিক খেয়াল ব'লে মনে করবে না? সে যদি ভাবে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে-শক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারে—সে মন্দ, সে নষ্ট, সে কলঙ্কবতী,—তবে কার কি ক্ষতি? সে যদি মনে করে, একমাত্র ভগবান তার কাম্য, তার হৃদয়ের মন্দিরে চিরবিরাজমান একমাত্র ঘনশ্যাম মাধব,—তবে না হয় সে হাস্যকর হোলোই বা!

চোখের জল কেঁপে উঠলো শ্যামলীর চোখের পাতা দুটিতে, সে নিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে গেল। এই নিষ্ফল মনোবিকলন তার পক্ষে শোভন নয়। আশা করবার, ভালো হবার, ইতরবৃত্তিকে অতিক্রম করবার সকল আশা তার নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে!

···দশ···

সকাল বেলা অফিসে একবার এসে সুধাংশু খাতাপত্র নিয়ে বেরিয়েছিল কোনো এক ব্যাঙ্কের কাজে। সেখান থেকে আবার ষ্টিভেন্স-এর সঙ্গে গিয়েছিল এক সাহেব কোম্পানীতে। কাজ সেরে নিজের অফিসে পুনরায় সে যখন পৌঁছল, বেলা তখন প্রায় একটা।

নিজের চেম্বারে এসে ঢুকতেই সে একেবারে অবাক। শ্রীমতী নীনা তার অপেক্ষায় ব'সে রয়েছে একখানা চেয়ারে। তা'কে দেখে নীনা হাসিমুখে তাকালো।

সুধাংশু বললে, তুমি যে হঠাৎ এখানে?

নীনা বললে, কৈফিয়ৎ নিতে এলুম। বোনকে কি একেবারেই তুমি ত্যাগ করেছ?

একেবারেই না! কিন্তু আর কি অভিসন্ধি নিয়ে এসেছ তাই বলো।

নীনা হাসলো। বললে, মেয়েরা সব সময়ে অভিসন্ধি নিয়ে বেড়ায়, এই বুঝি তোমার ধারণা?

একেবারেই না! তবে কিনা—

তাহ'লে শোনো।—বলে নীনা পুনরায় বললে, নিজের অহঙ্কার নিয়ে আগে ভাবতুম, নরদেবতারা আমার দরজায় দাসখৎ না লিখে স্বর্গে যেতে পারবে না। কিন্তু সে-ভুল এতদিনে ভাঙলো। এখন দেখছি, সত্যকার যে দেবতা, তার মন্দিরে না গেলে তার দর্শন পাবো কেমন করে? তাই আজ হঠাৎ এসে পড়লুম বড় ভাইয়ের চরণ দর্শনে।

সুধাংশু স্থির হয়ে ব'সে বললে, তারপর? তোমাদের ওপাড়ার খবর কি বলো, শুনি।

নীনা বললে, যাদের জীবনে নিত্য বিড়ম্বনা, তাদের নতুন খবর কিছু তো নেই। কিন্তু এবার আমি নিজের কথাটা ভাঙি, দাদা।

বলো কি হুকুম?

হুকুম? তোমাকে? প্রার্থনা জানালে ভগবানের মন টলানো যায়—কিন্তু তুমি? তোমার শান্ত বুদ্ধির পাশে যে বজ্রের কাঠিন্য রয়েছে, নিজে অন্ধ বলে আগে তাকে চিনতে পারিনি।

সুধাংশু বললে, মুখের ওপর প্রশংসা করলে তাকে কি বলে জানো?

জানি।—নীনা বললে, তার নাম চাটুবাক্য। কিন্তু তুমি একথা নিশ্চয় জানো, অহোরাত্র চাটুবাক্য যারা শোনে—তারা অত্যন্ত আত্মাভিমানী। তারা অন্য লোককে মিষ্টবাক্য বলতে বড়ই কুণ্ঠিত হয়। তোমার কাছে আমার আর তো কোনো স্বার্থ নেই, দাদা।

সুধাংশু হাসিমুখে বললে, কি কথাটা ভাঙতে এসেছিলে, এবার বলো দেখি?

বুলি—এই ব'লে নীনা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কয়েক তাড়া নোট বা'র ক'রে সুধাংশুর সামনে টেব্‌লের ওপর রাখলো। তারপর বললে, আমাদের জীবন-যাত্রার ইতিহাস তুমি জানো না, এ আমি বিশ্বাস করিনে। আমরা বয়সটাকে ভাঙিয়ে খাই, এইটেই মূলধন। এটা যেদিন নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে যাবে, সেদিনের সেই শোচনীয় চেহারাটা আমরা আগেই দেখতে পাই। সুতরাং সেই পরিণতির আগে যদি কিছু সংস্থান রাখতে পারি, তারই জন্যে তোমার দ্বারস্থ হলুম। হাজার দশেক টাকা আমি জমিয়েছি, এটার ভার তুমি নাও, দাদা।

সুধাংশু বললে, কিন্তু এ দায়িত্ব আমি কেমন ক'রে নেবো, বোন?

নীনা বললে, তোমাকেই নিতে হবে। তোমার বনস্পতির নীচে

অনেকে আশ্রয় পেয়েছে, সে-আশ্রয় এ অভাগীও চায়। একদিন কোথাও যদি দাঁড়াবার ঠাঁই না থাকে, সেদিন তুমি তোমার ছোটবোনকে ফেলে দেবে না, এই বিশ্বাস নিয়েই আজ তোমার দরজায় এসেছি, দাদা।

সুধাংশু হেসে বললে, কিন্তু ব্যবসাদারের কাছে কোন্ বিশ্বাসে এত টাকা রাখছো?

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নীনা হাসতে লাগলো। বললে, বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে অন্তত একটা বিষয়ে খুশী হবো। জানবো তুমি আমাদেরই মতন রক্তমাংসে গড়া মানুষ, তুমি ঠাকুর-দেবতা নও!

এমন সময় বাইরে একটা অস্ফুট কোলাহল শোনা গেল।

সুধাংশু এবং নীনা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে শুনলো, বাইরে নারীকণ্ঠের আওয়াজে অফিসের দোতলাটা মুখর হয়ে উঠেছে।

সুধাংশু বেল বাজালো। একটু পরেই একজন চাপরাশি এসে ঢুকলো, এবং প্রশ্নের উত্তরে জানালো, একজন মায়িজী এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ব্যাপারটা কি অনুধাবন করার আগেই হাঁকডাক দিয়ে চেঁচামেচি করে বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে সুরবালা দড়াম ক'রে দরজা ঠেলে সুধাংশুর ঘরে ঢুকলেন।

আড়ষ্ট হয়ে সুধাংশু ব'লে উঠলো, এ কি, আপনি? আপনি এখানে কেন?

সুরবালা উচ্চকণ্ঠে হেসে বললেন, তোমার অপিসবাড়ি দেখতে এলুম গো বাবাজি। ওমা, এ মেয়েটি কে? তুমি কে গা বাছা?

উনি আমার ছোটবোন।

ছোটবোন! এমন ভুঁইফোড় বোন তোমার এলো কোত্থেকে বাবাজি?—সুরবালা চোখ দুটো বাঁকিয়ে নিজেরই বুদ্ধির তারিফ করে

বললেন, হুঁ! তাহ'লে যা রটে, তার কিছু বটে! এ-ঘরে তোমার বোন, ও-ঘরে একদল ছুঁড়ির আড্ডাখানা—তাহ'লে বলো মেয়েমানুষের দল নিয়েই তোমার কাজ-কারবার?

সুধাংশু সহসা গরম হয়ে উঠলো। বললে, এটা আমার অফিস, চারদিকে কর্মচারীরা কাজ করছে, আশপাশে চাকর চাপরাশির দল,—এখানে আপনার আসা উচিৎ হয় নি।

আর বাবা!—বলে সুরবালা সশব্দে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, আসি কি সাধে? প্রাণের দায়ে আসি মেয়েটার শুক্‌নো মুখের দিকে চেয়ে। তুমি তো বাবা আগে এমন ছিলে না, টাকার মানুষ দেখে পাঁচজনে তোমাকে নষ্ট করতে বসেছে!—ওমা, ওকি? অত টাকা কেন তোমার টেবিলের ওপর? এই মেয়েটিকে বুঝি দিচ্ছ?

সুধাংশু বললে, না, ওটাকা ওঁরই।

মুখব্যাদান করে সুরবালা হেসে উঠলেন। বললেন, অত টাকা কি আর মেয়েমানুষের হয়? ওটাকা তোমারই। তা বেশ তো, তোমার আছে তাই দাও। কিন্তু আমার মেয়ের দুর্দশার কথাও মনে রেখো। কপালগুণে নবাবের হাতে পড়লো, কিন্তু বাঁদী হয়ে রইলো তোমার ঘরে।

সুধাংশু ক্ষুব্ধরোষে বললে, আপনি এসব কথা বাড়িতে গিয়ে আলোচনা করবেন, এখানে ওসব কথা থাক্!

বাবাজি, বড্ড ফাঁদে পড়ে গেছ, না? বাড়ির বাইরে এসে বউকে লুকিয়ে দিব্যি ঘরকন্না পেতেছিলে; কোথা থেকে এই বাম্‌নি এসে সব ফাঁস ক'রে দিলে—এই না?—সুরবালা আবার হেসে গড়িয়ে পড়লেন। তাঁর রুচিজ্ঞানহীন চাঞ্চল্য এবং অভদ্র ভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে সুধাংশুর মাথা হেঁট হয়ে এলো অপমানে।

উত্তপ্ত কণ্ঠে মুখ তুলে এক সময়ে সে বললে, আপনি কি জন্তে এসেছেন শীঘ্র বলে এখন বাড়ি চ'লে যান্।

তীব্র চাতুরীতে ভরা দৃষ্টি ফিরিয়ে সুরবালা বললেন, হ্যাঁ, শিগ্‌গিরই যাবো, তোমার অসুবিধে ঘটাবো না। তুমি যাওতো মা একটু এ-ঘর থেকে?

স্তম্ভিত বিবর্ণ মুখে নীনা এতক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসেছিল। সুরবালার কথায় এবার মুখ ফিরালো। সুধাংশু তার অবস্থা উপলব্ধি ক'রে বললে, তুমি ওই টাইপিস্টদের ঘরে একটু অপেক্ষা করো নীনা, আমি এখুনি আসছি।

নীনা তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার পথের দিকে তাকিয়ে সুরবালা চোখ মচ্‌কে বললেন, ছুঁড়ির হাঁটুনিটা একবার দেখলে, বাবাজি? হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে কি না, থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে! এত টাকা তোমাকে ঠকিয়ে নিচ্ছে, বাবাজি?

সুধাংশু বললে, আপনার সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল। আপনার কি বলবার আছে বলে তাড়াতাড়ি চলে যান্।

চট্ করে সুর বদ্‌লে সুরবালা বললেন, একখানা রিক্‌সা নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে তোমার এখানে এসেছি। আরো দু'একটা অফিসে গিয়েছিলুম —তা সবাই তোমার নাম জানে দেখলুম। হবে না? আমার রাজা জামাই যে!

অধীর হয়ে সুধাংশু বললে, কি বলবার আছে বলুন।

এই বলি। হ্যাঁ, এসব কথা শাশুড়ী-জামাইয়ের মধ্যেই থাক্, আমি কি আর এসব কথা বলতে যাবো ঢাক পিটিয়ে? এমন কত হয়। পুরুষ মানুষের অবস্থা ভালো হ'লে পাঁচটা মেয়েছেলে আসে বৈ কি পাঁচদিক থেকে। কিন্তু শাশুড়ী হয়ে আমি তো আর এসব কথা পাঁচ জায়গায় রটাতে পারিনে!

তার কণ্ঠের চাতুরী লক্ষ্য করে সুধাংশু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো।

সুরবালা বললেন, কিন্তু বাবা, একটা কথা! আমি এসেছি প্রা.. করার জন্য দায়ে। এবারের মতন পাঁচশো টাকা না পেলে আমি দায় উদ্ধার হ'তে পারবো না। টাকা না দিলে এবার ঠিক ঝগড়া করবো তোমার সঙ্গে।

আপনি কি টাকার জন্যে এসেছেন?

সুরবালা হাসলেন। বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, পদ্মাবতীকে আজকের কথা আমি কিছুই বলবো না, তোমাকে কথা দিচ্ছি। কিন্তু টাকা আমাকে দাও বাবাজি, টাকা নৈলে কিছুতেই আমার চলছে না।

সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষণে উপলব্ধি করে ঘৃণায় সুধাংশুর সর্বশরীর আড়ষ্ট হয়ে এলো। কিন্তু যে কঠোর পৌরুষ তাকে এতকাল সংগ্রাম ক্ষেত্রে শক্তি যুগিয়ে এসেছে, সেই শক্তির আকস্মিক চেতনা আজও তাকে কঠিন ক'রে তুললো। নিঃসঙ্কোচে সুস্পষ্ট কণ্ঠে সে বললে, কিন্তু আমি তো আপনাকে টাকা দিতে পারবো না।

কেন?

সুধাংশু বললে, আপনি এতকাল ধরে গোপনে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন, আজও তার কাছ থেকেই নেবেন। আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়!

সুরবালা বললেন, গোপনে পদ্মাবতীর কাছে টাকা নিই, এ তুমি জানলে কি করে?

আমি লুকিয়ে আমার বাক্সে টাকা রেখে ইচ্ছে ক'রে ভুলে যাই—আর সেই টাকা আপনার হাতে গিয়ে পড়ে। এই নিয়মই ষোল বছর ধ'রে চলে আসছে। মাত্র কয়েকদিন আগে আপনি এক হাজার টাকা নিয়ে গেছেন, তাও আমি জানি।

সুরবালা কিছু অসহায় বোধ ক'রে একটু দম নিলেন। তারপর বললেন, তাহ'লে কি আমাকে খালি হাতে চলে যেতে বলছো, বাবাজি?

উত্তপ্ত বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

এসে ‍টাকা তাহ'লে তুমি দেবে না ?

আপনাকে এভাবে টাকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সুরবালা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বেশ, তবে খালি হাতেই ফিরে যাই। কিন্তু টাকা তুমি দিলে না ব'লে আমি যে তোমার নিন্দে রটাবো, এমন শাশুড়ী আমি নই। তবে তোমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে যাই বাবাজি, তোমার শত্তুরের দল চারদিকে। আমার মুখ দিয়ে না বেরোলেও মেয়েছেলে নিয়ে গলাগলির কথা চাপা থাকে না, জানো তো ?—আচ্ছা, উঠি এখন।

এই ব'লে তাঁর সুচতুর কটাক্ষ একবার সুধাংশুর দিকে বুলিয়ে তিনি উঠলেন। বাইরে এসে চারদিকে চেয়ে দেখলেন, লোকজন কাজ করছে। কত আসরাবপত্র, কত কর্মতৎপরতা, কত আনাগোনা! কিন্তু 'আত্মপ্রচারের এমন সুযোগ তিনি ত্যাগ করতে পারলেন না। চাপরাশিদের একজনকে ডেকে বললেন, ওরে বেটা, শোন্ এদিকে। আমি হেজিপেজি লোক নই, বুঝলি? তুই যার মাইনে খাস—সে . ামার কে জানিস ? আমার জামাই! সাক্ষেৎ পেটের মেয়ের স্বামী। অমন জামাই ছিল, তাই তোদের অন্ন জুটছে!—এই ব'লে সোরগোল তুলে প্রায় একশত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে একজন চাপরাশিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত অফিসটা কানাকানিতে ভ'রে উঠলো।

স্তব্ধ মূঢ়তায় নির্বাক হয়ে সুধাংশু. নিজের চেম্বারে বসে ছিল। চোখের সামনে ফাইলগুলো জমে উঠেছে স্তূপাকার হয়ে, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। চিরকালই সে স্থিরবুদ্ধি, হিতাহিত বিবেচনাশীল, এবং সংযত প্রকৃতি। কিন্তু আজ সহসা তার সেই সংযমের বাঁধন কেমন যেন পৌরুষ হিংস্রতায় আলগা হয়ে এলো। অন্যায় করবার, আঘাত করবার, প্রতিহিংসা নেবার গুপ্ত প্রকৃতি তার ছাড়া

পেয়ে যেন তার চারদিকের সবাইকে এক একবার দংশন করার জন্য উদগ্র হয়ে উঠলো।

নীনা পুনরায় এসে ঘরে ঢুকলো, এবং বিনাবাক্যে আবার চেয়ারখানা টেনে বসে পড়লো।

সুধাংশু বললে, তোমার কোনো কৌতূহল নেই, নীনা?

নীনা বললে, সব কৌতূহলই তিনি নিজে মিটিয়ে গেছেন, আর জানবার কিছু নেই।

কিন্তু তোমার সম্বন্ধে তিনি কি ধারণা নিয়ে গেলেন, জানো?

জানি। এও জানি নিজের কাছে তিনি নিজেরই সম্ভ্রম যদি নষ্ট করেন, তবে তোমার বলবার তো কিছু নেই, দাদা!

এই পতিতা নারীর মুখের দিকে সুধাংশু একবার স্পষ্ট করে তাকালো। এ দুশ্চরিত্রা সন্দেহ নেই, নৈতিক শুচিতাকে এ পদদলিত করেছে একথা সবাই জানে, মানুষের আদিম বৃত্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এর পেশা—এও অতি প্রত্যক্ষ। কিন্তু একটু আগে তার বিরুদ্ধে কলঙ্কপ্রচারের ভয় দেখিয়ে যিনি তার কাছে টাকা আদায় করতে এসেছিলেন তাঁর ইতর ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীর তুলনায় নীনা কি এতই হীন?

কি ভাবছো, দাদা?

সুধাংশু সচকিত হয়ে বললে, ভাবছি তোমার টাকার কথা। তোমার টাকাগুলো এমন একটা জায়গায় আমানত রাখবো, যাতে কয়েক বছর বাদে তুমি বরাবর একটা মাসোহারা পাও। কেমন?

নীনা বললে, বড় ভাইয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তাঁর যে-কোনো ব্যবস্থাই মেনে নেবো তাই এসেছি। কিন্তু এবার আমি উঠি, ভাই—

নীনা উঠে দাঁড়ালো। তারপর হাসিমুখে বললে, আর কিছু না

হোক, এই টাকার সূত্রে তোমাকে যে যখন-তখন দর্শন করতে পারবো, সেও তো আমার কম লাভ নয়, দাদা!

সুধাংশু এতক্ষণ পরে পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে উঠলো। বললে, এবার যে তোমার অভিসন্ধিটা ধরা পড়ে গেল!

পড়ুক, মেয়েমানুষের পেটের কথা চাপা থাকে না।

দাঁড়াও—সুধাংশু বললে, তোমার কাজ মিটলো, কিন্তু আমার একটা কৌতূহল চাপা আছে, সেটা মিটলো না যে?

নীনা থমকে দাঁড়ালো। বললে, কি রকম?—ওঃ, শ্যামলীর কথা! আহা, বেচারী!

কেন বলো তো?

জানো তো, সেই লক্ষ্মীছাড়া তাকে কী দুর্দশায় ফেলেছে? ঘরের জিনিসপত্র সব বিক্রি করেছে, খাওয়া জুটছে না, বাড়ির ভাড়া দিতে পারে না, ঝি-চাকর কাজ ছেড়ে দিয়ে গেছে। মেয়েটা উপোস ক'রে পড়ে থাকে।

সুধাংশু বললে, কিন্তু মুজ্‌রো করতেও তো যেতে পারে!

বিনয় তাকে ঘর থেকে বেরোতে দেবে না। সেদিন এই নিয়ে ওদের ঘরে বচসা হয়। লোকটা বোধ হয় শ্যামলীকে মারধোর করেছিল।

সুধাংশুর কান দুটো রাঙা হয়ে উঠলো।

নীনা বললে, খবর পেয়ে আমি গিয়েছিলুম ওদের ফ্ল্যাটে, কিন্তু তোমার শ্যামলী কী একগুঁয়ে জানো ত? অত ডাকাডাকি, কিন্তু কিছুতেই দরজা খুললেনা। কাল রাতে শুনলুম, দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে সে কাঁদছে!

কিন্তু উপোস ক'রে আছে?

তাকে খাওয়াবার সাধ্য কারো নেই।—আচ্ছা দাদা, তুমি ওর একটা কিছু পাকা ব্যবস্থা করতে পারো?

সুধাংশু বললে, হয়তো পারতুম। কিন্তু তুমিতো জানো বোন, এসব

কাজ করতে গেলে বদনামগুলো নেড়ি কুকুরের মতন পিছু। এই ছোটে!

নীনা বললে, কিন্তু তুমিও যদি বদনামের ভয় করো তবে সংসারে ভালো কাজ করবে কে?—আচ্ছা, আমি এবার যাই।

নীনা সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে গেল।

*

*   *

বেলা পাঁচটার সময় সুধাংশু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কিছু টাকা সঙ্গে নিল, তারপর চাপরাশিকে দিয়ে নরেনকে ডাকতে পাঠালো। কিন্তু খবর পাওয়া গেল, নরেন শেয়ার মার্কেট থেকে তখনও ফেরেনি। সুতরাং সুধাংশু একাই পথে বেরিয়ে পড়লো। নরেনকে সঙ্গে নিতে পারলে ভালো হোতো, বিশেষ ক'রে এসব ক্ষেত্রে তার সহায়তা অপরিহার্য। কিন্তু শ্যামলীর সম্পর্কে কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নরেন মোটেই রাজী নয়। সে বলে, বুড়োবয়সে যখন কোনো গোয়ালে ঠাঁই পাবো না, তখন মুখ থুব্‌ড়ে পড়তে পারি তোমার ওই শ্যামলীর ডোবায়—তার আগে নয়। হাড়ি ডোম যাই হোক না কেন, তোমার যখন মন মজেছে, তুমি যাও। "ওঠো জয়রথে তব, জয়যাত্রায় যাও গো।"

সুধাংশু একখানা রিক্সা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল [illegible] নীচে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সে সোজা উঠে গেল উপরে। দরজার কাছে এসেই দেখলো, ঝি বাইরে থেকে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। সুধাংশুকে দেখে বললে, আপনি এসেছেন বাবা, ভালোই হয়েছে। কাল ও আপনার নাম করছিল।

সুধাংশু বললে, কি খবর?

খবর আর কি বাবা, ওই শুনুন দরজা দিয়ে—নিজের খেয়ালে গান ধরেছে! বুঝলে বাবা, চারদিন্ ধরে উপোস ক'রে পড়ে আছে।

হোক, এ
...কে জান! ছোঁড়াটা যদি ওর ঘাড়ে দত্যির মতন চেপে না থাকতো, ওর পাঁচশোটাকা রোজগার মারে কে?--খোলো, ওগো শুনছো—দরজা খুলে দাও গো মেয়ে, কে এসেছে দেখো। শুনছো? রায়মশাই এসেছেন নিজে।

সুধাংশু বললে, তুমি একে ছেড়োনা ঝি—আমি তোমাকে কিছু দেবো।—এই ব'লে পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার ক'রে ঝি-এর হাতে দিয়ে সে পুনরায় বললে, কিছু খাবার দাবার যোগাড় করো, আর বাকিটা তুমি নিয়ো।

আচ্ছা বাবা, আপনি ওকে ডেকে ঘ... ...সুন—আমি ঠিক সময়ে আসবো। এই ব'লে ঝি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

খুট্ করে এইবার দরজাটা খুলে গেল।

শ্যামলী সবিস্ময়ে বললে, তুমি?

তার পরিচ্ছদটা আলুথালু, চেহারাটা কিছু শীর্ণ, চুলের রাশ আগোছালো, এবং দুই চোখে অশ্রুর ধারা।

সুধাংশু বললে, তোমার গান শুনছিলুম বাইরে দাঁড়িয়ে। ভাবছিলুম তোমার আনন্দের সীমা নেই, তবে আবার চোখে জল কেন?

শ্যামলী হেসে বললে, এ চোখের জলও আনন্দের। আমি যে কৃষ্ণনাম করছিলুম এতক্ষণ!

বটে! কিন্তু এতক্ষণ কার জন্যে অপেক্ষা করছি... ...নি?

শ্যামলী বললে, ভগবানের। তাঁর পায়ের শব্দের দিকে কান পেতে ছিলুম।

সুধাংশু বললে, কিন্তু পিশাচের রাজ্যে তিনি পা দেন না!

নিশ্চয় দেন। তিনি সর্বব্যাপী।—এসো ভেতরে।

সুধাংশু ভিতরে এলো। শ্যামলী খুশী হয়ে গলায় আঁচল দিয়ে তার পায়ের কাছে প্রণাম করলো। তারপর মুখ তুলে বললে, পিশাচের

রাজ্যেও তিনি পা দেন তাই তাঁর নাম দয়াময়। কিন্তু তুমি হঠাৎ এই পাতকীর আঁস্তাকুড়ে পা দিলে কেন বলো তো?

সুধাংশু বললে, প্রতিভার অপমৃত্যু স্বচক্ষে দেখতে এলুম!

ভুল করেছো তুমি। প্রতিভাই যদি হই, অপমৃত্যু আমার কিছুতেই হবে না। অপমৃত্যু ঘটবে তাদের, যাদের ঘরে তোমার পায়ের ধুলো পড়েনি, দয়াময়! বলোতো আজ তোমার পূজো কী দিয়ে সাজাবো?

পূজো?—সুধাংশু শ্যামলীর দিকে হাসিমুখে তাকালো। হেসে বললে, পূজো নিতে আসিনি, এসেছি কিছু খেতে। শ্যামলী, ব্রাহ্মণ বড় ক্ষুধার্ত!

শ্যামলীর মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে এলো। বললে, কিন্তু খেতে দেবার তো কিছু নেই!

সে কি? এক কণা শাক, কি এক দানা অন্ন—কিছু নেই? তবে কি মিছেই এলুম দ্রৌপদীর ঘরে?

দাঁড়াও তবে, দেখি—ব'লে শ্যামলী অগ্রসর হতেই সুধাংশু বাধা দিল। বললে, থাক্, ভুলে যেওনা এটা কলিযুগ। এ যুগে শাকের কণা খেয়ে বলতে পারবো না, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট! একালে পেট ভ'রে না খেলে দৈববলও বুজরুকি। বরং একটা গান শোনাও দেখি! উপোস করা পাখির গলায় মধুসঞ্চার নাকি বেশি হয়, শুনেছি।

শ্যামলী তখনই গান ধ'রে দিল গুনগুনিয়ে—

"কিবা অপরূপ শ্যামরূপ,
তারে বারেক হেরে কলুষ হরে—
অপরূপ শ্যামরূপ!"

থাক্—সুধাংশু তার গানে বাধা দিল। বললে, ছি ছি, গলার মধ্যে একেবারে মরুভূমি জমিয়ে তুলেছো দেখছি। আচ্ছা শ্যামলী, এ জীবন তোমার ভালো লাগছে?

হেসে শ্যামলী বললে, খুব ভালো লাগছে।

কেন?

এই জীবনে হাসিমুখে নোংরা ঘাঁটার সাধনা করেছি। তাই তো ঠাকুরের দয়া পেলুম; তাই তো তুমি এলে!

সুধাংশু বললে, কিন্তু আমি ব্যবসাদার, আমি ছদ্মবেশী চতুর, আমার লোভ নাকি শিকারকে নিয়ে মর্মান্তিক খেলায় মাতে—এর পরেও আমার ওপর এত ভক্তি কেন?

শ্যামলী হেসে উঠলো। বললে, লজ্জা তুমি কিছুতেই দিতে পারবে না। যিনি নটরাজ, তিনি কালকটাক্ষে প্রলয়ও আনেন, আবার তিনিই মধুপূর্ণিমায় গোলাপের বুক ভ'রে দেন আত্মহারা গন্ধে। তোমাকে চিনতে পারিনে, চিনতে পারা যায় না, তাই তো তোমার পায়ে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি! তুমি আমাকে পায়ে ঠেলে দিও না, দয়াময়।

বলতে বলতে সহসা তার দুই চোখ জলে ভ'রে এলো।

সুধাংশু বললে, শ্যামলী, পুরুষ জন্ম-নিষ্ঠুর, জানো তো? তুমি জায়গা নিতে চাও পায়ের কাছে, আমিও তোমাকে পায়ে ঠেলে যাবো। আমার ঘর সংসার, আমার স্ত্রীপুত্র, আমার চারদিকে সমাজনীতির শাসন, এছাড়া প্রতিষ্ঠা, আত্মসম্ভ্রম—তোমার মতন দুশ্চরিত্রাকে জায়গা দিয়ে সব খোয়াবো, আমি কি এতই নির্বোধ বলতে চাও?

শ্যামলী বললে, তোমার সব থাক্, কিন্তু পৃথিবীতে দুশ্চরিত্রাদের জায়গা নিশ্চয়ই আছে। যদি ঠাকুরকে আমি মেনে থাকি, ঠাকুরই আমাকে জায়গা দেবেন। তোমার ভেতর দিয়েই তাঁর নির্দেশ আমি পাবো।

সুধাংশু বললে, কিন্তু জেনে শুনে ঠাকুরকে এই নোংরায় এনে বসাবে?

আমি আনবো, আমার সাধ্য কি? তিনিই আসবেন, আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন।

কেমন ক'রে নেবেন তিনি? তুমি তো তাঁকে ভালোবাসোনি? বিনয়কে তুমি ভালোবেসেছ, তবু সে তোমাকে নীচের দিকে নামালো কেন? অন্ধ, মূঢ়, অজ্ঞান ভালোবাসাকে প্রেম বলোনা, শ্যামলী। যে ভালোবাসা নোংরামিকেই বড় ক'রে তুললো, যার সঙ্গে অন্যায়, প্রতারণা, উৎপীড়ন, চাতুরী আর নীচতা জড়ানো,—সেই ভালোবাসা তোমার ঠাকুরের পায়ে দেবে কেমন করে? যার হাত ধ'রে প্রেমের তপস্যায় তুমি একদিন অকূলে গা ভাসিয়েছিলে, তারই পায়ের তলায় তোমার প্রেমের ঠাকুর যে পদদলিত হচ্ছে!

কম্পিত কণ্ঠে শ্যামলী বললে, তুমি কি বলতে চাও বিনয়কে আমি ভালোবাসিনে?

সুধাংশু বললে, একজনের জন্যে আত্মহারা হওয়া ভালোবাসা নয়, এই আমি বলতে চাই। তার তরুণ চেহারাটা তোমার ভালো লেগেছে, তার কঠিন স্পর্শের মাদকতা, তার নির্দয় পৌরুষ—এরাই তোমাকে ভুলিয়েছে। যে তোমাকে কল্যাণের পথ দেখালো না কোনোদিন, কেবলই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল, তার প্রতি আসক্তি কি পাগলামি নয়, শ্যামলী?

কিন্তু নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্যে তো বিনয়কে আমি ভালোবাসিনি, দয়াময়।

এও তোমার ভুল। যে-সাপটার আগাগোড়া বিষ, তাকে গলায় মালা ক'রে রাখা কোন্ বাহাদুরী? তুমি নিজেও তো বিষাক্ত হয়ে গেছ!

শ্যামলী বললে, কিন্তু একদিন সেই আমাকে মনে-প্রাণে তার সব মধু উজাড় ক'রে দিয়েছিল!

সুধাংশু বললে, পুরুষের দুরন্ত প্রবৃত্তির খেলাকে সব মেয়েই প্রথমটা

ভালোবাসা ব'লে ভুল করে। তারা নারীর সব রস-চৈতন্যকে বাসনার ছোঁয়ায় অভিভূত করে তুলতে জানে, কিন্তু তবু সে-বস্তু ভালোবাসা নয়। সেই ক্ষণস্থায়ী রসের খেলা কেবল নেশা, কেবল অন্ধ মাদকতায় ভরা!

শ্যামলী তর্কে মেতে উঠেছিল, এমন সময় ঝি একজন বামুন ঠাকুরকে সঙ্গে ক'রে নানাবিধ আহারাদির আয়োজন নিয়ে উপস্থিত হোলো। বললে, আয় বাবা আমার সঙ্গে, একেবারে ঠাকুরঘরেই রেখে আসবি।

বিস্মিত বিমূঢ় শ্যামলীর চোখের উপর দিয়ে ঝি ও বামুন ঠাকুর সোজা ঠাকুর ঘরের দিকে চলে গেল।

সুধাংশু বললে, তোমার এখানে ঠাকুর ঘর আছে নাকি?

কিন্তু শ্যামলী আর কোনো জবাব দিতে পারলো না, কেবল তার উপবাসী শীর্ণ চোখের কোল বেয়ে ঝরঝরিয়ে অশ্রু নেমে এলো।

বামুন ঠাকুর খাবারগুলো রেখে বেরিয়ে চলে গেল, এবং তার পিছনে পিছনে ঝি এলো বেরিয়ে। দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সে বললে, চাকরি আমি ছাড়িনি বাবা, কিন্তু ওই ছোঁড়া যদি ফের তোমার ঘরে আসে মা, আমি সেইদিনই চলে যাবো। আমি সেদিন কী যেন কাজে বেরিয়েছিলুম, এসে দেখি ছোঁড়া মারধোর ক'রে চলে গেছে—মেয়ের গায়ে দড়াদড়া কালশিরে! আমিও তক্কে রইলুম, দরজার গোড়ায় একবার পা দিলে হয়। যদি ঝেঁটিয়ে বিষ না ঝেড়ে দিই তবে আমি রাখাল মোদকের মেয়েই নই।—এই ব'লে সে গড় হয়ে একবার সুধাংশুর পায়ে প্রণাম করলো। পুনরায় বললে, বাবা, পাষাণী অহল্যা উদ্ধার হয়েছিল, এ মেয়েটাকেও তুমি বাঁচাও, বাবা। তুমি যমদূতের হাত থেকে একে উদ্ধার ক'রে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাও—দোহাই বাবা।

কিন্তু সুধাংশু ও শ্যামলী নিঃশব্দ নতমুখে বসে রইলো।

...এগারো...

এর পরে কয়েক মাস চলে গেছে। আদর্শবাদীর যে-প্রতিজ্ঞা ছিল তা ব্যর্থ হয়নি। সুধাংশু শ্যামলীকে তার কদর্য জীবন-যাত্রা থেকে তুলে নিয়ে একটি ভদ্রপল্লীতে বাড়ি ভাড়া ক'রে রেখেছে। শ্যামলীর সেই জীবন এখন আর নেই।

বয়সে শ্যামলী অনেক ছোট, সুতরাং এখন আর সুধাংশু তাকে যথেষ্ট খাতির ক'রে চলে না। নতুন বাড়িতে এসে সে বললে, তোর অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করবো, তোর একমাত্র উপাস্য দেবতা হোক সরস্বতী।

সুধাংশু তার ঘরে একখানি বীনাবাদিণী সরস্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছে। তারপর কিনে দিয়েছে একটি হারমোনিয়ম, দিয়েছে বেহালা, ম্যাণ্ডোলিন। বলেছে, তোর সঙ্গীতের চর্চা যেন কেবল দেবী ভারতীর দিকে ধেয়ে যায়। নীলপাখি যেমন উড়ে যায় শরতের আকাশে সোনার রৌদ্রে।

আসবাব পত্র কিনেছে, পোশাক পরিচ্ছদ অজস্র দিয়েছে—যা শ্যামলী জীবনেও কোনোদিন স্পর্শ করেনি। সোনার অলঙ্কার কিনে দিয়েছে নামজাদা দোকান থেকে। শ্যামলীর চেহারায় শ্রী ফিরে গেছে, নতুন ক'রে বয়সের উপরে এসেছে চাকচিক্য। কালো রংয়ের ভিতর থেকে কেমন একটি জ্যোতির্ময় তারুণ্য যেন আত্মপ্রকাশ করে।

আর একটা সর্ত ছিল সুধাংশুর সঙ্গে। অতীত জীবনকে ভুলতে হবে, এই ছিল শ্যামলীর প্রতি নির্দেশ। অতীতকালের কলঙ্ক, পাপ, অনাচার—এদের দাগ মন থেকে নিশ্চিহ্ন হতে হবে। অতীতকালের

বন্ধুর দল, আনন্দ-উৎসব, রসোল্লাস, সমাদর-বিহ্বলতা—এদের স্মৃতিও মুছে ফেলতে হবে। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অগ্রসর হওয়া যেমন মানুষের একমাত্র কামনা, তেমনি আপন অতীতলোক থেকে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে যেন শ্যামলীর যাত্রাপথ হয়। কোনোদিন কেউ তার ভালোবাসার পাত্র ছিল, কোনোদিন সে অন্ধকার গঙ্গার পথ ধরে অভিসার যাত্রা করেছিল,—এসব কাহিনী তাকে স্বপ্নবৎ করে ভুলতে হবে।

বলা বাহুল্য, শ্যামলী তার অতীত জীবনের প্রেতলোক থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলো। সে ভদ্রঘরের মেয়ে, একদিন তার ভদ্ররুচি ছিল,—সে নৃত্যগীতকুশলা, সে শিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মানুষ—এসব অস্বীকার করার কারণ ঘটেনি। তার আয়ত চোখে, তার মসৃণ ললাটে, তার সুদৃশ্য বিম্বাধরে—কোথাও অপমানের দাগ স্থায়ী হয়ে থাকেনি। পুষ্পাভরণা শ্যামলী আজও যখন নৃত্যরসে উচ্ছলিত হয়ে গান ধরে—সুধাংশু অভিভূতের ন্যায় চেয়ে থাকে এই অনৈসর্গিক অপ্সরার দিকে। সুধু নাচ, সুধু গান নয়, দেহলতার সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীতের সুধু ঐক্যসাধন নয়—নিত্য আনন্দময় আত্মার রহস্যশিখা যেন বিদ্যুৎঝলকের মতো তার চোখের সামনে জ্বলতে থাকে। সুধাংশু মুগ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে যায়।

বাহিরে যাবার স্বাধীনতা শ্যামলীর সম্পূর্ণ ছিল। তার খ্যাতি অজস্র, এবং সমাদর অসীম। আজকে তাকে বাধা দেবার কেউ নেই, কেউ তাকে শোষণ করবে না, টাকা না পেয়ে ছদ্মবেশী ভালোবাসা আর তাকে উৎপীড়ন করবে না। অতঃপর সে মুক্তি পেয়ে বেঁচেছে।

শ্যামলী যখন গানের ফরমাস রাখতে যায়, দাসদাসী, ড্রাইভার ও দোয়াররা যায় তার সঙ্গে। মাথুরের পালা গাওয়ায় তার যশ বেশী; তার আঁখর শোনার জন্য সভাস্থল হয় লোকে-লোকারণ্য, তার কণ্ঠের করুণ বেদনাভরা দরদে কত নরনারী হাউ হাউ করে কাঁদে।

যখন ফিরে আসে দিগ্বিজয় করে, অন্তত হাজার খানেক টাকা অনায়াসে আসে তার পিছু পিছু। কিন্তু অন্যমনস্ক শ্যামলীর কণ্ঠের অন্তঃস্থলে জনম-দুঃখিনী শ্রীমতীর বিরহ-বেদনাটা তখনও গুমরে-গুমরে কাঁদতে থাকে! টাকার দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, অলঙ্কার-আভরণ-পরিচ্ছদের প্রতি আসক্তি তার নেই। তার পদ্মপলাশ চোখদুটি ধ্যাননিবিড় হয়ে রয়েছে সেই 'শ্যামসুন্দর মুরলী মনোহরের' দিকে, তার পেলব সুকুমার দুখানি বাহু রয়েছে আত্মাঞ্জলী দেবার জন্য, দুখানি পা রয়েছে নৃত্যরসের ভিতর দিয়ে আকুলতাকে প্রকাশ করার সাধনায় এবং প্রাণসরোবরের রক্ত কমলদল রয়েছে প্রিয়দেবতার নৈবেদ্য সজ্জায়। শ্যামলী আর শ্যামলী থাকে না, সে হয়ে ওঠে কোন্ কল্পলোকবাসিনী।

প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেনি, পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে একথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা চলে। অফুরন্ত প্রাণশক্তি যার, অপরিমেয় যার সৃজনশীলতা —যত বিপর্যয় তার জীবনে ঘটুক না কেন, যত গ্লানি আর পঙ্কিলতার তলায় সে নিমজ্জিত হোক—সে অমৃত, তার মৃত্যু নেই! এক সময়ে ধূলিজঞ্জাল সে সরিয়ে ওঠে, আপন প্রাণের দাবাগ্নিশিখায় আপনাকে দগ্ধ করে, বিশুদ্ধ করে, নবজীবন দান করে। মৃত্যু যার নেই, বারম্বার মৃত্যুকে সে অতিক্রম করে, জয় করে, অপমৃত্যুকে সে লয় করে— আপনাকে চূর্ণবিচূর্ণ বিধ্বস্ত করে আবার আপনাকে নবীন আকৃতিতে সে গড়ে তোলে। বারবার আপন সৃষ্টির ভিতর থেকে বলে ওঠে, এই আমি, আমি আছি!

শ্যামলীরও মৃত্যু ঘটেনি, সে নবদেহ ধারণ করেছে। সুধাংশু তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেখেছে, এ মেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি! এমন প্রতিভাকে ধ্বংসের পথ থেকে টেনে সে ভুল করেনি। থাক্ তার পারিবারিক সমস্যা সহস্র প্রকার চিত্তগ্লানি নিয়ে, থাক্ তার পারিপার্শ্বিক সমাজ নানা অনুশাসনের দণ্ড হাতে নিয়ে, থাক্ পিছনে তার নৈতিক চেতনা

বিবিধ নীতির জয়ধ্বজা উচিয়ে—সে দেখে চলুক এই অপরূপার আত্ম-বিকাশ, সে তার অন্তর্গূঢ় চৈতন্যসত্তা দিয়ে উপলব্ধি করে যাক এই নারীর দৈবাত্মপ্রাণিত মাধুর্যরস।

প্রাণের আনন্দের অভাবে ফুলের চারাটা শুকিয়ে উঠেছিল, আলো বাতাস জলসেচন তার দরকার। শ্যামলী ভুলে গিয়েছিল বাইরের পৃথিবীতে এত স্বাচ্ছন্দ্য, এত আনন্দের তরঙ্গ। প্রবৃত্তির চক্রান্তে সে ছিল বাঁধা—কেবল সরীসৃপের ন্যায় অন্ধগুহার মধ্যে বসে বসে নিজেরই সর্বাঙ্গকে সে লালাসিক্ত রসনায় লেহন করেছে। সেই আত্মবিস্মৃত সম্ভোগের মূঢ় পাশবিকতা থেকে তার মুক্তি পাওয়া একান্ত দরকার। সুতরাং সুধাংশু তাকে একখানা ছোট মোটর গাড়ি কিনে দিয়েছে।

গাড়িখানা দুজনকে আপন পক্ষপুটে নিয়ে যেন উড়ে চলে নগরের অবিশ্রান্ত জনকোলাহলের ভিতর দিয়ে। শহরতলি পেরিয়ে চলে যায় সবুজ মাঠের দিকে। আকাশ সেদিকে প্রশস্ত, শিশিরভেজা বৃক্ষলতা যেন আনন্দিত অভ্যর্থনা নিয়ে তাদের পথে দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে চেয়ে শ্যামলীর মন নেচে ওঠে রসতরঙ্গে, তার সমস্ত আনন্দিত প্রাণ যেন নিজেরই কণ্ঠলগ্ন হয়ে অসহ্য পুলকে কাঁপতে থাকে। মৃদুমধুর স্বরে সে সুর ধরে—"জনম জনম হাম ওরূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তারই কণ্ঠের সেই অমৃত নিয়ে নির্মল মেঘশুভ্র গগনমালা যেন দিগ্‌দিগন্ত ঝলমল করতে থাকে। সুধাংশু তার আবেশময় চোখ তুলে বাইরে চেয়ে দেখে, যেন প্রকৃতির আনন্দকম্পনের সঙ্গে শ্যামলীর পুলকিত প্রাণ নিবিড় একাকার হয়ে গেছে।

সেদিন কথা তুলে সুধাংশু তাকে প্রশ্ন করলো, তোর আর কি অভাব আছে বল্।

শ্যামলী বললে, কিছু না।

মিছে কথা। তোর এই অল্প বয়স, এমন স্বাস্থ্য, ললিতকলায় তোর এত অনুরাগ, তোর প্রাণের এত রসকল্পনা, তোর গানের সুরে এমন সোনার স্বপন, এত বিরহচেতনা,—তুই কি বলতে চাস সব অভাব তোর মিটেছে?

শ্যামলী বললে, ঠাকুর, তোমাকে তবে বলবো সত্যিকথা। আমার অভাব কিছু থাকার কথা নয়—সব আমি পেয়েছি এতদিন ধরে। রক্ত মাংসের ক্ষণউত্তেজনার কথা নিশ্চয় বলছ? কিন্তু তুমি কি বলতে চাও—সাত বছরের অশ্রান্ত দেহলালসায় আমার ক্ষুধা মেটেনি? আমার হৃদয়, আমার প্রাণ—এরা কি আজও দেউলে হয়নি? দেহটা খরচ হয়েছে অবিশ্রান্ত, লালসার আগুনে বয়সটাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে এতকাল জীর্ণ করেছি; স্নায়ুতন্ত্র এত নিস্তেজ যে, অনুরাগের কল্পনা আর সেখানে ঠাঁই পায় না,—তবুও তুমি বলবে আমার অভাব আজো মেটেনি?

সুধাংশু বললে, কিন্তু মৃত্যুর ওপর তোদের ভয়ানক লোভ, তোদের নৌকো কিছুতেই ঘাটে বাঁধা থাকতে চায়না, বার বার তোরা অকূলের দিকে ভেসে যাস।

শ্যামলী বললে, দয়াময়, যদি সাহস দাও একটা কথা বলি। তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

অতি পরিষ্কার কথা। কোনো সম্পর্ক নেই!

তবে তুমি এত করলে কেন আমার জন্যে?

তোর জন্যে তো করিনি, কৃষ্ণবিরহিনীর মূর্তি গড়ে তুলেছি আমার প্রাণের রঙে রাঙিয়ে।

কিন্তু একেই তো ভালোবাসা বলে ঠাকুর?

জানিনে।

ভালবাসা তুমি জানোনা? ভালোবাসা যদি না জানো তবে আমাকে পাঁক থেকে তুলে আনলে কেমন করে?

পাঁক থেকে পঙ্কজিনীকে এনেছি ঠাকুরের চরণে তাকে সঁপে দিতে তোকে নষ্ট হতে দেবো না সেই আমার পণ।

শ্যামলী থামলো। থেমে আবার বললে, আমার সংশয়কে ক্ষমা করো, ঠাকুর। এতদিন ধরে তোমাকে দেখছি, তবে কেন আজো তোমার মনের ধরা ছোঁওয়া পেলুম না?

সুধাংশু বললে, মন নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্যে তো তোর এখানে আসিনে?

তুমি কি আমাকে একটুও ভালোবাসোনা?

বাসি বৈ কি। কিন্তু এখবরটার জন্যে তুই এত উৎসুক কেন?

জানোনা তুমি, ঠাকুর। সংশয় হোলো মেয়েমানুষের দুই চোখের বিষ। তুমি আমাকে অস্থির করে তুলেছ।

সুধাংশু বললে, তোর মতন একটা পথের মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসা নিয়ে নাচানাচি করবো, আমি কি এতই ছেলেমানুষ?

কিন্তু আমি যদি তোমাকে ভালোবাসি?

তোর খুশি।

তোমার আনন্দ নেই তাতে?

তোর মুখের কথায় আনন্দ নেই। তোকে যে-ভাবে গড়তে চাই সেই ভাবে তুই গড়ে উঠলেই বুঝবো ভালোবাসো।

শ্যামলী বললে, ঠাকুর, তবে আর একটা সত্যি কথা শোনো। অজ্ঞান আসক্তির মধ্যে আমি ছিলুম এতদিন, কিন্তু তুমি এবার আমাকে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলেছ। যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক নেই, সেখানে তোমার এত অজস্র দান নিয়ে আমি কী করবো? এসব তো গুরুভার বোঝা, স্তূপাকার জঞ্জাল—যদি এর মধ্যে প্রাণ না থাকে। আমি যে কিছু দেখতে পাইনে আমার ভবিষ্যৎ। তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চললে? কোথায় নিয়ে গিয়ে পথের ধারে ফেলে পালাবে?

সুধাংশু বললে, কিন্তু তুই যে বলেছিলি তোর ইষ্টদেবতার উদ্দেশে তার ভালোমন্দ জীবনমরণ সঁপে দিয়েছিস? তুই যে বলেছিলি তোর একাগ্র দৃষ্টি কেবল সেইদিকে?

শ্যামলী উত্তেজিত হয়ে বললে, হা ভগবান! পুরুষ, এটা তুমি বুঝলেনা, লতাটা গাছ বেয়ে উঠে তবেই তো আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকায়! গাছটা যদি না থাকে, তবে মাটিতে পড়ে সে-লতা যে দলিত হয়ে যাবে। তুমি না থাকলে সব সাধনাই যে মিথ্যে গো!

সুধাংশু বললে, আমি যে তোর কাছাকাছি আছি, তাতেও কি তোর মন ওঠেনা? তোকে নিয়ে বেড়াতে যাই, ঠাকুর দেখাই, বসে বসে তার গান শুনি, তোর ঘরকন্না গুছিয়ে দিই—এগুলো কি কিছুই নয়?

শ্যামলী হেসে বললে, মিথ্যে, সব মিথ্যে। তোমার কি চোখে পড়েনা দয়াময়, আমি একা, একান্ত একা? তুমি কি কোনোদিন বলেছ, শ্যামলী তোর আর ভাবনা কিছু নেই? একথা তুমি কি বলতে পেরেছ, আমার জীবনমরণের সব ভার তুমি নিলে? আমি কি কোনোদিন এই সাহস পেয়ে তোমাকে বলতে পেরেছি, ঠাকুর, তোমার পায়ে মাথা রেখে আমার যেন অন্তিম ঘনিয়ে আসে? না, তুমিও কিছু বলতে পারোনি, আমারও কিছু বলা হয়নি।

সুধাংশু বললে, কিন্তু তুই তো এতকাল ধ'রে অনেক পুরুষের সঙ্গেই সম্পর্ক পাতিয়েছিস?

হ্যাঁ, সেই জন্যেই এত সুখে ছিলুম, এত দুঃখে দিন কেটেছে ঠাকুর, সেই জীবনে আমোদ ছিল, পাগলামি ছিল, অনাচার ছিল—কিন্তু সংশয়ের অস্বস্তি ছিলনা। তুমি যে কত যন্ত্রণা দিচ্ছ তা তুমি জানো না, আমার কৃষ্ণসাধনাও যেন সংশয়ে ভ'রে উঠেছে।

ইজিচেয়ারে গা হেলান দিয়ে সুধাংশু বললে, তুই নতুন সমস্যা তু
চাস আমার জীবনে। মস্ত মুস্কিলে ফেলতে চাস! কিন্তু আমাকে
তুই কি করতে চাস, বল্‌ত?

তোমাকে বসাতে চাই সিংহাসনে! তুমি কেবলই দেবে, ি
নেবেনা, এ কেমন করে সম্ভব? তোমার কাছে ত্যাগ বড়, কল্যাণ
আদর্শ বড়, কিন্তু আনন্দ তুমি দাও কোথায়? তুমি পথ দেখাতে পা
কিন্তু পথের সাথী নও কেন তুমি? তোমার সঙ্গে ভাব নেই, বি
নেই, তোমার সঙ্গে টানা পোড়েন নেই, তোমাকে নিয়ে আলো-ছা
খেলা নেই—কেবল তোমার পাষাণ ফলকেই পূজো দেবো, মূর্তি
উঠবেনা কোনোদিন? এমন শাস্তি তুমি আমায় কেন দিলে?—বল
বলতে শ্যামলীর গলা ধ'রে এলো।

সুধাংশু উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমি যাবো। কিন্তু এক
কথা তোকে বলি, তুই ভেবে দেখিস। সম্পর্ক কিছু নেই তোর সঙ্গে
কিছু হবে না কোনোদিন, হওয়া সম্ভব নয়। কথাটা অভদ্র হলেও তোকে
বলবো, অনেক পুরুষের সান্নিধ্য তুই পেয়েছিস, অনেক বীভৎস খেলায়
তুই মেতেছিস। তোর প্রতিভা, তোর বিদ্যা, তোর যৌবন—সবটা
মিলিয়ে অগ্নিকুণ্ড! এর কাছে আমি আসবো না, আত্মরক্ষা করতে
আমি জানি। আমি চেষ্টা করবো তোর প্রাণশক্তিকে উপর দিকে
তুলতে, নীচের দিকে নামাতে নয়। দুষ্প্রবৃত্তির বীভৎস অনাচার তুই
অনেক দেখেছিস, আমি আর তাতে ইন্ধন যোগাবো না। তোর দেহ-
লালসার মৃত্যু হোক, পুরুষের সঙ্গ তোর কাছে বিষবৎ হয়ে উঠুক,
সম্ভোগে তোর অরুচি আসুক—তোর দেহযৌবন যেন সূর্যমুখীর মতন
ফুটে ওঠে নারায়ণের দিকে। কোনো ক্ষুধার তাড়না, কোনো পাপের
আসক্তি, কোনো পুরুষের আসঙ্গস্মৃতি, কোনো রস-বিলাসের মোহ—
তোকে যেন আর চঞ্চল করে না তোলে। যদি কোনোদিন এর

বিপরীত কিছু দেখি, সেদিন তোকে ছেড়ে চলে যাবো—এই বলে সুধাংশু হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল।

*

* *

রয় এণ্ড ষ্টিভেন্স-এর অপিসে সুরবালার আবির্ভাবের সংবাদটা চাপা থাকেনি। সুধাংশু প্রথমে স্ত্রীর কাছে গোপনে এই সংবাদটি দিয়ে বলে, তোমার মা আমার অপিসে টাকা নিতে গিয়েছিলেন। আমার অপিসে তাঁর আনাগোনা আমি একটুও পছন্দ করিনে। দ্বিতীয়ত, জামাইয়ের কাছে হাত পেতে টাকা চাওয়াটা যে-কোনো শাশুড়ীর পক্ষেই সম্মানজনক নয়। তৃতীয়ত, কোম্পানীর টাকা কোম্পানীর আপিস থেকে বাইরের লোকের হাতে গেলে অডিটে গোলমাল ঘটে—সুতরাং দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি একখানা চিঠি লিখে তোমার মাকে মানা করে দিয়ো, ভবিষ্যতে যেন তাঁর গতিবিধি সংযত রাখেন।

সুরবালা কোন্ কৌশলে সুধাংশুর কাছে টাকা আদায় করতে চেষ্টা করেছিলেন, সে কথাটা প্রকাশ করে সুধাংশু মেয়ের কাছে মায়ের সম্ভ্রমকে বিপন্ন করেনি।

চিঠিখানা হয় তো পদ্মাবতী মায়ের কাছে যথাসময়ে লিখেই থাকবে কিন্তু সে কথাটা আর সুধাংশুর কানে ওঠে নি। কিন্তু তার সম্বন্ধে এরই মধ্যে বিচিত্র জনশ্রুতি আত্মীয়মহলে ছড়িয়ে পড়েছে, এর প্রমাণ প্রতিদিনই পাওয়া যাচ্ছে। এই সব জনশ্রুতির কতটুকু বিশ্বাস করা সঙ্গত, সে কথা পদ্মাবতী জানে। কিন্তু জনশ্রুতি যত অদ্ভুত আর আজগুবী হোক না কেন, তার বারম্বার পুনরাবৃত্তিতে একটা সত্যের ছদ্মবেশ দানা বেঁধে ওঠে। খবরগুলো রটছে কোথা থেকে, কে রটাচ্ছে, এর মূলভিত্তি কোথায়, এর সত্য-মিথ্যা কতখানি—এসব বিচার করার সময় পদ্মাবতীর ছিল না। কিন্তু এটুকু সে বিচার করেছে, এর সমস্তটাই

মিথ্যা নয়। আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, পরিচিত—সকলে অকারণে এ বাড়িতে হানা দিয়ে তার শাশুড়ীর কানে খবরগুলি তুলে দিয়েছে, এ একটা অভিনব দৃশ্য। তাদের পারিবারিক বদান্যতা অথবা পরার্থপরতা যত বড়ই হোক—তাদের শত্রু সংখ্যা কম নয়, এইটিই এতদিনে পদ্মাবতী আবিষ্কার করলো। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, তার শাশুড়ী। বিবিধ প্রকার জনশ্রুতি আর রটনার আওতায় থেকেও তাঁর নিঃশব্দ অটলতা একটি দিনের জন্যও ক্ষুণ্ণ হোলো না, পুত্রের মর্যাদাহানিকর কোনো আলোচনায় একদণ্ডের জন্যেও তিনি যোগদান করলেন না। কেবল অতিশয় বিরক্তি ঘটলে তিনি হাসিমুখে বলে যেতেন, ওরে, তোরা জানিসনে। সুধাংশু যাঁর সন্তান, সুধাংশুর আচরণে তাঁর নাম কোনো-দিন ডুববে না!

পদ্মাবতী এই মহিলার অসাধারণ ধৈর্য ও প্রসন্নতার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। সে যেন তার সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা খুঁজে পায়।

কিন্তু পদ্মাবতীর ধৈর্য অসীম নয়। একদা এই জনশ্রুতি এত উৎকট ও অশোভন হয়ে তার কাছে দেখা দিল যে, তার অসহ্য হয়ে উঠলো। বাড়ির চাকরের হাতে চিঠি দিয়ে সে নরেনকে ডেকে পাঠালো।

অপরাহ্ন বেলা। সুধাংশু কোনোদিনই এই সময়টায় বাড়ি থাকে না। অজিত বাড়ি নেই। ও-মহলে তার মেয়েকে নিয়ে শাশুড়ী বিশ্রাম করছেন। নরেন এমন সময়ে এসে উপস্থিত হোলো।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বারান্দায় দেখলো, বোধ করি তারই জন্য একখানা চেয়ার পাতা। টেবিলের ওপাশে তার মনিব-পত্নী একখানা কাগজ ওল্টাচ্ছিলেন। নরেনকে দেখে পদ্মাবতী বললে, আসুন ঠাকুরপো।

সহজেই বোঝা গেল বাতাসটা বুক চাপা। নরেন চেয়ারখানায় বসে পড়ে বললে, কিঙ্করকে স্মরণ করেছেন কেন, দেবি?

পদ্মাবতী কাগজের দিকে চেয়েই বললে, আপনাকে ডেকেছি কেন, সে-গল্প কি নতুন করে বলতে হবে, ঠাকুরপো ?

মনিবগিন্নীর গলার আওয়াজে সাহেবী পোশাকপরা নরেন একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। বিনীতভাবে বললে, না বৌদিদি, গল্পটা অতি প্রাচীন, তবে ঘটনার চেহারাটা কিছু নতুন হ'তে পারে। কিন্তু একটা কথা বৌদিদি, সুধাংশুর মতন ছেলেকে নিয়ে যে নিত্যি নতুন গুজব রটবে, এতে আর আশ্চর্য কি ?

কিন্তু আমি যদি বলি ঠাকুরপো, আমার মা গিয়ে স্বচক্ষে অনেক কিছু দেখে এসেছেন ?

মুখ তুলে নরেন বললে, তার থেকে একটা আমাকে বলুন দয়া করে।

পদ্মাবতী বললে, একথা কি সত্যি নয়, একটি মেয়েকে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে উনি তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে চান ? মনে রাখবেন, আমার মা স্বকর্ণে শুনেছেন ওই সব কথাবার্তা !

নরেন হাসলো। বললে, বাংলা দেশের মেয়ের প্রতি এত অশ্রদ্ধা আমার নেই যে, এমন মিথ্যেকে সত্যি বলে মানবো। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমি জানি।—এই ব'লে নরেন নীনার কাহিনী প্রকাশ করলো, এবং ওই সঙ্গে বলে দিল, কলঙ্ক প্রচারে আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে আমার বলবার কিছু নেই, কিন্তু ভাই-বোনের নির্মল সম্পর্কে মনের ভুলেও কলঙ্ক ঢেলে দেবেন না !

পদ্মাবতী কিয়ৎক্ষণ নীরবে রইলো। তারপর কিছু শান্ত কণ্ঠে বললে, রাস্তায় নাকি অনেকে দেখেছে, উনি আপনাদের অপিসের দুজন লেডি টাইপিস্টকে গাড়িতে তুলে নিয়ে—

থাক্ বৌদিদি, আপনার মুখ থেকে ওকথা শুনলে আমি আর কোনোদিন আপনার সামনে মাথা তুলতে পারবো না। এ খবর কেবল মিথ্যেই নয়, কোনো হীনচেতা ব্যক্তির ঈর্ষা আর নির্লজ্জ স্বার্থপরতা

থেকে এই কুৎসিৎ খবরের জন্য! এই ব'লে নরেন তার রোষক্ষুব্ধ দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

পদ্মাবতী আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করলো, আপনি অনেক অপ্রিয় আর আপত্তিকর কথা আমার কাছে বরং চেপে গেছেন কিন্তু কোনোদিন মিছে কথা বলেননি—তাই আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আচ্ছা ঠাকুরপো, একথা কি আপনি শোনেননি যে, একটি লেডি-টাইপিস্টকে অনেক টাকা বকশিশ দিয়ে উনি তার বিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন?

এ কথার মানে কি, বৌদিদি?

মানে বুঝবেন না, এমন ছেলেমানুষ তো আপনি নন্ ঠাকুরপো?

নরেন গুছিয়ে সহজ হয়ে বসলো। তারপর হাসিমুখে বললে, বৌদিদি, আপনার স্বামী এখন বাড়ি নেই, এ সময়ে বাড়িতে থাকেনা—একথা জেনে আপনিও আমাকে ডেকেছেন, এবং আমিও জেনেই এসেছি, এসময়ে সে উপস্থিত থাকবেনা। সে আমার মনিব একথা বাদ দিলুম, সে আমার আবাল্য বন্ধু। আপনার স্বামীর সম্বন্ধে বাজে গুজবে আপনি যদিও বা বিশ্বাস করেন, আমি আমার আবাল্য বন্ধুর নামে কোনো আজগুবী অপবাদ বিশ্বাস করবো না। আমি তাকে চিরদিন জানি। কেবল জানি নয়, তার মনোজগতের সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনীও আমার করতলগত। সে যে কেবল সংযত আর সচ্চরিত্র তাই নয়, সে হোলো গাঙ্গেয়—গঙ্গার ধারার মতো তার স্বভাব শুচিশুদ্ধ—এ কথা আপনি বিশ্বাস করুন। যে-ঘটনার কথা আপনি বলছেন, সেটি সত্য নয়, কোনো গোয়েন্দার রটনামাত্র। ঘটনাটা হোলো এই, একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের শিক্ষিত মেয়ে আমাদের ওখানে টাইপিস্ট হয়ে ঢোকে ষাট টাকায়। কিন্তু হঠাৎ একটি ভাল পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হয়। সুধাংশু আঁচ করতে পারলো, মেয়েটির গরীব মা-বাপ বিয়ের খরচ জোগাড়

করতে পারবে'না—সুতরাং কিছু টাকা গ্রাচুইটির মতন ক'রে সে মেয়েটিকে দেয়। বৌদিদি, যদি কোনো দৈনিক সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদকের সঙ্গে সুধাংশুর আলাপ থাকতো, তবে ছাপা অক্ষরে সুধাংশুর দানশীলতার বিজ্ঞাপন একটু আধটু বেরুত বৈ কি।

নিঃশব্দ মনোযোগে পদ্মাবতী নরেনের কথাগুলি শুনে গেল। তারপর বললে, ঠাকুরপো, এই কাজই ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক, এ আমি জানি। কিন্তু ওঁর যশের হাওয়াটা সম্প্রতি কদর্য সন্দেহে ঘুলিয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। উনি এখন বাড়ি নেই, এ সময়ে আপনাকে ডেকে ওঁর স্বভাব চরিত্র নিয়ে গোপনে আমি আলোচনা করবো, কিম্বা আপনাকে ঘুষ খাইয়ে কথা বার করে নেবো, এ আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আপনাকে ডেকেছি নির্ভুলভাবে সব কথা শোনার জন্যে।

নরেন বললে, সুধাংশুকে জিজ্ঞেস করলেও আপনি সব নির্ভুলভাবে জানতে পারতেন, বৌদিদি।

পাছে তিনি আমাকে ভুল বোঝেন, তাই তাঁর কাছে কোনো কথা পাড়িনি, ঠাকুরপো।

এমন সময় চাকর এসে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ টেবলের ওপর রেখে চলে গেল। নরেন বললে, একটা কথা বলি, বৌদিদি। হয়ত এটা অপ্রিয়, হয়ত বা আমার মুখে অশোভন। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে চরিত্র-সন্দেহের বাসা বাঁধলে সেই সংসার কিছুতেই টেঁকে না, আমি ব্রহ্মচারী হলেও একথাটা বিশ্বাস করি। পুরুষকে সন্দেহ করে মেয়েরা দুঃখই পাবে, কিন্তু প্রতিকার করতে পারবে না। তা ছাড়া সুধাংশুর মতো লোক যদি অন্যদিকে মনের খেলা খেলে, কিম্বা আমার মতন লোক যদি তাকে নিয়ে বাইরে-বাইরে কোনো দুর্নীতির চক্রান্তে ঘোরাফেরা করে, তবে আপনারা কি কখনও টের পাবেন? পুরুষের স্বভাব বিড়ালের মতন। চুরি ক'রে তারা খায় অতি কৌশলে, তারা আনাগোনা করলে

পায়ের শব্দ কেউ পায় না, খেয়ে দেয়ে মুখ মুছলে তাদের ধরা কঠিন,—আর তারা যখন তপস্বী সাজে, চোখে মুখে তাদের তখন কী অহিংস বৈরাগ্য! সংসারে কৌতুক অনেক যায়, কিন্তু সব চেয়ে বড় কৌতুক হোলো পুরুষকে নৈতিক চরিত্রবান করে তোলার হাস্যকর চেষ্টা।

পদ্মাবতী এতক্ষণ পরে হাসলো। বললে, আপনার কেবল তামাসা!

তামাসা কই করলুম বৌদিদি, তামাসা তো দেখেই চললুম। এই দেখুন না, আমার ওদিকটা একটু আলগা, সত্যি বলতে কি, স্ত্রীলোক সম্পর্কে আমি অনেকটা সংস্কারমুক্ত। কিন্তু এমন পোড়াকপাল, কেউ একটা গুজব রটায় না, একটা নিন্দেও ছড়ায় না। তারপর এই দেখুন না কেন, বেটারা নাকি বলে, নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, দেবতারাও নাকি জানেন না। মূর্খ দেবতা বেটাদের কান ধ'রে বলতে ইচ্ছে করে স্ত্রীলোক মোটেই দুর্জ্ঞেয় নয়, বরং অত্যন্ত স্পস্ট। ক্ষিধে পেলে খায় হামলে-হামলে, নরম-গরম বিছানা পেলেই শোয়, সুবিধে পেলেই পুরুষের কাছে স্তুতিবাদ আদায় করে, ডিম পাড়বার একটা নিরাপদ আস্তানা জুটলেই অমনি সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে চারদিকে গণ্ডী দিয়ে দেয়, প্রণয় ব্যাপার নিয়ে ঈর্ষা ঘটলে পেটের সন্তানকেও ভাসিয়ে দিতে কসুর করে না, রসের সন্ধান পেলে এক কথায় কুলত্যাগ করে যায়, আর স্বামীর ঘরে যদি থাকে তবে তো কথাই নেই—মুখের দুটো মিষ্ট কথায় লোকটাকে ভুলিয়ে ঘরের খোঁটায় বেঁধে রেখে সারাজীবন ধ'রে দোহন করে। ওরা সত্যিকথাও বলে না, স্পষ্ট কথাও জানে না,—তাই ওদের জানা আছে, গদগদ রসনায় মিথ্যেকে মনোহর করে তোলা—তাই ওদের প্রকৃতিকে দুর্জ্ঞেয় বলা হয়। ওদের স্বাস্থ্যটা নধর আর গায়ের চামড়া খানা পেলব হলেই আমরা বলি দেবী, আর এর বিপরীতটা দেখলেই বলি শাঁকচুন্নি। আসল কথাটা মহাত্মা তুলসীদাস ভালো বলেছিল, দিনকা বাঘিনী রাতকা মোহিনী! অর্থাৎ দিনের বেলা পুরুষের হাড়-

পাঁজরা ওরা চিবিয়ে খায়, আর রাত্তির বেলা চাঁদের আলোয় আর দক্ষিণ হাওয়ায় শিকারটাকে জারক রসে ভিজিয়ে লোল রসনায় লেহন করতে থাকে!—আঃ, গলাটা শুকিয়ে উঠলো দেখছি—

সরবতের গ্লাসটা নরেন তুলে নিল, এবং এক চুমুকে সেটাকে শেষ ক'রে দিল।

পদ্মাবতী তার ভঙ্গি দেখে হাসছিল। বললে, মেয়েদের নিন্দেয় তো আপনি পঞ্চমুখ, কিন্তু পুরুষমানুষরা বুঝি একেবারেই গোবেচারী ভালো মানুষ?

ভালো মানুষ? মোটেই না—ব'লে নরেন গ্লাসটা রাখলো। রেখে বললে, বরং ঠিক তার উল্টো। তবে কি জানেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান পুরুষও বোকা বনে যায় আপনাদের আঙুলের তুড়িতে। নৈলে পুরুষকে আর পায় কে? আচ্ছা বৌদিদি, আপনি বলতে পারেন কোনো চরিত্রহীন নারী পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছে? না, পারেন না। অথচ এমন শত শত চরিত্রহীন পুরুষের কাহিনী আপনার কাছে বলতে পারি, যাদের প্রতিভা আর মনীষা হোলো জগতের গৌরব। আসল কথা, সৃষ্টিকর্তা যে-পুরুষ তার দাম হোলো তার কীর্তিতে—তার চরিত্র ভালো, কি মন্দ—এটা কোনো যুগেই বড় কথা নয়।

পদ্মাবতী বললে, আপনি কি বলতে চান্ ঠাকুরপো, পুরুষ মানুষের সংযত চরিত্রের কোন দাম নেই?

নরেন বললে, খুব আছে বৌদিদি, কিন্তু সংযমটাই পুরুষ চরিত্রের প্রধানতম বিষয় নয়। পুরুষের পরিচয় হোলো তার সৃষ্টি প্রতিভায়। রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—এই মহাত্মাদের হাতে বাঙালী জাতির নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি। এঁরা ব্যক্তিগত জীবনে কে কি প্রকার চরিত্রের আদর্শ পালন করতেন তা নিয়ে কেউ মাথা

ঘামায় না। এঁরা বিরাট পুরুষ, বিরাট প্রতিভা—এইটিই বড় কথা।

কিন্তু নৈতিক শুচিতার আদর সব দেশেই আছে, ঠাকুরপো।

আছে বৈ কি। পুরুষের নৈতিক শুচিতা রক্ষার জন্য সমসাময়িক কালের সমাজে একটা হৈ চৈ দেখা যায়, তার কারণ, সমসাময়িক কালের সমাজ শৃঙ্খলার দিকে সাধারণ লোকের ঝোঁক বেশী। আজ যদি সুধাংশু রায়ের মতো কর্মীর চরিত্রে নৈতিক শুচিতার অভাব দেখা যায়, দেখা যাবে না আমি জানি—তাহলে যে-কেউ তার কলঙ্ক প্রচার করুক, সুধাংশু তাতে ছোট হবে না। বরং সত্যিকার মানুষ যদি কেউ থাকে, সে বলবে, সুধাংশু লোক সমাজের গৌরব।—এই বলে নরেন তার হাত-ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমি আসি বৌদিদি, আমাকে এখুনি একবার অফিসে যেতে হবে। নমস্কার।

মাথার টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে নরেন বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

···বারো···

মাঝখানে সুধাংশু একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলো। কেউ জেগে ছিলনা—এমন কি ঝি-চাকরও ঘুমিয়ে। বাড়ির প্রায় সব আলোই নেবানো, কেবল তার শোবার ঘরের ঘন সবুজ আলোটার আভাস রাস্তার দিক থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তার মোটর এসে থামতেই দারোয়ান গিয়ে নিঃশব্দে ফটকটা খুলে দিল। নীচেকার চাকর আলো জ্বাললো।

সুধাংশু কোনোদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করলো না, কেবল নীচেকার বৈঠকখানায় সে এসে শান্তভাবে যখন ব'সে পড়লো, তখন চাকর তার পায়ের জুতো মোজা ট্রাউজার কোট ইত্যাদি খুলে নিয়ে ধুতি পরতে দিল। ধুতিটি কোমরে জড়িয়ে সুধাংশু উপরে উঠে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

স্নান সেরে সে যখন শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো, রাত তখন প্রায় একটা। মাথার উপরে পাখাটা আস্তে আস্তে ঘুরছে। নরম নধর বিছানার উপর পা এলিয়ে সুধাংশু শুয়ে পড়লো।

ঘন সবুজ আলোয় একটা অস্পষ্ট আবছায়া জড়ানো ছিল, সেই আবছায়ায় পাশের খাটে পদ্মাবতী নিঃশব্দ চোখে জেগে ছিল, সেটি লক্ষ্য করা যায়নি। এবার পদ্মাবতী স্পষ্টকণ্ঠে বললে, তুমি খাবেনা কিছু?

সুধাংশু বললে, না বড়বউ, সাহেবের হোটেলে আজ পেট ভরে খাওয়া হয়েছে।

সেখানেই কি নেশা করেছ?

বাঃ বেশ কথা!—খেতে বসবো সাহেবের হোটেলে, আর নেশা

করবো বুঝি গঙ্গার ধারে শ্মশানঘাটায় ?—সুধাংশু জড়িয়ে জড়িয়ে হেসে উঠলো।

পদ্মাবতী বললে, তুমি যে বলতে রোজ রোজ নেশা ভালো লাগেনা ?

সুধাংশু বললে, আজকাল রোজই প্রায় নেশা করি, এই বলছ তো ?

শুধু নেশা নয়, রোজই ফিরছ প্রায় শেষরাতে। তুমিতো অবুঝ নও ! অজিত বড় হয়েছে একথাও কি তোমার মনে থাকেনা ?

সুধাংশু বললে, বড়বউ, তুমি তো জানো, [illegible] আমার কাছে কতখানি ঘৃণ্য ! কিন্তু তবু আমার দিক থেকে একটা কথা আছে বৈ কি।

পদ্মাবতী বিছানা ছেড়ে উঠলো। মাথার কাছের জানলাটা খুলে দিল। কৃষ্ণপক্ষের ধূসর মলিন জ্যোৎস্না নিদ্রিত নিস্তব্ধ নগরীর উপর শান্ত হয়ে নেমে এসেছে। জানলার নীচে বাগানে হেনার মৃদুগন্ধের ঝলক উপর দিকে ভেসে আসছিল। পদ্মাবতী স্বামীর পাশে এসে বসলো। বললে, তোমার দিকের কি কথা আছে তা আমার ঠিক জানা নেই, কিন্তু কানাকানির ঢেউ কোথায় এসে ঠেকেছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছনা ?

সুধাংশু বললে, বড়বউ, তুমি তো জানো এই মিথ্যে বদনামের জন্ম কোথা থেকে ? আমাকে অপ্রিয় আলোচনায় টেনে এনোনা বড়বউ।

পদ্মাবতী চুপ করে গেল। কিন্তু সে কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। তারপরই বললে, অপ্রিয় আলোচনায় আমারও রুচি নেই। তবু একথা বলতে চাই, তুমি যদি রোজ নেশা করে এত রাতে বাড়ি আসো, তবে কার মুখে চাপা দেবো, বলতে পারো ? যে-গৌরব নিয়ে এতদিন আমি সংসারের মাঝখানে বসেছিলুম, সেই গৌরব ঘুচে যাক্ এই কি তুমি চাও ?

সুধাংশু বললে, বড়বউ, আমি সেটা চাই কিনা, তা তুমি বেশ জানো। আমার সমস্ত জীবনের চেষ্টায় তোমাকে বড় আসনটাই দিতে চেয়েছি !

আজো কি তোমার সেই চেষ্টা আছে?

তোমার মনে যদি সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকে, তবে বুঝবো তুমি আগেকার সেই আত্মবিশ্বাস আর আত্মমর্যাদা হারিয়েছ, বড়বউ।

এরপরে দুজনেই চুপ করে গেল। পাশের ঘর থেকে ছেলেমেয়ের ঘুমের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বারান্দার বড় ঘড়িটার টকটক শব্দটা শোনা যাচ্ছে। চাঁদের আলোটা বাগান থেকে ঘুরে এসে পড়েছে তাদের বিছানার একধারে।

বড়বউ?

কি বলো?

পদ্মাবতীর গলাটা একটু ধরা দেখে সুধাংশু একবার থামলো। তারপর বললে, আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করোনা, বড়বউ? নরেনের সঙ্গে তোমার যেসব আলোচনা হয়েছে তার পরেও কি তুমি আমার ওপর অবিচার করতে চাও?

পদ্মাবতী বললে, আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করোনা তুমি।

সুধাংশু বললে, বেশ, আমি নিজেই তবে নিজের কথাটা তোমাকে বলবো। অবিশ্যি অনেক দিন থেকেই মনে করেছি বলবো। তার আগে একটা কথা সহজভাবে শোনো। এতদিন আমার সম্বন্ধে তুমি যা কিছু শুনেছ সব মিথ্যে, সমস্তটাই হাস্যকর। কিন্তু যে-ঘটনাটা সত্যি, তার ইসারা-আভাস আজ অবধি তুমি কিছুই পাওনি, বড়বউ।

পদ্মাবতী উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

সুধাংশু বললে, নিন্দে যারা করে তারা নিন্দুকমাত্র—মানুষের বিচার তারা করেনা। কিন্তু নিন্দুকের চক্রান্ত যদি তোমার আমার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে তবে তার চেয়ে দুঃখের কারণ আর কিছু নেই, এই কথাটা তুমি মনে রেখো। তুমি কি মনে করো, দুটো কানাকানিতে আমি তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়বো? তুমি কি বলতে চাও,

দু'চারটে মিথ্যে কলঙ্করটনায় আমার আসল পরিচয়টা কর্পূরের মতন উড়ে যাবে? না, তা সম্ভব নয়! তোমার গৌরব আর মর্যাদা আশা করি এত ক্ষণভঙ্গুর নয় যে, সামান্য পরীক্ষাও সে সইতে পারবেনা। তোমার ব্যক্তিত্বটা দুর্বল বলেই আজ সংশয় তোমাকে ঘিরেছে!

স্বামীর কথা পদ্মাবতী নিঃশব্দে শুনছিল।

সুধাংশু বললে, যাকগে। আজ তোমাকে একটি মেয়ের কথা বলবো বলেই এই ভূমিকার অবতারণা, বড়বউ। মেয়েটির বাড়ি নবদ্বীপে, নাম শ্যামলী। একটি ছেলের সঙ্গে সে কলকাতায় আসে পালিয়ে, কিন্তু ছেলেটি কিছুকাল পর থেকেই শ্যামলীর ওপর উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করে। ফলে, মেয়েটি বেশ্যাবৃত্তি করে পেট চালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিপদ হোলো এই, সেই ছেলেটার জন্যেই মেয়েটি পাগল।

পদ্মাবতী বললে, সে আবার কেমন করে হয়?

হয় বড় বউ, এমন নাকি হয়ে থাকে। যাই হোক, এক বাগান-বাড়ির আসরে মেয়েটিকে আমি দেখি, এবং তার আশ্চর্য কীর্তনগানে মুগ্ধ হই। মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়, আর তারপরে কয়েক দফে আমি তাকে কিছু কিছু টাকা দিই।

তারপর?—পদ্মাবতী বললে।

আমি টাকা দিই কেন, এটা মস্ত প্রশ্ন। সত্যিই বলবো,—মেয়েটি প্রিয় হতে জানে, ভালোবাসা পেতে জানে। তার কাছে থাকাটাই যেন একটা আনন্দের ঝড় বয়ে যাওয়া। মেয়েটিকে আমি ভালোবেসেছি সন্দেহ নেই, কিন্তু নিঃস্বার্থ আর নিষ্কাম ত্যাগবুদ্ধি নিয়ে আমার ভালোবাসা যদি না দাঁড়ায়, তবে তো আমি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবো?

কের্তন গানেই তোমার এমন মন ভুললো?

সুধাংশু বললে, তোমার কথার রহস্য আমি বুঝি। মেয়েটি কালো, খুবই কালো—কিন্তু সুশ্রী, তন্বী, বয়স অল্পই। অত্যন্ত মুখরা, কিন্তু

কথাশিল্প জানে। এমন আত্মহারা আনন্দে প্রাণময় মেয়ে আগে আমার চোখে পড়ে নি। মেয়েটির ইষ্টদেবতা হলেন শ্রীকৃষ্ণ—কীর্তনই তার আরাধনা।

পদ্মাবতী বললে, কিন্তু তুমি কেন এর মধ্যে গেলে?

আমি না গিয়ে পারি নি, আমার বুদ্ধি বিবেচনা আমাকে টেনে ওর দিকে নিয়ে গেছে। আমি আমার ভালোবাসার আদর্শকে সার্থক করে তুলতে চাই, বড় বউ।

কিন্তু বেশ্যাকে নিয়ে তোমার কী আদর্শ?

সুধাংশু বললে, যদি মেয়েটিকে একবার তোমাকে দেখাতে পারতুম, তাহলে বুঝতে সে বেশ্যা নয়, মানুষকে যে এমন আনন্দ মাধুর্য দিতে পারে, সে মনে প্রাণে বেশ্যা হতে পারে না, বড় বউ। সে যাই হোক, তুমি শুনলে খুশী হবে আমি তাকে উদ্ধার করতে পেরেছি তার নোংরা জীবনযাত্রা থেকে। তার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিয়েছি।

পদ্মাবতী বললে, তার মানে?

মানে তাকে মানুষ করবো, বড় করবো, নিষ্কলুষ করবো—তাকে পদ্মফুলের মতন ফুটিয়ে তুলবো!

কিন্তু একথা জানাজানি হলে লোকে তো তোমাকে ভুল বুঝবে?

লোকে বুঝুকগে, তুমি না বুঝলেই শান্তি পাবো। বড় বউ, এটা মনে রেখো, আমার মনে-মনেও যদি অসাধুতা আর ভণ্ডামি থাকতো, তোমাকে এ কাহিনী কিছুতেই বলতে পারতুম না।

পদ্মাবতী বললে, তুমি কি রাত অবধি সেখানেই থাকো?

সুধাংশু বললে, মাঝে মাঝে বেশীক্ষণ থাকতে হয় বটে, তবে সে কচিৎ কখনো। বুঝতেই পারো, একটা ঝামেলা আছে। আমি তার সমস্ত রকমেই সম্মানজনক বিলিব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু সে বসে থাকে না, সে গুণী মেয়ে। নাচগানে সে অনেক টাকা রোজগার করে।

স্বামীস্ত্রীর কথাবার্তার ভিতর দিয়ে রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। জাগরণ-ক্লান্ত দুটি আয়ত চোখে জানলার বাইরে চেয়ে পদ্মাবতী অনেকক্ষণ বসে রইলো। এতদিন পরে স্বামীর মুখ থেকে সত্যভাষণ শুনে একদিকে সে যেমন খানিকটা স্বস্তিবোধ করলো, অন্যদিকে কেমন একটা অভিমানক্ষুব্ধ বেদনা তার সমস্ত অন্তরলোককে ঘিরে টনটন করতে লাগলো। একথা সে যেন প্রথম আবিষ্কার করলো, স্বামীকে সর্বপ্রকারে আনন্দিত করে রাখার সর্বাঙ্গীন যোগ্যতা তার নেই। অথচ স্বামীকে সে জানে। কোনো ইতরবৃত্তি, কোনো নোংরামি স্বামীর দ্বারা সম্ভব নয়, একথা মনে-প্রাণে সে বিশ্বাস করে বৈকি।

সহসা এক সময়ে সে তার সর্বশেষ প্রশ্ন করে বসলো, কিন্তু এভাবে তোমার কতদিন চলতে পারে?

সুধাংশু তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, বড়বউ, ভালবাসার চেহারা আমি তো দেখেছি। তোমাকে পেয়েছি, ঘরকন্না গড়েছি, অবস্থা ফিরিয়েছি,—কিন্তু এই ভালোবাসাটাকে বলে ভোগকেন্দ্রিক। কিন্তু অন্য ভালোবাসাটাও এবার আমি দেখে নিতে চাই—যে ভালোবাসাটাকে বলে ঐশ্বরিক। নিঃস্বার্থ ত্যাগ আর কল্যাণবোধ যার প্রাণ, যা দেহপিপাসাকে মোহগ্রস্ত করে না, যাতে বাসনার চাঞ্চল্য নেই,—সেই ভালবাসার পরীক্ষা করতে চাই একটি পতিতা কামাতুরা নিঃসহায় মেয়েকে নিয়ে। শ্যামলীকে নিয়ে তাই আমার ভালোবাসার আদর্শ সাধনা, বড়বউ।—বলতে বলতে সে চুপ করে গেল।

* * *

সকালের দিকে শ্যামলীর সঙ্গে কোনদিনই সুধাংশুর দেখা হয় না। বিকালের দিকে সে যায়, রাত প্রায় দশটা অবধি থাকে, তারপর বাড়ি ফেরে। এর ব্যতিক্রম কোনদিন ঘটেনি। তাকে কাছে পাবার, তার

সান্নিধ্যে থাকার যে আগ্রহ কয়েক মাস আগে শ্যামলীর ছিল, এখন তার অনেকটা কমে এসেছে। কিছুকাল থেকে আপনাতে সে আপনিময় হয়ে রয়েছে—যেন মানুষটা নিকটের, মনটা দূরের। সেই দূরের থেকে শ্যামলীর মনকে টেনে আনার ইচ্ছা সুধাংশুর বড় একটা দেখা যায় না। ঘরকন্নার অস্থি বাস্তব খুঁটিনাটির মধ্যে শ্যামলীর মতো মেয়েকে জড়িয়ে রাখা যে সম্ভব নয়, একথা সুধাংশু আগে থেকেই জানতো। শ্যামলীর যে এতখানি উন্নতি হবে, এ তার কল্পনাতীত ছিল।

তার বৈরাগ্যের পরিবেশটি অক্ষুণ্ণ ও অনাহত থাকুক, এই চেষ্টা ছিল সুধাংশুর মনে মনে। সেইজন্য এক-একদিন সে ইচ্ছাপূর্বক আসতো না, এবং কোনোদিন আধ ঘণ্টা মাত্র থেকে দু'এক কথা সেরে সে বাড়ি ফিরে যেতো। আবার কোনোদিন হয়ত শ্যামলী তার ছোট্ট ঠাকুর-ঘরটিতে বসে মৃদু মৃদু গান ধরেছে, সেই গানের দু'একটি কলি আড়াল থেকে শুনে সুধাংশু ঝিকে বলে সেদিনকার মতো চলে যেতো। তার ইচ্ছা হোতো না, শ্যামলীর একাগ্রতা নষ্ট করে। একটুখানি আত্মপ্রসাদের সঙ্গে অপরিসীম পরিতৃপ্তি নিয়ে সে ভাবতো, শ্যামলীকে সে নতুন করে সৃষ্টি করেছে নতুন জীবনে, এ কীর্তি তারই, এর চেয়ে বড় আনন্দ তার আর কিছু নেই। তার সব চেষ্টা এবার সার্থক হতে চলেছে।

শক্তিলাভ করেছে সুধাংশু। অনেক কথা রটেছে তার বিরুদ্ধে, অনেক কলঙ্ক লেপন করেছে লোকে তার কপালে, কিন্তু হার মানিয়েছে সে সব অপযশকে। আত্মশক্তি আর আত্মবিশ্বাসকে সে বড় করে তুলেছে, তাই কলঙ্ক আর অপবাদে কোথাও সে ছোট হয়নি। নিজের আসল চেহারাটা আবার সে দেখতে পেয়েছে।

এই রকম একটা রোমাঞ্চকর আনন্দলোকে অসীম তৃপ্তির সঙ্গে

সুধাংশু যখন বিচরণ করছে, সেই সময় একদিন একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটলো।

গত রাত্রে কথায় কথায় শ্যামলীকে সে বলতে ভুলেছে যে, তারই এক বন্ধুর বাড়িতে খিদিরপুরে আজ কীর্তনের ফরমাস আছে, মধ্যাহ্নের আগে শ্যামলীকে সেখানে যেতেই হবে। বন্ধুর মাতৃবিয়োগ ঘটেছে, সেজন্য শ্রাদ্ধবাসরে মাথুরের পালা গাওয়ার ভার তারই ওপর। রফা হয়েছে আড়াইশো টাকায়।

কথাটা সুধাংশুর মনে পড়ে গেল পরদিন ভোর বেলায়। বলা বাহুল্য, একপেয়ালা চা কোনমতে গিলে ধুতিপাঞ্জাবী চড়িয়ে তখনই সুধাংশু গাড়ি নিয়ে নিজেই ড্রাইভ্ করে বেরিয়ে গেল। আজ রবিবার, অফিসের তাড়া নেই, কোন কাজেরও হুজুগ নেই। সুতরাং সুধাংশু স্থির করলো, শ্যামলীকে খিদিরপুরে পৌঁছে দিয়ে মাথুরের পালা শুনে শ্রাদ্ধবাসরে জলযোগ সেরে সে তিনটায় বাড়ি ফিরবে। বিশেষ করে বিরহবিধুর মাথুরের পালাটা শ্যামলীর মুখ থেকে শোনবার আগ্রহ তার ছিল অপরিসীম। সুধাংশু পূর্ণগতিতে গাড়িখানা ছুটিয়ে চললো।

শ্যামলীর বাসার কাছে গাড়ি নিয়ে সে যখন পৌঁছল, বেলা তখন আটটা বাজে। মনে মনে তার কল্পনা ছিল, সকালবেলা হঠাৎ দর্শন দিয়ে শ্যামলীকে সে চমক লাগাবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলী অবশ্যই গান ধরবে—"প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ দেখিনু, দিন যাবে আজি ভালো!"

গাড়ি থামিয়ে ফুটপাথের ধারে রেখে সে সটান ভিতরে উঠে গেল।

নীচে ঝি চাকরের কাজ তখন শেষ হয়ে গেছে, এবং শ্যামলী গিয়ে ঢুকেছে বাথরুমে। চমকটা ভালো ক'রে দেবার জন্য সুধাংশু হাসিমুখে চুপিচুপি এসে ঢুকলো একেবারে শ্যামলীর শোবার ঘরে। শোবার ঘরে বাসি পাট তখনও শেষ হয়নি। সুধাংশু ভেতরে ঢুকে

সহসা এদিক ওদিক তাকিয়ে যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, এবং দু' মিনিটের মধ্যেই তার উৎসাহ অনেকটা যেন স্তিমিত হয়ে এলো।

ঘরের চারিদিকে একবার লক্ষ্য করে সে সামনের এলোমেলো বিছানাটার ওপর বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই মুখ ফিরিয়ে সে সরে এলো। মিনিট পাঁচেক ধরে ঘরময় অশান্তভাবে পায়চারি করে সে একখানা চেয়ার টেনে চুপ করে বসলো।

পনেরো মিনিটকাল এইভাবে অটল স্তব্ধতায় বসে থাকার পর বাইরে গানের গুনগুনানি শোনা গেল।

সদ্যস্নান সেরে একখানা বৃন্দাবনী শাড়ী জড়িয়ে কোনোমতে শ্যামলী এই ঘরের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, সহসা ঘরের ভিতর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে যেন আর্তনাদ করে উঠলো, একি, তুমি? হঠাৎ এত সকালে?

সুধাংশু মুখ ফিরিয়ে বললে, সকালের দিকে এলে বুঝি তোর ভারি অসুবিধে ঘটে?

তার গলার গম্ভীর স্বর ও মুখের চেহারা দেখে শ্যামলীর বুক কেঁপে উঠলো, মুখখানা বিবর্ণ হয়ে এলো। বললে, উঠে এসো, অন্যঘরে যাই।

না, এঘরেই বসবো।

চঞ্চল হয়ে শ্যামলী বললে, না, না, এঘরে তোমার বসা হবেনা, এখনও ঘর পরিষ্কার হয়নি। এসো, উঠে এসো।

হঠাৎ হেসে সুধাংশু বললে, শুনেছি তুই সিনেমার ছবিতে এক-আধবার অভিনয় করেছিলি। নাচগানে তুই যতই পাকা হোস, অভিনয়ে তুই এখনও কাঁচা। আয়না ধরে এখুনি ছাখ, তোর মুখে চোখে কী ফুটে উঠেছে! ভারি বিপদে পড়েছিস্ নয়?

নতমুখে শ্যামলী বললে, তোমার পায়ে পড়ি তুমি ওঘরে চলো।

না, আমি এঘরেই থাকবো। আচ্ছা শ্যামলী, তুই পরকে ঠকাতে

সুধাংশু বললে, এ যদি তোর অপরাধ হয়, তবে ক্ষমা আমি করবোনা—এত ছোট আমি নই, শ্যামলী। তোর নাম রেখেছিলুম আনন্দময়ী, এতে যদি তুই আনন্দ পেয়ে থাকিস—তবে আর অন্যায় কোথায়? বরং ভালোই করেছিস! অবিশ্যি আমি বোকার মতন তাসের ঘর তৈরী করছিলুম। তোর জন্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে বাড়িতে বিরোধ ঘটেছে, বদ্‌নাম রটেছে, আত্মীয়বন্ধুরা চটেছে, কিছু কাজেরও ক্ষতি হয়েছে। যাই হোক, আবার আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।—আচ্ছা, আজকের মতন আমি উঠি।

শ্যামলী কেঁদে বললে, আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু—কিন্তু তুমি এমন করে আমাকে ভাসিয়ে যেয়োনা!

সুধাংশু হাসলো। হাসিমুখে বললে, শ্যামলী, কাঁদবার দিন তুই অনেক পাবি, কিন্তু আজকের মতন আমার সঙ্গে হেসে নে। তোকে ভাসিয়ে যাচ্ছি, কেমন করে বললি? তুই দাঁড়াতে পেরেছিস, রোজগার করছিস, অভাব অভিযোগ নেই। এখন তো ভালোই থাকবি! কিন্তু আমি নিশ্চয় চলে যাবো, এবং আর কোনোদিন আসবোনা। তোর সঙ্গে যে চুক্তি আমার ছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

মুখ তুলে শ্যামলী বললে, এত নিষ্ঠুর তুমি তো নও, ঠাকুর?

হেসে উঠে সুধাংশু বললে, আমার ভালোবাসা তুই পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলি, আর আমি হলুম নিষ্ঠুর? শ্যামলী, আজ থেকে জানবো, তোর মৃত্যু হয়েছে, তোকে আমি পুড়িয়ে চলে গেছি।—এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

এমন সময় নীচের সিঁড়িতে লোকজনের কথাবার্তা শোনা গেল। ভারী গলায় আওয়াজ এলো—কই গো, মা কোথায়?

কে গোঁসাইজি? এই যে বাবা—বলে চোখের জল মুছে শ্যামলী

উঠে দাঁড়ালো। সুধাংশুর দিকে তাকিয়ে বললে আজ যে রাববার, কের্তন সাধার দিন। ওরা এসেছে।

এ ব্যবস্থাটা সুধাংশুরই সৃষ্টি। সপ্তাহে দুদিন একটি সুবিখ্যাত কীর্তনীয়া দলের সঙ্গে শ্যামলী নিয়মিত কীর্তন গান করবে—এই ছিল বন্দোবস্ত।

গোঁসাইজী তাকে দেখে হেঁট হয়ে নমস্কার করে বললে, বাবু আজ আছেন দেখছি, আমাদের সৌভাগ্য। বড় আনন্দ, আজ আপনাকে নাম শোনাতে পারবো। আহা মায়ের গলা আজকাল যেন সুধাকণ্ঠ!

যথারীতি দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায় তাঁদের আসরে এসে তাঁরা বসলেন। সুধাংশুও তাঁদের সঙ্গে এসে দাঁড়ালো। এই সুযোগে আমতা আমতা করে গোঁসাই বললেন, বাবু, মায়ের হাতে কাল টাকা ছিল না, শূন্য ঝুলি নিয়েই ফিরতে হয়েছিল। আপনার কাছেই আজ হাত পাতি। এ মাসের দরুণ আমাদের টাকাটা···

হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেবো বৈ কি—বলে সুধাংশু তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে মণিব্যাগ বার করে বললে, পঞ্চাশ টাকা—কেমন? এই নিন্—

টাকাটা গুণে সে গোঁসাইজীর হাতে দিচ্ছে, এমন সময় পিছন দিকে এসে শ্যামলী দাঁড়িয়ে সেটি লক্ষ্য করলো। টাকা পেয়ে গোঁসাইজীর কীর্তনীয়া দল সোৎসাহে আসরে বসে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে খোল, করতাল, খঞ্জনী বেজে উঠলো। শ্যামলী এসে বসলো ঠিক মাঝখানে। সুধাংশু বসলো পিছন দিকে।

শ্যামলীর সদ্যস্নাত মাথার চুল এলো করা, তারই উপর এধার থেকে ওধার অবধি মল্লিকার মালা জড়ানো। পরণে তার রঙীন পীতবাস। চোখে কাজলের আভাস, ললাট চন্দনচর্চিত। দুই হাতে ফুলের কাঁকন, গলায় গোলাপের মালা। গতরাত্রির বারবনিতার যেন জন্মান্তর ঘটেছে, আজ সকালে সে যেন অনুরাগ চঞ্চলিতা শ্যামবিরহিণী চির রাধিকা!

গৌরচন্দ্রিকা চললো প্রায় আধ ঘণ্টা। তারপর খোল, করতাল, খঞ্জনীর, ঝঙ্কার-ঝঞ্জনার পর সহসা শ্যামলীর দীর্ঘ মধুর কীর্তন যেন বাহিরের ওই নীলাভ আকাশকে [illegible]—

"বঁধু, কি আর কহিব আমি,
জনমে জনমে জীবনে মরণে,
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি—বঁধু গো—"

তার সমগ্র সত্তা আকুলকণ্ঠে যেন চিরজীবনের বিরহ বেদনায় একান্ত কান্না কেঁদে উঠলো, আর সেই বেদনার অন্তর্গূঢ় আবেদন গিয়ে পৌছল সুধাংশুর মর্মে মর্মে। এই গানের ভিতরে সত্যের যে ব্যাকুলতা ছিল, তারই নিবিড়তায় শ্যামলীর দুটি চক্ষে দেখতে দেখতে মর্মান্তিক অশ্রুর ধারা গড়িয়ে এলো, এবং সুধাংশুও যখন সহসা বুঝতে পারলো তার দুই চোখ অশ্রুতে অন্ধ হয়েছে, তখন সে নিঃশব্দে উঠে শ্যামলীর অলক্ষ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে সে যখন হন হন করে নেমে চলেছে, তখন সেই আগেকার ঝি কোথা থেকে বেরিয়ে তার পায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়লো। বললে, বাবা, তোমার গরীব মেয়েকে তুমি মাপ করো ওরা পঞ্চাশটে টাকা আমার হাতে দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করেছিল গরীব মানুষ টাকা পেয়েছি, তাই তোমার কানে কোনো কথা তুলিনি বাবা, আমাকে মাপ করো।

নিজেকে সামলে নিয়ে সুধাংশু বললে, না, না, তোমার কোনো দোষ নেই, ঝি। দোষ কারো নয়। আচ্ছা, আমি যাই এখন —বলে আর কোনোদিকে না তাকিয়ে সুধাংশু সটান রাস্তায় নেমে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সে যখন চললো, তখনও শ্যামলীর দীর্ঘ মধুর ক শোনা যাচ্ছে—"জনমে জনমে জীবনে মরণে—"

অত্যন্ত দ্রুত এলোমেলো গাড়িখানা সে চালাতে লাগলো। যত বড় ব্যথার কারণই ঘটে থাক্, আজ তার আনন্দ আর স্বস্তি। সে যেন একটা প্রবল অজ্ঞান থেকে অনেকদিন পরে মুক্তি পেয়ে বাঁচলো। আজ শ্যামলীর মৃত্যু ঘটলো নিঃসংশয়ে। সুধাংশু ঠিক যেন তার দাহকার্য সেরে ফিরে চললো। তার ভবিষ্যৎ জীবনে আর কোনোদিন প্রতিভাশালিনী নৃত্যকলাবতী শ্যামলীর প্রাণস্পন্দন শোনা যাবে না। আজ সুধাংশু সকল অপযশ থেকে মুক্তি পেলো।

ঘুরতে ঘুরতে গাড়িখানাকে সে এনে ফেললো গঙ্গার ধারে। সহসা গঙ্গার উদার বিস্তারের দিকে তাকিয়ে তার মনে হোলো, শ্যামলীর জীবন যত মালিন্যময়ই হোক না কেন, তার সুধাকণ্ঠের শ্যামনামকীর্তন গঙ্গার ওই নির্মল প্রাণদায়িনী ধারার মতই পবিত্র ও আন্তরিক সত্যের প্রভাবে শুচিশুদ্ধ। তার তুলনা নেই। কিন্তু শ্যামলীর মৃত্যুই যদি ঘটেছে, যদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই শেষ হয়েছে, তবে কাজটুকুই বা বাকি থাকে কেন?

সুধাংশু গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো। তারপর সোজা স্নানের ঘাটের দিকে গিয়ে এক বামুনের কাছে বললে, ওহে ঠাকুর, স্নানের ব্যবস্থা করে দাও দেখি?

কোনোমতে ঠাকুরের সাহায্যে স্নান সেরে ভিজা কাপড়-জামা সমেত সে গাড়িতে এসে উঠলো। ঠাকুর তার কপালে চন্দন পরিয়ে দিল।

স্নিগ্ধ ও শান্ত দেহমনে সুধাংশু গাড়িখানা চালিয়ে আবার বাড়ির দিকে চললো। কোনো মনোক্ষোভ, কোনো উত্তেজনা অথবা গ্লানি আর তার নেই। সংযতবুদ্ধি ও প্রসন্নচেতা সুধাংশু শুধু মনে মনে শ্যামলীকে আশীর্বাদ করে বললে, সে যেভাবেই থাকুক, তার যেন কল্যাণ হয়!

···তেরো···

এই ঘটনার সংবাদটা নীনার কানে গিয়েছিল যথাসময়ে। একথা সে জানতো, দীর্ঘকাল ধরে তার দাদা শ্যামলীর জীবনটাকে নিয়ে একটা মস্ত পরীক্ষায় বসেছেন। মনে মনে সেও কামনা করেছিল, তার আদর্শবাদী দাদার এই পরীক্ষা যেন সার্থক হয়। কিন্তু শ্যামলীর এই অধঃপতনের সংবাদ পেয়ে সে মনে মনে বললে, দাদার এত বড় একটা স্বপ্নকে শ্যামলী যে নষ্ট করেছে এ তার পক্ষে স্বাভাবিক। এ পথে যে-মেয়ে একবার পা দিয়েছে তাকে আর কোনো কালেই বিশ্বাস করা চলে না।

কিন্তু এই সঙ্গে নীনা তাকালো তার নিজের দিকে। বাস্তবিক, তারই বা কী পরিচয়! শ্যামলী হলো কাঁচা মাটির ঢেলা, তাই সে বার বার ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু সে নিজে কাঁচা নয় বলেই কি তার গৌরব এত বেশী? সে শিক্ষিত মেয়ে, চতুর বলে তার খ্যাতি, সে অদব-কায়দায় দুরন্ত, নিজেকে বাঁচিয়ে গা ভাসিয়ে দিতে সে জানে—তাই তার এত আদর। কিন্তু এতেই কি শ্যামলীর চেয়ে সে বড় হতে পারলো? সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত বারাঙ্গনাবৃত্তিতে সে অভিজ্ঞ বলেই কি তার গৌরব? শ্যামলীর সংশোধন পরীক্ষায় সুধাংশু বসেছিলেন সর্বত্যাগী হয়ে—কারণ, শ্যামলীর আশা ছিল। কিন্তু কই, তাকে তো কেউ ভালো হতে বললে না? একথা কেউ তো তাকে জানালো না, তার ভিতরে প্রতিভা আছে, শক্তি ও গুণপণা আছে, নোংরামিকে কাটিয়ে উঠে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে দাঁড়াবার মতো সম্ভাবনা তার আছে? দাদা বলে সে যাকে ডেকেছে, ভক্তি করেছে, ভালো

বেসেছে—সেই সুধাংশুও তো একটিবার বললেন না, নীনা তোমার কল্যাণ হোক ?

এইরকম একটা ভাবান্তর নিয়ে নীনা কিছুদিন থেকে একটা অস্বস্তিবোধ করছিল। সহসা একদিন টেলিফোন করে নরেনকে জানালো, তার বন্ধু-বান্ধবকে সম্পূর্ণ গোপন করে তার ফ্ল্যাট্ ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে। তার স্থান পরিবর্তন যেন কেউ কোনোদিন আর জানতে না পায় তার ব্যবস্থা সে করেছে। নরেনকে সে জানালো, অমুক দিন অত সময়ে অমুক রাস্তার মোড়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। আর কেউ যেন নরেনের সঙ্গে না আসে।

নরেন অবিশ্যি ঠিক দিনে ও ঠিক সময়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিল। সেই সূত্রে নীনা নরেনের কাছে এমন কতকগুলি কথা, এবং কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, যেগুলো নরেনের মতো লোকের কাছে অপ্রত্যাশিত। নরেনের মা বাপ নেই। এক ভাই বোম্বাইতে চাকরি করেন, এবং একটি ভগ্নী সপরিবারে দিল্লীতে। নরেন কলকাতায় থাকে একা, উত্তর কলকাতায় একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে। জীবন-সংগ্রাম করে সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই রয় ষ্টিভেন্স-এর ম্যানেজারের গদি সে পাবে। জীবনে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সে অতিক্রম করে গেছে, কিন্তু পিছনের সব অভিজ্ঞতার চিহ্ন সে নিজের হাতে মুছে মুছে চলে এসেছে। কিছু ভাবার, কিছু পর্যবেক্ষণ করবার ধৈর্য তার নেই। বর্তমানে তার জীবন-দর্শন হোলো, দিব্য পান ভোজন করো, এবং আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে ঘুরে বেড়াও। ঘুরে সে বেড়িয়েছে অনেক, কিন্তু সহসা নীনার ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে থমকে দাঁড়ালো। তার এই প্রজাপতি-সুলভ জীবনযাপনের ভিতরে কোথাও গুরুগাম্ভীর্যময় প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, নীনার সঙ্গে আলোচনার আগে একথা তার মনে হয়নি। তার সদাস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের সুড়ঙ্গপথ

ধরে যেন একটা চোরা অস্বস্তি সরীসৃপের মতো তার মনে প্রবেশ করলো।

মাস চারেক এই ভাবে কেটে গেল।

ইতিমধ্যে জগতের আন্তর্জাতিক ঘটনাচক্রে তাদের অপিসে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। ইউরোপে মহাসংগ্রামের সূচনা দেখা দিল, এবং সেই সংবাদে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রয়-ষ্টিভেন্স-এর ছোট অংশীদার মিঃ ষ্টিভেন্স পদত্যাগ করে বিলাত ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সুধাংশু উপযুক্ত টাকা দিয়ে তাঁর শেয়ারগুলি কিনে নিল এবং কিছু টাকা তাঁকে গ্রাচুইটি বাবদ দিল। বৃদ্ধ ষ্টিভেন্স সত্যসত্যই একদা বিমানযোগে বিলাতের দিকে রওনা হলেন। এত বড় প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব সুধাংশু একা গ্রহণ করলো। নরেন এবার রয় এণ্ড ষ্টিভেন্স-এর ম্যানেজারের পদ পেলো।

যেদিন সত্যসত্যই যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো ইউরোপে, সেদিন শাসন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংবাদ এলো, বিলাতগামী জাহাজে মাল পাঠানো, অথবা বিদেশী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আদান-প্রদান করার ব্যাপারে নানাপ্রকার বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এখন থেকে সর্বপ্রকার কাজ-কারবার শাসন কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে করা দরকার। এই সংবাদের ফলে সুধাংশুর অপিসের কাজকর্মেও কিছু অদল বদল করতে হোলো।

সুধাংশুর পারিবারিক জীবনেও কতকটা শান্তি ফিরে এসেছে। ইদানিং সে অনেকটা গৃহগতপ্রাণ। সম্প্রতি শহর থেকে কিছু দূরে সে একটি ফলের বাগান কিনেছে, এবং তারই তদ্বির তদারকে অনেকটা ব্যস্ত। পদ্মাবতী তার স্বামীর এই প্রকার সন্তোষজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করে আর কোনরূপ অপ্রিয় আলোচনা উত্থাপন করেনি। আভাসে ইঙ্গিতে লক্ষ্য করে সে দেখছে, শ্যামলীর সঙ্গে সুধাংশুর যোগাযোগ আর নেই।

নরেন ম্যানেজার হয়ে বসবার পর অপিসে একটা নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হোলো। নরেন যোগ্য লোক, তার সুপরিচালনায় কর্মকেন্দ্রের প্রাণশক্তি নূতন করে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। সুধাংশু ইদানিং অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে।

ইতিমধ্যে সুধাংশুর মা ধরে বসলেন, তিনি তীর্থযাত্রা করবেন। তাঁর তীর্থযাত্রার ইচ্ছাটা সুধাংশু যেন লুফে নিল সানন্দে। সে বললে, তুমি একা যাবে কেন মা, আমরা কি দোষ করলুম?

মা হেসে বললেন, আমি যে বুড়ি হয়েছি, বাবা?

তোমার পুত্রবধূও কম বুড়ো হয়নি। দেখছ না, অজিতের প্রায় গোঁফের রেখা দেখা দিল? চলো আমরা সবাই যাবো স্বর্গে তোমার পা ধরে।

মা হাসতে লাগলেন। সুধাংশু সপরিবারে তীর্থযাত্রার আয়োজনে মেতে উঠলো। পরম্পরায় জানা গেল, আগামী বুধবার তারা সবাই হরিদ্বারের দিকে রওনা হবে।

*　　　*

*

প্রায় তিন মাস পরে তীর্থযাত্রীর দল দেশে ফিরে আসছে, এমন সংবাদ পাওয়া গেল। এই তিন মাস সুধাংশু সপরিবারে ঘুরেছে বহু তীর্থস্থান এবং শহর। কলকাতায় তার আপিসের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য টেলিগ্রাম বাবদ সে অজস্র টাকা ব্যয় করেছে। সর্বপ্রকার সংবাদও শুনেছে, এবং উপদেশও পাঠিয়েছে। মোটামুটি তার অভাবে কলকাতার কাজকর্ম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যখন তারা রাজপুতনার দিকে অগ্রসর হয়েছিল সেই সময় পথে পদ্মাবতী সহসা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুধাংশু সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে তার এক বন্ধুর ওখানে তার পাঠিয়ে সর্বপ্রধান সাহেব ডাক্তারকে রেলপথে নিয়ে আসে। পদ্মাবতী সপ্তাহখানেকের

মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে। এই সূত্রে পদ্মাবতী একটি বিষয় লক্ষ্য করে, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সুধাংশুর সেই আগেকার মতো একাগ্র মনোনিবেশ। তিন দিন অক্লান্ত রাত্রি জাগরণের পরেও সুধাংশু কিছুমাত্র নিরুৎসাহ ও বিরক্তিবোধ করেনি। অনেককাল পরে স্বামীকে সে যেন নূতন পরিবেশের মধ্যে লাভ করেছিল। স্বামীসম্পর্কে তার মনে যে অভিমান এবং অস্বস্তিকর মনোমালিন্য জমে উঠেছিল এই তীর্থযাত্রা সম্পর্কে তার মন থেকে সমস্ত মালিন্য ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তীর্থযাত্রায় এসে এটিই তার পক্ষে সকলের বড় লাভ। আসবার সময়ে পথে-পথে সে প্রাণের আনন্দ ছড়িয়ে এসেছে।

সুধাংশু কলকাতায় ফিরে এলো, এবং তার কাজকর্মের দায়িত্ব তুলে নিল নূতন উৎসাহে। মনের প্রফুল্লতা তার স্বাস্থ্যেও প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথমেই সাক্ষাৎ হোলো নরেনের সঙ্গে। কিন্তু নরেনের চেহারা লক্ষ্য করে তার কৌতুকবোধ জেগে উঠলো।

কি হে, তিন মাসের মধ্যে তোমার চুল পাকলো কেমন করে?

নরেন ম্লান হেসে বললে, বয়স বাড়লে চুল আর পাকবে না?

সুধাংশু হেসে বললে, ম্যানেজারের গদি পেলে তুমি, ভাবলুম এবার হয় তো তোমার নব বসন্ত দেখা দেবে। কিন্তু এ কি? শুকনো মুখ, তোবড়ানো গাল—তোমার সেই বেপরোয়া তারুণ্য গেল কোথা হে?

নরেন হেসেই জবাব দিল। বললে, পাকা বাঁশে ঘুণ ধরেছে!

আচ্ছা, আমি এসেছি! ওসব বদ্‌রোগ তোমার সারিয়ে দেবো। চলো দেখি, একদিন চীনা হোটেলে বেশ করে আহারাদি করা যাক্!

না ভাই, ওসব মাছ মাংস খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

মানে? অমৃতে অরুচি? আজকাল বুঝি বিনা চাটেই মদ্যপান চলছে? বেশ, তাই না হয়—

সুধাংশুর কথায় বাধা দিয়ে নরেন বললে, তুমি বোধ হয় এখনও জানো না, মদ আমি আর ছুঁইনে?

তোমার এই ছদ্মবেশের গভীর তাৎপর্য কী বলো দেখি?

নরেন বললে, না মনিব, ছদ্মবেশ নয়। কিন্তু ওসব আর আমি কোনোদিন ছোঁব না। ওতে কেবল স্বাস্থ্য আর অর্থই নষ্ট হয় না, আরো অনেক কিছু যায়। ওগুলোয় আর আমার একেবারেই রুচি নেই।

সুধাংশু বললে, তুমি কি গয়া-কাশী-বৃন্দাবনের পথে যেতে চাও?

নরেন বললে, না, সে পথে গেলেও ওগুলো জোটে। কিন্তু কোথাও আমি যাবো না মনিব, তোমার কাজ নিয়েই থাকবো।

সুধাংশু একটু ভেবে বললে, নীনা কেমন আছে?

সে নিজেই জানে।

কোথায় সে?

নরেন বললে, অজ্ঞাতবাসের ব্রত নিয়েছে।

মানে?

যেখানে ছিল সেখানে আর এখন নেই।

সুধাংশু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলো, তার চলছে কেমন করে?

নরেন বললে, সে বলে, সব ছাড়লে অতি আনন্দে দিন চলে যায়।

কিন্তু তার উপার্জন?

প্রয়োজন নেই!

তোমার সঙ্গে দেখা হয়?

কচিৎ।

সুধাংশু বললে, এই তিন মাসে তোমরা তো বেশ একটা হেঁয়ালী তৈরী করে রেখেছ?

নরেন বললে, হেঁয়ালী নয়, মনিব। কিন্তু গত কয় মাসে নীনার একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর সেই পরিবর্তনের মূল কারণ হলে তুমি।

আমি!—সুধাংশু চমকে উঠলো। বললে, কি রকম?

নরেন বললে, তোমার শ্যামলীকে তুমি ভেঙে চুরে নূতন করে গড়তে বসেছিলে। কিন্তু শ্যামলীর পক্ষে যা সম্ভব হয় নি, নীনা বোধ হয় সেটাকে সম্ভব করার জন্যে একেবারে নির্জনবাসের ব্রত নিয়েছে। আজ তার ঠিকানাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

দূরের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। একটা বিস্মৃতপ্রায় ক্ষতের উপর আঘাত লেগে সেই স্থানটা যেন ব্যথায় টনটন করে উঠলো। আস্তে আস্তে সসঙ্কোচে প্রশ্ন করলো, শ্যামলীর খবর কিছু জানো নাকি?

অল্প-স্বল্প জানি।

সুধাংশু তার মুখের দিকে তাকালো।

নরেন বললে, মাত্র কয়েকদিন আগে বিনয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। হাতীবাগানের থিয়েটারের সামনে মাতাল অবস্থায় একটা মেয়েকে, নিয়ে নেমেছে। এক মিনিটের জন্যে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম শ্যামলীর খবর। টলতে টলতে সে খবর দিয়ে গেল, হাজরা রোডের কোন্ বস্তিতে আছে শ্যামলী, তার নাকি ভারি অসুখ!

অসুখ!

নরেন সুধাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তোমার মুখে চোখে উদ্বেগ দেখা দিলে আমি দুঃখিত হবো, মনিব। তুমি যেন আর সে নোংরামি ঘাঁটতে যেয়ো না। ছুঁড়িটা ছুটেছে বীভৎস পরিণামের দিকে, তুমি তাকে বাঁচাতে পারবে না—। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কি, বৌঠানকেও তুমি অনেক দুঃখ দিয়েছো।

সুধাংশু তার চাঞ্চল্য দমন করলো। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, তার যে অসুখ বলছো ?

নরেন বললে, কোন্ আঘাটায় কার মড়া মরতে বসেছে, তার জন্যে তোমার মাথ ব্যথার কারণ নেই। তার জন্যে যথেষ্ট অর্থ আর পরিশ্রম খরচ করেছো তুমি, যথেষ্ট অপযশ সহ্য করেছ। কিন্তু আর নয়। তীর্থস্থান থেকে ফিরে এসেছো, আর নোংরায় পা দিয়ো না।

নরেন তার নিজের চেম্বারের দিকে চলে গেল।

বাইরে কিছুক্ষণ থেকে একজন দর্শনার্থী অপেক্ষা করছিলেন। এইবার তিনি ভিতরে এসে ঢুকলেন।

সুধাংশু তার মনোবিকার ভারাক্রান্ত চোখ তুলে দেখলো, একজন আধা বয়সী টাকপড়া দণ্ডিধারী সন্ন্যাসী—পরনে গেরুয়াবাস। তিনি সামনের চেয়ারে বসে প্রসন্ন হেসে বললেন, আমাকে কি মনে আছে আপনার। মাস কয়েক আগে একবার আপনার কাছে এসেছিলুম। আমার নাম আত্মানন্দ।

অন্যমনস্কভাবে সুধাংশু বললে, কি চান বলুন ?

তিনি বললেন, নিজের জন্য তো কিছু চাইনে বাবা, অন্যের সেবার জন্যেই ভিক্ষের ঝুলি এনেছি। আমাদের আশ্রম হোলো ট্যাংরায়। তারই জন্যে চাঁদা।

সুধাংশু বললে, দেখুন, আশ্রমের জন্যে চাঁদা দিয়ে অনেকবার ঠকেছি। আজকাল কত রকমের লোক হয়েছে, জানেন তো ?

আত্মানন্দ সরল হাসি হাসলেন। বললেন, আপনি দানশীল শুনেই এসেছি। যদি কিছু না দেন চলে যাবো। কিন্তু অপাত্রে দান করলেও দাতা যিনি, তিনি তো ঠকেন না। পাত্রাপাত্রের ভেদ বিচার তো দাতার হাতে নেই !

হঠাৎ একটা খোঁচা লাগলো সুধাংশুর মনে। সে প্রশ্ন করলো, আপনাদের আশ্রমে কী কাজ হয়?

অন্ধ আতুর উপবাসীদের সেবা, নিরুপায় মেয়েদের তত্ত্বাবধান, প্রসূতিদের হাসপাতাল—এইসব।

সেই অতি পুরাতন তালিকা—আর কিছু শোনবার উৎসাহ সুধাংশুর নেই। তা ছাড়া এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করার মতো মনের অবস্থাও তার ছিল না। স্বামীজিকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য টেব্‌লের ড্রয়ার টেনে সে নিজের হিসাব থেকে দশটি টাকা আত্মানন্দের হাতে দিয়ে নমস্কার জানালো।

টাকা পেয়ে খুশী মনে স্বামীজি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, যদি কোনোদিন ট্যাংরার দিকে যান একবার আমাদের সেবাশ্রমে দয়া করে যাবেন।

যে আজ্ঞে।

আত্মানন্দ স্বামী বিদায় নিলেন।

* * *

*

একটা দুর্গম ও দুরূহ বস্তির পথ। নালা, জলা, আঁস্তাকুড়, কাদা আর দুর্গন্ধ—তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে অলিগলি পায়ে চলা পথগুলো যেন প্রবৃত্তির অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে চলে গেছে। আশে পাশে কোথাও কলকণ্ঠের কদর্য [illegible], কোথাও বেসুরো ভাঙা হারমোনিয়মের আওয়াজ, কোথাও জুয়ার আড্ডার চাপা হল্লা, কোথাও টিমটিমে আলোজ্বালা মাটির ঘরে প্রতীক্ষমানা নারীমূর্তি, আবার কোথাও বা এক আধজন অস্পষ্ট পুরুষের অর্থপূর্ণ হাতছানি।

এটা সরকারী পথ নয়, তাই সন্ধ্যায় আলো জ্বলেনি। দিনের আলো

থাকতেই সুধাংশু ঘণ্টা দুই আগে আরো গোটা দুই চার বস্তির মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে এসেছে। শেষকালে নিজের অক্ষমতায় সজাগ হয়ে শ্রান্ত দেহে ফিরে এসেছে। অবশেষে একটি লোককে পাঁচ টাকা কবুল করে সাহায্যের জন্য পাওয়া গেল। কিন্তু অবশেষে দুজনের চেষ্টাতেও হায়রানিই সার হোলো।

সুধাংশু প্রশ্ন করলো, তাহলে উপায়?

সাহায্যকারীটি বললে, হতাশ হবেন না, এ অঞ্চলে প্রায় ত্রিশবত্রিশটি বস্তি আছে, আমরা খুঁজেছি প্রায় গোটা কুড়ি।

লোকটির মুখচোখের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু বললে, তুমি এত জানলে কি করে?

আজ্ঞে, আপনাদেরই অনুগ্রহে!

কি রকম?

লোকটি বললে, আপনাদের আশীর্বাদে আমার কাজই হোলো এই—সিনেমা-থিয়েটারের জন্যে মেয়ে যোগাড় করা। ভদ্রলোকের মেয়েছেলেতো আর পাওয়া যায় না—তাই বস্তি থেকে বের করে আনতে হয়। আমি সাতটা কোম্পানী থেকে মাইনে পাই।

চলতে চলতে সুধাংশু অন্যমনস্কভাবে বললে, তাই নাকি?

আজ্ঞে হাঁ। এই দেখুন না, আজকাল মণিমালা দেবীকে নিয়ে সিনেমা মহলে তো খুব হৈচৈ—ছুঁড়িটা হাজার হাজার টাকা পিটছে। কিন্তু—জানেন কি?—বলে লোকটি যেন অত্যন্ত গোপন কথা বলার জন্য সুধাংশুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো। পুনরায় বললে, ছুঁড়িটা ছিল একটা নোংরা বস্তির মেয়ে। ওর মা বসতো লম্প জ্বালিয়ে সন্ধ্যে-বেলা আট আনা পয়সার জন্যে। কিন্তু মশাই, মেয়েটার কী ভাগ্যি—পাঁচজনের সুনজরে পড়ে গিয়ে সিনেমায় ঢুকলো। শুনছি নাকি আজকাল কোথায় মস্ত বাড়ি করে গেরস্থালি ফেঁদে বসেছে।

কপাল মশাই, কপাল! এমন জানলে কি আর এই শম্মা সহজে মণিমালাকে সাপ্লাই করতো? জুয়াটা ভালোই জমাতে পারতুম।—আসুন দেখি একবার ওদিকটায় যাই।

এক বস্তি থেকে আর এক বস্তি—এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে রাত আটটা বেজে গেল। অবশেষে এক বীভৎস পল্লীর ভিতরে এসে উভয়ের মনে কিছু আশার সঞ্চার হোলো। সহসা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে লোকটি তার চোখের জলন্ত উল্লাস চেপে বললে, শ্-শ্-শ্…সাবধান। জানতে পারলে এরা হয়ত বমাল চেপে নাম বদলে দেবে। বেটীরা ভারি শয়তান…আমাকে চেনে। আমি লুকিয়ে থাকবো।

সুধাংশু বললে, কেন?

লোকটি হাসলো। বললে, হারাণ দেকে চেনেনা, বত্রিশটে বস্তিতে এমন মেয়ে পুরুষই নেই। তামাসা করে কেউ বলে, হারাণ চোর, আবার রাগ করে কেউবা বলে, হারানো চোর!—চুপ, আপনি এগিয়ে যান্ তো দেখি—সোজা ঢুকে যান্। কিন্তু একটা কথা—হেঁ হেঁ… যদি খোঁজ পান্, গরীবকে ভুলবেন না যেন।—এই বলে আজানুলম্বিত পাঞ্জাবীপরা দীর্ঘাকার ও রোগা ঊনবিংশ শতাব্দির হারাণ দে নামক দালালটি তার কালো তৈলাক্ত মুখে চাটুকারসুলভ হাসি হাসলো।

উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগেই সুধাংশু তখনই পকেট থেকে পাঁচ টাকা বার করে হারাণ দের হাতে দিল।' বললে, তোমার পরিশ্রমের জন্যে ধন্যবাদ। দিন দুই বাদে আমার এই ঠিকানায় খবর নিয়ো—আজ মেয়েটাকে যদি পাই তবে সেদিন তোমাকে আরো কিছু দেবো।

ঠিক পাবেন, এখানেই সে থাকে।—সোজা ভেতরে চলে যান্। —শ্-শ্—আসুন তো এই জানলায়!

দুজনে একটি ছোট্ট জানলায় নিঃশব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কতক্ষণ কি যেন দেখলো। তারপর হারাণ দে বললে, আমি যাই স্যর, গুডনাইট্‌।—এই বলে সে একটা সরু গলি ধরে কোথায় যেন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চালা ঘরে ঢুকে মিনিট পাঁচেক প্রশ্নোত্তর করে সুধাংশু প্রত্যেক ঘরে পছন্দসই স্ত্রীলোক খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটি অন্ধকার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। জন দুই স্ত্রীলোক ওধার থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ওঘরে নয়, ওঘরে নয়—ও অসুখে ভুগছে। ওঘরে ঢুকলে কানাকড়ি দিয়ে খেলতে হবে। ভারি কাপ্তেন এসেছে!

দেখতে দোষ কি?—বলে সুধাংশু মাথা নীচু করে সেই দুর্গন্ধ মাটির ঘরে ঢুকলো।

ভিতরে একটা ময়লা হারিকেন ল্যাম্প জ্বলছে। গোটা দুই তিন কলাইয়ের বাসন এখানে ওখানে ছড়ানো। মেঝের উপর চাটাইয়ে ময়লা বিছানা পাতা—তার উপর অসাড়ে পড়ে রয়েছে একটি স্ত্রীলোক। রুগ্ন বাতাসে ঘরের ভিতরটা অবরুদ্ধ।

বোধ হয় পায়ের শব্দ হয়ে থাকবে। বিছানা থেকে সেই স্ত্রীলোকটি অনুনাসিক কণ্ঠে বললে, চলে যাও এখান থেকে। দেখছ না মরছি অসুখে? দাঁড়ালে কেন? বেরিয়ে যাও!

সুধাংশু বললে, না। কি অসুখ শুনি?

শোনো কথা! বেশ্যাদের আবার কী অসুখ হয়? এই অসুখেই মরবো গো, মরবো!

সুধাংশু বললে, কিন্তু তুই যে বলেছিলি, প্রতিভার অপমৃত্যু নেই!

অ্যাঁ! কে—কে তুমি? শ্যামলী কষ্টে বিছানায় উঠে বসলো।

ব্যস্ত হোস্‌নে—সুধাংশু বললে, কি অসুখ তোর?

অবরুদ্ধ আবেগে চঞ্চল হয়ে কম্পিত কণ্ঠে শ্যামলী বললে, এখন আর কোনো অসুখ নেই, ঠাকুর।

কিন্তু এই যে বললি—

হাঁপাতে হাঁপাতে শ্যামলী বললে, যাতে কেউ কাছে না আসে তাই বলেছিলুম! কিন্তু তুমি কেন এলে? তোমার আসবার তো কথা নয়!

সুধাংশু বললে, তোকে ভালোবাসি তাই এলুম।

শ্যামলী বললে, ওকথা বোলো না, তোমার পাপ হবে!

তোকে দেখবার পর থেকে পাপ আমার কম হয়নি, কিন্তু তোর এমন চেহারা হোলো কেন রে!

বসন্ত হয়েছিল! এখনও সব গুটি সারেনি, জ্বর রয়েছে।

সুধাংশু বললে, বিনয় কোথায়?

শ্যামলী চুপ করে রইলো। কতক্ষণ পরে বললে, না, লজ্জা করবো না ঠাকুর, তোমার কাছে। বিনয় আর আসেনা! মাসখানেক আগে এসে সে জেনে গিয়েছিল আমি আর বাঁচবো না।

কিন্তু তুই মরলেই আমি খুশী হতুম, শ্যামলী!

রুগ্ন বীভৎস মুখে হেসে শ্যামলী বললে, অত পাপী আমি নই ঠাকুর, যে, মরবার আগে একবার তোমার দেখা পাবোনা। ঠাকুর, একটা চোখ আমার নষ্ট হয়ে গেছে, ওরা তাই আমাকে ঠাট্টা করে বলে, কানাকড়ি—। কিন্তু আমিতো জানি, তোমার দিকে ছাড়া আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, তাই আমি এক চোখো হলুম! এবার যে দয়াময়কে একান্ত করে দেখবো!

সুধাংশু বললে, কিন্তু তোর কি ধারণা, আমি তোকে আবার উদ্ধার করতে এসেছি?

শ্যামলী বললে, না, সে-ভুল আর কোরোনা। কৃমিকীটকে ঠাকুরঘরে

তুলনে সে হাঁপিয়ে ওঠে, তার জায়গাতেই তাকে থাকতে দাও। কেবল একটি প্রার্থনা জানিয়ে যাবো তোমার কাছে। আর কোনোদিন কোনো পতিতাকে তুলে ধরতে যেয়োনা, তাহলে তুমি আবার ব্যথা পাবে! মরবার পরেও তোমার সেই আঘাত আমার সইবেনা।

কিন্তু তুই তো পতিতা নস্!

কে বললে? আমাকে ভুল বুঝিওনা, ঠাকুর। আমি মাটি ফুঁড়ে উঠিনি। আমি সেই যুগযুগান্তরের হাজার হাজার বছরের ধারা বেয়ে এসেছি—নিশ্চয় আমি পতিতা। এই জেনেই তুমি চলে যাও, ঠাকুর। তুমি এখনই যাও।

শ্যামলী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

সুধাংশু বললে, আমাকে যেতে বলছিস কেন?

শ্যামলী বললে, যে অশুচি তাকে আর দয়া করতে এসোনা, আর তাকে বাঁচিয়ে তুলে আরো নীচে নামতে দিয়োনা। তাকে ধ্বংস হতে দাও, তাইতেই তোমার পুণ্য, ঠাকুর।

হাতঘড়িটার উপর ঝুঁকে পড়ে সুধাংশু দেখলো রাত ন'টা। একটু ব্যস্ত হয়ে সে বললে, আমি কি তোর বক্তৃতা শোনার জন্যে সারা বিকেলটা তোকে খুঁজে-খুঁজে বার করলুম? আমি কি জন্যে এসেছি বল্ দেখি?

শ্যামলী বললে, আমাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু আর আমি যাবো না, দয়াময়।

কেন?

বার বার ভুল করেছি, বার বার তোমার ভালোবাসাকে অপমান করেছি। আমার নৌকো ডুববেই, তুমি তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

সুধাংশু বললে, তবে কি এমনি করেই তুই মরবি?

শ্যামলী বললে, এমনি করেই আমরা মরি। এমনি করে মরার

জন্যেই তো একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম ঠাকুর?—চোখের জল মুছে সে পুনরায় বললে, যাবার সময় তুমি একটি উপকার করে যাবে?

কি?

সামনের দেয়ালগুলো লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যাও, বাইরের আলো-হাওয়া আসুক। বাকি কটা দিন আকাশের দিকে যেন আমি চেয়ে থাকতে পারি। মরবার আগে যেন দেখে যেতে পারি তাঁকে, যিনি আমার ইষ্টদেবতা—সমস্ত নোংরামি আর মালিন্যের ভেতরে থেকেও যাঁকে একটি দিনের জন্যেও ভুলিনি।

সুধাংশু উৎসাহিত হয়ে বললে, একথা কি তোর সত্যি?

সুধাংশুর পায়ের উপরে হাত রেখে শ্যামলী বললে, আমার অন্তিম-কালে এই কথাটাই যেন সত্যি হয়, এই আশীর্বাদ করো তুমি।

উঠে দাঁড়িয়ে সুধাংশু বললে, তবে আর দেরি করিসনে, উঠে আয় আমার সঙ্গে। যত দেয়াল তুই তুলেছিস তোর চারদিকে, তুই নিজেই সেগুলো লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে চল্। ওঠ্—

শ্যামলী দুর্বল দেহে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি কি পারবো?

ইষ্টদেব তোর যদি সহায় হয়, নিশ্চয় পারবি। আয়, সব পেছনে ফেলে চলে আয় আমার সঙ্গে।

আলোটা জ্বালা রইলো। ময়লা বিছানা আর কলাইয়ের ঘটিবাটি পড়ে থাকলো—শ্যামলী সুধাংশুর হাতের ওপর ভর দিয়ে সেই বীভৎস বস্তির অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। একথা একবারও জিজ্ঞাসা করলো না, এই রুগ্নদেহ নিয়ে এই রাত্রে কোথায় তাকে যেতে হবে। বরং পরম নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

কিছুদূরে পথের মোড়ে এসে একখানা ট্যাক্‌সি পাওয়া গেল। সুধাংশু

তার হাত ধরে ভিতরে তুলে দিল, তারপর নিজে উঠে পাশে বসলো।

গাড়ি ছুটলো দক্ষিণ-পূব পথে। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্যামলী ডাকলো, ঠাকুর?

সুধাংশু কি যেন ভাবছিল। উত্তর দিল, কেন রে?

তুমি আমার চেহারা আর স্বাস্থ্যের সুখ্যাতি করতে। আদর জানিয়ে বলতে, কেষ্টঠাকুর। কিন্তু আমার সবই গেছে, তার সঙ্গে একটা চোখও নষ্ট হয়েছে। কই, তুমি তো একটুও দুঃখ করলে না?

সুধাংশু উত্তর দিল, তোর যেগুলো গিয়েছে সেগুলোর দিকে তো কোনোদিন আমার দৃষ্টি ছিল না! তুই একেবারে অন্ধ হলেও তো তোকে ফেলতুম না, শ্যামলী!

শ্যামলী স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর বললে, ঠাকুর, তুমি কি সত্যি সত্যিই মানুষ নও!

সুধাংশু চুপ করে রইলো।

ট্যাংরায় এসে সেবাশ্রমের ফটকের মধ্যে যখন গাড়ি ঢুকলো, রাত তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, প্রকাণ্ড বাগান বাড়ি। পাশেই একটি মন্দিরে তখনও ধূপ ধুনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গাড়ি এসে থামতেই দুজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এলো। সুধাংশু গাড়ি থেকে নেমে প্রশ্ন করলো, স্বামী আত্মানন্দ আছেন কি?—ও, এই যে আপনি!

আত্মানন্দ হাসিমুখে বললেন, আসুন, আমাদের সৌভাগ্য।

সুধাংশু বললে, একটি মেয়েকে এনেছি আপনাদের এখানে রাখার জন্যে। মেয়েটি ভারি অসুস্থ। একে আপনারা আশ্রয় দিন, আমি জামিন রইলুম। খরচপত্র সব আমি দেবো।

আত্মানন্দ তখনই ভিতরে খবর পা[illegible]। তারপর এগিয়ে এসে বললেন, এসো মা, এসো। কিন্তু খরচপত্র এখানে কিছুই লাগে না, সুধাংশুবাবু। এটা সেবাশ্রম। সেবাধর্মই এখানে বড়।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা এসে শ্যামলীকে প্রসন্ন মুখে নামিয়ে নিলেন।

আত্মানন্দ বললেন, আপনি মাঝে মাঝে এসে খবর নেবেন তো?

সুধাংশু বললে, আমি আসি বা না আসি, ওর সকল ভার আপনারা নিন্। এর পরে বন্দোবস্ত কি হবে, আমরা আলোচনা করে ঠিক করবো। আচ্ছা, আজ আমি আসি।

শ্যামলীকে সাদরে সবাই ভিতরে নিয়ে গেল দেখে সুধাংশু নিশ্চিন্ত হয়ে সেদিনকার মতো বিদায় নিল।

গাড়ি আবার তাকে নিয়ে রওনা হোলো। কতক্ষণ পরে ভবানীপুরের মোড়ে এসে স্থির করলো, এইখানে গাড়িখানা ছেড়ে দিয়ে বাকি পথটুকু সে রিক্সায় ফিরবে। সে জিজ্ঞাসা করলো, কত হয়েছে তোমার?

দেশলাই জেলে মীটার দেখে ড্রাইভার বললে, পনের টাকা দশ আনা।

আচ্ছা, এই নাও।—বলে সুধাংশু পকেটে হাত দিল। কিন্তু পকেট যে খালি! কোথায় তার মনিব্যাগ? সর্বাঙ্গ খুঁজে সুধাংশু হায়রান হোলো। একসময়ে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, সে আর হারান দে একসঙ্গে ছোট জানলায় উঁকি মেরেছে! তার কানে কেবল দুটো কথাই বাজলো, কেউ আমাকে বলে, হারাণ চোর কেউ বা বলে, হারাণো চোর!

সুধাংশু একটু হেসে পুনরায় গাড়িতে উঠে বললে, চলো—

মনিব্যাগে তার শ'দেড়েক টাকা ছিল বৈ কি।

রাত বারোটার পর সুধাংশু বাড়ি এসে পৌছলো। ইদানীং এত রাত হওয়া তার পক্ষে এই প্রথম। অতিশয় সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত জীবন

যার—তার পক্ষে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া কিছু উদ্বেগজনক বৈ কি। অনেকদিন পরে পদ্মাবতী স্বামীর জন্য জেগে অপেক্ষা করছিল।

ঘরে ঢোকবার আগে সুধাংশু তার জামা কাপড় সমস্ত ছেড়ে সরিয়ে দিল। পদ্মাবতী এসে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললে, কিগো, আবার বুঝি কোনো ফাঁদে পা দিলে?

সুধাংশুও হেসে জবাব দিল, না গো বড়বউ, সেই পুরনো ফাঁদ। দাঁড়াও আগে স্নান করে আসি, ভারি নোংরা ঠেকছে!—এই বলে সে তোয়ালেটা কাঁধে নিয়ে সটান বাথরুমের দিকে চলে গেল।

পদ্মাবতী ঠিক সেইখানে স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, একটু সাড়াশব্দ ছিল না তার। সুধাংশু কখন্ বেরিয়ে এসেছে, কখন্ মাথা আঁচড়ে আহারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তার হুঁস নেই।

শোনো বড়বউ, ভারি মজার কথা। আজ আবার সেই শ্যামলীকে আবিষ্কার করলুম। কী নোংরার মধ্যেই সে ছিল! দিয়ে এলুম সেই ট্যাংরার সেবাশ্রমে, এবার আমার ছুটি।—যাক্, তুমি নিশ্চয়ই না খেয়ে আছো? চলো, দুজনেই খেতে বসিগে।

কঠিন গম্ভীর মুখে পদ্মাবতী বললে, আজ আমার শরীরটা ভালো নেই—খাবো না। চলো, তোমাকে খেতে দিইগে।—

চৌদ্দ···

ইউরোপে যুদ্ধের সংবাদ ভালো নয়। পোল্যাণ্ডের পর একে একে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে—এরা নাৎসী জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোলো। সম্প্রতি ফ্রান্সের উপরে আক্রমণ হয়েছে, ম্যাজিনো লাইন ভেঙেছে—এবং ফ্রান্সের পতন আসন্ন। হিটলারের প্রচণ্ড শক্তি সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করতে উদ্যত। সমুদ্রের তলায় নাৎসী সাবমেরিনের দল মিত্রশক্তির অসংখ্য জাহাজ ডুবিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অবস্থা অতিশয় উদ্বেগজনক।

বাণিজ্য জগতেও এই বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ এসে লেগেছে। যে সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিলাত ও মার্কিন ব্যবসায়ীগণের সহিত চুক্তিবদ্ধ, তাদের পক্ষে মস্ত সমস্যা দাঁড়ালো। সুতরাং মাল আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। প্রাচ্যশক্তি সম্মেলন বসলো। দেশী প্রতিষ্ঠানগুলির পরে মালপত্র সরবরাহ করার অর্ডার এলো। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যারা সাহায্য করতে প্রস্তুত তাদের সুবিধা হোলো। রয় এণ্ড ষ্টিভেন্স-এর পক্ষে অনেক নতুন কাজ জুটে গেল।

কর্মজীবন এমন অভিনব ধরনে আলোড়িত হয়ে উঠলো যে, প্রায় চার মাস সুধাংশু পারিবারিক জীবনের দিকে আর মনোযোগ দিতে পারলো না। ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকে সরকারি অপিস, সেখান থেকে আলিপুর দপ্তর, ওখান থেকে হেষ্টিংস, সেখান থেকে সরকারি স্টোর—এই হোলো তার নিত্য আনাগোনা। বড় বড় সিভিলিয়ন সাহেব, বড় বড় সামরিক কর্মচারী, বড় বড় ইংরেজ ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি—এদের যাতায়াতে তার অপিসটা মুখর হয়ে উঠলো। নরেনের পরিচালনায় গোটা তিনেক

বড় বড় কারখানা ব'সে গেল, কয়েকজন কেমিস্ট নিয়ে একটা ল্যাবরেটরীর প্রতিষ্ঠা হোলো—এ ছাড়া মস্ত একটা গুদাম ভাড়া নেওয়া হোলো স্টেশনারির এজেন্সি নিয়ে।

অপিস আর কারখানা নিয়ে এত কাজ বাড়লো যে, সুধাংশু আরো প্রায় শ' দেড়েক লোককে চাকরি দিয়ে বহাল করলো। এমনি ওলোট পালটের ভিতর দিয়ে কয়েকমাস কেটে গেল।

এই সময়টার মধ্যে তার সমস্ত কল্পনা এবং কর্মোৎসাহ যাকে কেন্দ্র করে ছিল সে শ্যামলী। শ্যামলী আবার নতুন হয়ে উঠছে তার প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শে। ভগ্ন, রুগ্ন, ক্ষয়ক্ষীণ, বিনষ্ট শ্যামলীকে সে আবার নতুন করে সৃষ্টি করেছে তার নিত্যকর্মপ্রেরণার মধ্যে, তার সকল চিন্তা আর অনুপ্রাণনায়, তার আনন্দে, তার ভাবনায়। সকলের চেয়ে বিস্ময়, শ্যামলী আবার উঠেছে দাঁড়িয়ে। পথের ধারের ফুলের চারা বার বার পদদলিত হয়েও যেন আপন প্রাণশক্তিতে কোনোমতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে। অপমৃত্যু তার ঘটেনি। প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটতে পারে না।

স্বামী আত্মানন্দ একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ঘরের মধ্যে নরেনও বসে ছিল। সুধাংশু তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিজের চেম্বারে বসালো।

বৃদ্ধ স্বামীজি হেসে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে এসেছি, রায় মশাই।

হাসিমুখে সুধাংশু বললে, কি নালিশ বলুন?

সেই প্রথম মাসে বার দুই আপনি গিয়েছিলেন আশ্রমে, তারপর আর আপনার চুলের টিকি দেখা যায়নি।

এদিকের কাজ নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত, স্বামীজি।

তা মানলুম। কিন্তু আমার সেই মায়ের দিকটাও একবার দেখতে হবে বৈ কি। আমার অভিমানিনী মা, তিনিও কই একটিবারও আপনার

নাম করেননি! জিজ্ঞেস করেছি অনেকবার। বলেছে, রায় মশাই ব্যস্ত, বিশ্বভুবনের দায়িত্বভার তার কাঁধে—অভাগীর কাছে তাঁর আসার সময় কোথা স্বামীজি?

সুধাংশু ও নরেন হা হা করে হেসে উঠলো। তারপর বললে, আপনার হাতে তাকে সঁপে দিয়েছি। জানি সে আনন্দেই আছে।

আত্মানন্দ সোৎসাহে বললেন, আনন্দে সত্যিই সে আছে। সমস্ত আশ্রম তারই কলকাকলীতে মুখর। মেয়েদের সে বশ করেছে প্রাণের মন্ত্রে। এত হাসির গল্প তার জানা ছিল, আগে কে জানতো! তোত্‌লার গল্প, গাঁজাখোরের কাহিনী, গরুচোরের কথা, লক্ষপতি চাষা, কানা সন্নিসির গল্প—তারপর, আরো যে কত কি—হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

নরেন নতমুখে শুনছিল। সুধাংশু একবার কটাক্ষে তার দিকে তাকালো। তারপর বললে, আজকাল শ্যামলী কি নিয়ে থাকে?

আত্মানন্দ বললেন, শরীর তার সেরে গেছে, এখন আর তাকে পায় কে? লেখাপড়া সে ভালোই জানে—মেয়েদের পড়ায় নিয়মিত। তা ছাড়া চমৎকার সেলাই জানে—সেলাইয়ের সব কাজ সে নিজের হাতে নিয়েছে। গোবিন্দজীউর মন্দিরে সে কাজকর্ম করে। বলে, আমি নৈবেদ্যও সাজাবো না, ফুলের মালাও গাঁথবো না—আমি দাসীর কাজ করবো। সারাদিনটা এই নিয়ে কাটায়। সন্ধ্যেবেলায় তার কেত্তন আরম্ভ হয়। আপনাকে সত্যই বলবো, নাটমন্দিরের সব মেয়ে পুরুষ তার কেত্তন শুনে আর দেবদাসীর নাচ দেখে কাঁদে। আত্মসমর্পণের ভাবটিকে এমন অপরূপ করে সে প্রকাশ করে যে, আমরা সন্ন্যাসীর দল হতাশ হয়ে ভাবি, সারাজীবন আমরা করলুম কি? রায় মশাই, ও মেয়ে যাদু জানে। আপনি কেবল একবারটি তাকে গিয়ে দেখে আসুন।

সুধাংশু প্রশ্ন করলো, শ্যামলীর চোখটা কি ভালো হবে আপনি [ম]নে করেন, স্বামীজি ?

আত্মানন্দ বললেন, ডাক্তারের চিকিৎসা চলছে। তবে মায়ের [ও]সদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলে, তার সব যাক, ঠাকুর যেন তার [স]ব অঙ্গ হানি করেন—কোনো দুঃখ তার নেই। সে বলে, সে স্থবির [হ]য়ে থাক—যার ভার তিনিই নেবেন। এমন ভক্তিমতী মেয়ে আমার [জ]ীবনে আর দেখিনি, রায় মশাই।

সুধাংশু একটু ভেবে বললে, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো, [স্ব]ামীজি। আপনি তো জানেন, মেয়েটিকে আমি কোথা থেকে কি [ভ]াবে তুলে এনেছি ?

হ্যাঁ, জানি বৈ কি ?

আপনার কি সন্দেহ হয়, ওর সেদিকে এখনো কোনো পক্ষপাত [আ]ছে ?

আত্মানন্দ বললেন, আপনার সঙ্গে আলোচনার পর আমি নানাভাবে [ন]ানাছলে শ্যামলীকে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু ওর মনে মনেও কোনো অভিরুচি সেদিকে আছে, এ আমি লক্ষ্য করিনি। আপনার বিষয়ে ওর প্রথমদিকে বরং একটু দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

নরেন এতক্ষণ শুনছিল। এবার মুখ তুলে বললে, এ কি সত্যি বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি বৈ কি। জীবনটা অত্যন্ত রহস্যময়, অতিশয় পরিবর্তনশীল—শ্যামলীকে না দেখলে আমিও বোধ হয় এমন করে একথা বিশ্বাস করতুম না, নরেনবাবু।

সুধাংশু বললে, চিঠিপত্রেও বাইরে কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই ?

স্বামীজি বললেন, কিছুমাত্র না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তার

জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, রায় মশাই, আজ তাকে দেখলে আপনিও আর চিনতে পারবেন না।

সুধাংশু বললে, আপনি আজ এসে যেসব সুসংবাদ দিলেন, এর জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের আশ্রমের যাতে উন্নতি হয় তার জন্যে আমার সাধ্যমতো চেষ্টা রইলো। আজ আমার সামান্য চাঁদা আপনি অনুগ্রহ করে নিয়ে যান, স্বামীজি।

আত্মানন্দ বললেন, দিন, আমাদের ভি[illegible] ঝুলি খোলাই আছে।

সুধাংশু নিজের তহবিল থেকে আড়াইশো [illegible] নিয়ে বৃদ্ধ স্বামীজির হাতে দিল। স্বামীজি বললেন, আপনার কাজের ক্ষতি আর করবো না, আজ আমি উঠি, রায় মশাই।—এই বলে দুই বন্ধুকে আশীর্বাদ করে তিনি সেদিনকার মতো বিদায় নিলেন।

স্বামীজি চলে যাবার পর দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলো। কি যেন একটা মস্ত কাজের কথা ছিল, কিন্তু নরেন যেন অসাড় হয়ে বসে রইলো। এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে সে মুখ তুললো।

সুধাংশু হেসে বললে, দুর্মুখ, আজ কি সংবাদ আছে তোমার বলো?

নরেন হেসে বললে, মুনি বাল্মীকি গোড়ায় ছিল দুষ্ট রত্নাকর, তাই বুড়ো বয়সে তার নীতিজ্ঞান হয়েছিল টনটনে। এক রাবণ ছাড়া পার্থিব আর কোনো পুরুষের চরিত্রে তিনি দুর্নীতি দেখেননি। একালে জন্মালে তিনি দেখতেন, সীতা অপেক্ষা সীতাপতি[illegible] নিয়েই বেশী কলঙ্ক রটে।

সুধাংশুও দস্তুরমতো জবাব দিল, এর কারণ—বাল্মীকি মুনি সর্বংসহা বসুমতীকেই কল্পনা করেছিলেন, একালের সুরবালা দেবীরা তাঁর কল্পনার অগোচরে ছিল।

নরেন বললে, থাক্, কথায় কথায় শাশুড়ীকে আর খোঁটা দিয়ো না!

এদিকে অভিমানিনী সীতাদেবীকে নিয়ে বেচারা লক্ষ্মণ বড়ই বিব্রত, এর প্রতিকার কি বলো দেখি?

সীতাসতী ক্রুদ্ধা, না ঈর্ষাতুরা—কোন্‌টা বলো তো?

নরেন বললে, সে তুমিই জানো ভালো, সুধাংশু! কিন্তু আমি পড়েছি মস্ত বিপদে। তুমি তো জানো যখন তখন বৌদিদির ওখানে আমার ডাক পড়ে—তোমার সম্বন্ধে আলোচনা ওঠে। কিন্তু ইদানীং অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুধাংশুর মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠলো। বললে, তুমি তো জানো, নরেন, স্ত্রীর দিক থেকে আমি অনেকটা ভুল বোঝাবুঝি সহ্য করেছি; আমার প্রতি আমার শাশুড়ীর অবিচার আমার মাথা ছাপিয়ে উঠেছে! কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, পারিবারিক অশান্তির দায়ে পুরুষের একটা বড় আদর্শ মাঠে মারা যাবে?

নরেন বললে, কিন্তু পারিবারিক শান্তিরক্ষার জন্য অনেক সময় অনেক কিছু ছাড়তে হয়, এও তুমি জানো। তোমার স্ত্রী আজকাল অত্যন্ত উত্তেজিত আর অস্থির হয়ে উঠেছেন!

তাঁর কি ধারণা?

এক্ষেত্রে প্রত্যেক স্ত্রীর ধারণা যা হয়ে থাকে। তাঁর বিশ্বাস তিনি অহোরাত্র প্রতারিত হচ্ছেন। তাঁর ধারণা, তাঁর কুড়ি বছরের স্বামী বিশ্বাসের ভিত ভেঙে পড়েছে। স্ত্রী নিয়ে কোনোকালে আমি ঘর করিনি। কিন্তু একথা বুঝতে পারি, স্ত্রীর মনে একবার সন্দেহ ঢুকলে স্বামীর জীবনে আর কোনোদিন শান্তি থাকে না।

সন্দেহ মিথ্যা হলেও?

সন্দেহ সন্দেহই—তার কোনো সত্য মিথ্যা নেই! আজ তুমি যশ আর ঐশ্বর্যের মাথার উপরে উঠেছ, কিন্তু শোবার ঘরের বিছানা যদি কাঁটায় ভরে থাকে, তবে তোমার চেয়ে অসুখী আর কে?

সুধাংশু বললে, তুমি তো দেখছো শ্যামলীর সঙ্গে আজকাল আর আমার কোনো যোগাযোগ নেই!

নরেন বললে, তাতে কিছু এসে যায় না। তোমার মন ভরে আছে সেই মেয়েটা, এটা বৌদিদির চোখ এড়ায় না। স্ত্রীর অধিকার কেবল তো শারীরিক নয়, মানসিক। তোমার মনের অলিগলি তাঁর নখদর্পণে। চোখ দিয়ে স্বামীর মনের দিকে দেখা—এ কেবল মেয়েরাই পারে।

তোমার সঙ্গে বড়বউয়ের আর কি কথা হয়েছে?

সবই তোমাকে বলেছি। কিন্তু তিনি আজকাল অত্যন্ত উত্তেজিত। তাঁর স্বামীর চারদিকে যারা আছে, তাদের কাউকেই তিনি আর বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা, এই যে তুমি যুদ্ধ সরবরাহ নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত আছো, এই যে তোমার কাজ বেড়েছে, আর তুমি বাইরে-বাইরে থাকো—এসবই তোমার ছদ্মবেশ। তাঁর বিশ্বাস, তুমি কিছুতেই ব্যস্ত নও, তোমার ছোটাছুটি আনাগোনা সবই একজনকে নিয়ে—তুমি শ্যামলীর জন্যেই উদ্‌ভ্রান্ত!

সুধাংশু বললে, তুমি এর উত্তরে কি বললে?

নরেন বললে, তাঁর বিশ্বাসকে ভাঙবার সাধ্য আমার নেই, মনিব। বরাবর তাঁকে শান্ত আর নিরীহ বলে জেনে এসেছি। কিন্তু আজকাল তাঁর আত্মদৃঢ়তা লক্ষ্য করে আমি মাথা হেঁট করে থাকি! তিনি বলেন, স্বামীকে মানুষ করেছি, বড় করে তুলেছি। আজ পাকা ফল যারা বেআইনী অধিকারে পাড়তে চায় তাদের আমি উচ্ছেদ করবো। আঁস্তাকুড়ে যে-ফুল পড়েছিল সে-ফুলে যত গন্ধই থাক্, সে অশুচি, পূজোর ঘরে তার ঠাঁই নেই। সিংহের সঙ্গে শৃগালীর বন্ধুত্ব? ভালোবাসা! বারোয়ারিতলার কুকুরের সঙ্গে ভদ্রলোকের কি ভালোবাসার সম্পর্ক? আপনারা কি মনে করেছেন ঠাকুরপো, ধর্মের ঘরে ডাকাতি হলে আমি শুধু ঘরের বউ সেজেই থাকবো? আমার সম্মান, আমার অধিকারে

যদি কেউ হাত বাড়ায়, তবে সেই কীটানুকীটকে আমি পায়ে মাড়িয়েই চলে যাবো!—বুঝলে সুধাংশু, এবারে সেই আদিম নারীই আত্মপ্রকাশ করেছে!

সুধাংশু হাসি মুখে বললে, বড়বউ এত ছেলেমানুষ!

নরেন বললে, ছেলেমানুষ তো নয়, মেয়েমানুষ!

নিজের মনেই সুধাংশু বললে, আজকাল বাড়িতে গিয়ে ঢুকলে মনে হয় বিদেশে এসেছি। কেউ চেনেনা, কারো সঙ্গে আলাপ নেই। যতক্ষণ থাকি বড়বউর সঙ্গে বাক্যালাপ হয় কিনা সন্দেহ!

নরেন বললে, ঠিক জানিনে, তোমাদের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!

এমন সময় টেব্‌লের উপর ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠলো।

* *

*

কিছুদিন পরে সুধাংশু সেবাশ্রমের ফটকের ভিতরে এসে ঢুকলো। সেদিন রবিবার ছিল, কিন্তু বাড়িতে মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রাম তার ভালো লাগেনি। নিজের মনেই সোজা চলে এসেছে এখানে।

আত্মানন্দ স্বামী আশ্রমে ছিলেন না, তাঁর সহকর্মীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সুধাংশুকে দেখে তাঁরা অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন, বসবার আসন দিলেন। আজ রবিবার বলে মেয়েদের সঙ্গে দেখা শোনার তারিখ ছিল, সেজন্য বাইরের দুটো ঘরে কোনো কোনো মেয়ের আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা করছিলেন।

সামনের উঠোন পেরিয়ে বাগানে জনৈক আশ্রমিক ফুল-গাছগুলির দেখাশোনা করছিল। কোনো চারায় গোলাপ, কোথাও চাঁপা, কোথাও বা মস্ত বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা ফুটে রয়েছে। বাগানের একান্তে গোবিন্দ-

জীউর মন্দিরের দরজাটি খোলা—তারই চত্বরে জনতিনেক আশ্রমিক গল্পগুজব করছেন। শহর থেকে সামান্য দূ[illegible]ঞ্চলে আশ্রমটি থাকার জন্য লোককোলাহল এতদূর অবধি এসে তেমন পৌঁছয় না—সেকারণে আশ্রমটি অনেকটা তপোবনসুলভ শান্ত ও প্রসন্ন। পূর্বসীমানায় একটি মস্ত দীঘি, তার মাঝখানে বাঁধানো ঘাট,—এবং দীঘির স্বচ্ছ কালো জলে শালুকের ফুলগুলি ফুটে রয়েছে। কে [illegible] কোথায় বসে চাপা কণ্ঠে একটি অধ্যাত্ম সঙ্গীত গাইছে। মৃদুমন্দ বাতাসে [illegible] সুধাংশুর বড় ভালো লাগলো। তার নিজের বাড়িটাও মস্ত বড়, সেখানকার বাগানে ফুলের মেলা হয় তো এর চেয়েও বিস্তৃত, কিন্তু সেখানকার অবরুদ্ধ মানস-মালিন্যময় আবহাওয়ায় তার প্রাণ যেন ইদানীং হাঁপিয়ে উঠেছে।

মেয়েমহলে তার আবির্ভাবের সংবাদটা যথা সময়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মিনিট কয়েক পরে কয়েকটি মেয়ের কলকণ্ঠ যেন এইদিকে এগিয়ে আসছে মনে হোলো। সুধাংশু সজাগ হয়ে বসলো, এবং তার পরেই কলভাষিণী শ্যামলী দূর থেকে ছুটতে ছুটতে এলো। এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে সকলের সামনে সুধাংশুর পাশে বসে গেল।

এমন আনন্দময়ীকে সুধাংশু এর আগে দেখেনি। সে যেন একটু আড়ষ্ট বোধ করলো। হাসিমুখে বললে, এখানে বুঝি সারাদিন হুড়োহুড়ি হয়?

ওমা, হবে না? এ যে আমাদেরই রাজ্য! স[illegible]লে দশটার মধ্যে পড়াশুনা খাওয়া-দাওয়া শেষ! তারপর বাগান আর মন্দির, এঘর ওঘর, এ-মহল আর ও-মহল। মেয়েরা এখানে এমন চমৎকার কী বলব! ওই যে, ওর নাম শবাসনা, ওর নাম শৈল, ওই যে মুখ লুকোচ্ছে—ওর নাম সুনয়না। আর একজন লজ্জায় সামনে আসছে না—সে আজ পাজামা পরে সাহেব সেজেছে কিনা,—তার নাম ইন্দুমালা!

সুধাংশু হেসে বললে, ইন্দুবালা নয় তবে,—ইন্দুমালা?

হ্যাঁ গো।

সব মেয়েরা হেসে উঠলো। তারপর একে একে সবাই এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলো সুধাংশুর পায়ের কাছে।

শ্যামলী হেসে বললে, এবার হোলো তো?

একটি মেয়ে বললে, হ্যাঁ, সার্থক হোলো!

একজনের পিছনে পিছনে সবাই একে একে সেখান থেকে চলে গেল। সুধাংশু তখন প্রশ্ন করলো, কি সার্থক হোলো শুনি?

ওদের জীবন!

কি রকম?

শ্যামলী বললে, শুনলে তোমার অহঙ্কার হবে যে?—ওদের বলে রেখেছিলুম, তুমি যেদিন আসবে সেদিন ওদের সবাইকে দেখাবো।—চলো, ওঠো, ওঘরে যাই!

সুধাংশুকে সে নিয়ে গেল ওদিকের বারান্দার একটি নিরিবিলি ঘরে। সেখানে গিয়ে হাসিমুখে শ্যামলী বললে, ছ'মাসে এখানে মস্ত ঘরকন্না ফেঁদেছি! একটা পোষা হরিণ আছে এখানে, তোমাকে দেখাতে পারবো। দুটো লালমোহন, কী সুন্দর যে গান গায় তারা কী বলবো! এ অঞ্চলে দোয়েল, শ্যামা—সব পাখি আসে!

সুধাংশু বললে, তা হলে এখানে খুব ভালো লাগছে, বল্?

খু—ব, খুব ভালো লাগছে। নাটমন্দিরে গান হয় সন্ধ্যেবেলা। আমার মাথায় ওরা মোহনচূড়া পরিয়ে দেয়, আর হাতে দেয় বাঁশী। আর—আমি কেত্তন গাই!—এই বলে শ্যামলী নিজের আনন্দে হাসতে লাগলো।

সুধাংশু হাসিমুখে বললে, আর কিছু না, কিন্তু ভারি চঞ্চল হয়েছিস দেখছি। একেবারে প্রাণের বান ছুটিয়েছিস। তোর শরীর সেরেছে

দেখে খুব আনন্দ পেলাম, শ্যামলী। মাথার চুল ছোট করে কাটলি কেন রে?

শ্যামলী বললে, বাঃ চূড়া পরি যে! বাসন্তী রংয়ের বৃন্দাবনী ধুতি আছে আমার, গলায় পরি কদমের মালা। তোমাকে এসব বলছি কেন জানো? সন্ধ্যেবেলা এলে আমাকে তুমি কিছুতেই চিনতে পারবে না!

এখান থেকে কোথাও পালাতে ইচ্ছে করে না?

পালাবো কোথায়?—শ্যামলী হেসে বললে, এই স্বর্গ ছেড়ে আর কোথাও যাবো না। এই আমি চেয়েছিলুম।

সুধাংশু বললে, বিনয়কে মনে পড়ে?

কে? ও—হ্যাঁ। হ্যাঁ, পড়ে বৈকি মাঝে মাঝে। বেচারা! তার ওপর আর আমার কোনো রাগ নেই। অজ্ঞানের ওপর রাগ আর করবো না।

সত্যের স্পর্শ তার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে যেন আজ দূরের মানুষ; আগেকার শ্যামলী কোথায় যেন হারিয়ে গেছে! কিন্তু তখনই বাতাসটাকে হাল্‌কা করার জন্যে সুধাংশু একটু তামাসা করে বসলো। বললে, আমাকে কি আগেকার মতন তুই ভালোবাসিস, শ্যামলী?

শ্যামলী হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ, তোমাকে, একে, তাকে, ওকে—সবাইকেই ভালোবাসি। আমাদের পাখী, হরিণ, ওই গোলাপ, ওই মন্দিরের গোবিন্দজীউ—সবাইকে নিয়েই তো আমি। সব আমার ভালোবাসার ধন—যেদিন সকলের কাছে ছুটি নেবো, সেদিন সকলকেই প্রণাম করে যাবো!

সুধাংশুর মনে হোলো, শ্যামলীর কণ্ঠে এই পরমাশ্চর্য বাণীর বন্যা কোথা থেকে এলো? এত মধু কোথায় সে সঞ্চয় করে রেখেছিল? এমন আনন্দের উৎস তার কোথায় ছিল?

ঘরের বাতাস আর সুধাংশুর মুগ্ধ ও অভিভূত প্রাণ যেন একই সঙ্গে

থরথরিয়ে উঠলো। একপ্রকার বিপুল অপরিতৃপ্তির বেদনায় তার চোখ দুটো যেন সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

আনন্দবিভোর নির্লিপ্ত কণ্ঠে শ্যামলী বললে, সোনার দাম আছে জানতুম, কিন্তু সোনার খনির সন্ধান তুমিই আমাকে দিলে। আমি যে এত চাই, এমন একান্ত করে এসব চাই, আগে কি জানতুম? একবার যখন পেয়েছি, তখন আরো অনেক পেতে চাই। প্রাণভরা অতৃপ্তি জমা হয়ে আছে, পাতিকীর তেষ্টা মিটতে এখনো অনেক দেরি।

সুধাংশু কতক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, আচ্ছা শ্যামলী, আগে তুই আমার কুশল জিজ্ঞেস করতিস। কই, আজ তুই কোনো কথা বললিনে?

শ্যামলী বললে, তুমি আনন্দে আছ এই কেবল জানবো। তোমার পায়ে কাঁটা না ফোটে এই কেবল ঠাকুরের কাছে আমার প্রার্থনা। তুমি ভালো থাকো, তোমার হাতে যেন সকলের কল্যাণ হয়, তোমার হাত দিয়ে ঠাকুর যেন চিরদিন অনাথা অভাগাদের জন্য সেবাধর্মের পথ দেখান—এই শুধু চাই?

তোর কি আর কোনো বাসনা নেই?

না। যেদিন ভালো করে জানতে পারলুম—শ্যামলীর চোখ দুটি যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো—সব ছেড়ে দিয়ে যদি সর্বস্বান্ত হতে পারি, তবেই তাঁকে পাওয়া যায়, সবাই কাছে আছে, সব কিছু পাই,—সেদিন থেকে আমার সব বাসনার দাগ মুছে গেছে। আমার সব চাওয়া আর পাওয়া তাঁরই চরণে সঁপে দিয়েছি।

সুধাংশু বললে, কিন্তু তোর বাকী সমস্ত জীবনটাই এখনো সামনে পড়ে রয়েছে, তা জানিস তো?

জানি গো।—শ্যামলী বললে, জীবনের মানে খুঁজে পাবো, যেদিন জানবো পরের মঙ্গলের জন্যই আমার সৃষ্টি। এখনো আমার স্বভাবের

ভিত নতুন করে গাঁথা চলছে। ঠাকুরের দৃষ্টি আগে আমার ওপর পড়ুক, আমি আগে শক্তিলাভ করি।

তারপর ?

শ্যামলী হাসলো। বললে, তুমি আমার গুরু, তোমার কাছে যেন মিথ্যে না বলি, যেন হৃদয়াবেগের অত্যুক্তি তোমার কাছে না ঘটে। তুমি এই আশীর্বাদ করো, আমি যেন সেবাশ্রমের কাজকে বড় করে তুলতে পারি। এই কাঙালের দেশে যারা অন্নহীন, যাদের আশ্রয় নেই, যারা সর্বহারা—পাপী তাপী দরিদ্র অভাগা আতুর—আমি যেন তাদের পায়ের কাছে বসে সেবা করতে পারি। ঘরে ঘরে নিরন্ন ভগবানের মুখে অন্ন জোগানই যেন আমার ধর্ম হয়। তুমি আশীর্বাদ করো, যেখানে মনুষ্যত্বের অপমান দেখবো, যেখানে দেখবো ভালোবাসা পদদলিত, যেখানে নির্দয় হিংসা আর অন্ধ অনাচার মানুষের সব কিছু কল্যাণকে হরণ করছে দেখতে পাবো—আমি যেন সেখানেও আমার ভালোবাসা দিয়ে তাদের পবিত্র করে তুলতে পারি। তাদের সকলের পায়ের ধূলোয় ধূসর হয়ে যেন গৌরব করতে পারি,—তোমার কাছে এই আশীর্বাদ আজ চেয়ে নেবো।

সুধাংশুর কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধাসিক্ত হয়ে উঠলো। সে বললে, শ্যামলী, তোকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা আজ আমার আছে কিনা জানিনে। কিন্তু তুই যেখানে উঠে দাঁড়িয়েছিস সেখানে আমার আশীর্বাদ পৌঁছবেনা। তোকে নোংরা থেকে তুলবো, অপমান থেকে তোর প্রতিভাকে মুক্ত করবো—এই ছিল আমার সাধনা। স্বামীজি আমাকে বলে এসেছিলেন তুই একেবারে বদলে গেছিস। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোর একটুও বদল হয়নি—বরং তোর আসল চেহারাটা খুঁজে পেয়েছিস; তোর জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যকে ফিরে পেয়েছিস। আমার কাজ এবার ফুরিয়েছে, আমি চললুম—আর হয়ত অনেকদিন আসবো না। কিন্তু

যাবার আগে তোকে জানিয়ে যাই, তোর স্বপ্ন যেদিন সত্য হয়ে উঠবে, যেদিন তুই দিব্যশক্তি লাভ করে বাইরে এসে দাঁড়াবি, যেদিন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তুই দীনদরিদ্র দেশের অজ্ঞান জড়ত্বের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়াবি—সেদিন আমিও আমার সব ভাইবোনদের নিয়ে তোর সঙ্গে এসে মিলবো।

আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে শ্যামলী সুধাংশুর দিকে তাকালো। একটি চক্ষু তার নষ্ট হয়ে গেছে, সেটি হয়তো আর কোনোদিন ভালো হবে না। কিন্তু সেই একটি মাত্র চোখেই শ্যামলীর গীতময় চঞ্চল প্রাণ যেন সুধাংশুর বাণীর অনুপ্রাণনায় সঙ্গীত ঝঙ্কারে নেচে উঠলো। কণ্ঠমূল থেকে অমৃতের ধারা যেন রসস্রোতে প্রবাহিত হয়ে এলো! শ্যামলী গাইলো—

"যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে
আমায় ডাকলে কেন এমন করে॥
যেতে হবে যেপথ বেয়ে
শুকনো পাতা ভাছে ছেয়ে,
হাতে আমার শূন্য ডালা কি ফুল দিয়ে দেবো ভরে॥
গানহারা মোর হৃদয়তলে
তোমার ব্যাকুল বাঁশী কী-যে বলে॥
নেই আয়োজন, নেই মম ধন,
নেই আভরণ, নেই আবরণ,
রিক্ত বাহু এইত আমার বাঁধবে তোমায় বাহুডোরে॥"

গান যখন থামলো, অপরাহ্ণের আকাশ যেন চিরবিরহিনীর বুকের রক্তকমলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সুধাংশুর চোখ পড়লো দরজার দিকে। অন্দরমহলের মেয়েরা, আশ্রমিকের দল, বাইরের অভ্যাগত নরনারী সকলে এতক্ষণ অখণ্ড স্তব্ধতায় এই মায়াযাদুকরীর গান একাগ্র মন দিয়ে শুনছিলেন।

সুধাকণ্ঠী শ্যামলীর বুকের এই কান্না যেন সবাইকে এড়িয়ে ওই গোবিন্দ-জীউর মন্দিরে গিয়েও এতক্ষণ ধরে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

সুধাংশু উঠে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বাষ্পাকুল চক্ষে বেরিয়ে গেল।

...পনেরো...

শ্যামলীর মনে বড় সাধ ছিল, আশ্রমে অষ্টপ্রহরব্যাপী একটি উৎসব হয়। এই উৎসবে যারা যোগদান করবে, যারা অভ্যাগত অতিথি, যারা রবাহূত আর অনাহূত—তারা সবাই ভগবান গোবিন্দজীউর প্রসাদ গ্রহণ করবে। এ ছাড়া ইতর ভদ্র, দরিদ্র দুঃস্থ, কাঙ্গাল অন্নহীন—তাদের জন্যও সারাদিনরাত্রিব্যাপী অন্নসত্র খোলা থাকবে। আর শ্যামলী নিজে উপবাসী থেকে অষ্টপ্রহর ধরে সেই বিরাট জনসাধারণকে নামকীর্তন করে শোনাবে। তার এই একান্ত সাধ পূর্ণ হতে পারে সুধাংশুর সাহায্যে। শ্যামলী আত্মানন্দজিকে পাঠালো সুধাংশুর অপিসে।

সুধাংশু সমস্ত বিবরণ শুনে তৎক্ষণাৎ সানন্দে চেক ভাঙিয়ে টাকা আনিয়ে দিল। স্বামী আত্মানন্দ প্রত্যাশার অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। আগামী বৃহস্পতিবার পূর্ণিমায় উৎসব।

কিন্তু স্বামীজি একটু চিন্তিত হলেন। শ্যামলীর কৃচ্ছ্র সাধনের চেহারাটা কিছুকাল ধরে যেন বেড়েই চলেছে। অন্ন আহার বহুদিন থেকে সে ছেড়েছে, ইদানীং একবেলা সে উপবাসী থাকে। কোনোদিন সামান্য ফলমূল ও মিষ্টান্নেই তার দিন চলে যায়। চেহারায় রুগ্নতা গিয়ে এখন শীর্ণতা এসেছে। সেই শীর্ণতার উপরে ভিতরকার জ্যোতির্ময়তার একটি আভা দেখা যায়। সে যাই হোক, এর ওপর একটি সম্পূর্ণ দিন

নিরম্বু উপবাস করে সে যদি অশ্রান্ত নৃত্য-সঙ্গীতে মেতে ওঠে, তবে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে বৈ কি। তিনি শ্যামলীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন।

শ্যামলী বললে, এ দেহ কার, স্বামীজি?

স্বামীজি বললেন, তা তো জানি, মা।

যদি অহংকার থাকে মনে, সে-অহংকার কি তাঁরই দেওয়া নয়? আমার জীবনে তাঁর সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, স্বামীজি!

কিন্তু মা—

হাসিমুখে শ্যামলী বললে, এর মধ্যে কিন্তু নেই। তাঁর এত দয়া কি আমার পাবার সময় হয়েছে যে, একটি দিন উপবাস করিয়েই তিনি তাঁর পায়ে ঠাঁই দেবেন? যদি কিছু খেতে ইচ্ছে করে খাবো বৈ কি—সে-ইচ্ছে তিনিই দেবেন, স্বামীজি।

স্বামীজি বললেন, তুমি এ আশ্রমের নন্দিনী, আনন্দের প্রতিমা—তোমার প্রাণবন্যায় আমরা সবাই নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি, মা। মেয়েরা সবাই পেলো নতুন চেতনা; তোমার মনস্কামনা নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। কিন্তু মা—

শ্যামলী তাঁর দিকে তাকালো।

স্বামীজি বললেন, তুমি তো জানো, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে আগামী সপ্তাহে বিদেশে বেরিয়ে পড়বো—তোমার হাতে এই আশ্রমের সুখ দুঃখের সকল ভার দিয়ে যাবো, মা।

শ্যামলী হেঁট হয়ে আত্মানন্দজীর পায়ের ধূলো নিল। বললে, যাঁর ভার তিনিই নেবেন, স্বামীজি!

কিন্তু মা, তোমার শরীর অসুস্থ হলে আমি তো তোমাকে ফেলে কোথাও যেতে পারবো না।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার ঠাকুরের এমন ইচ্ছা কিছুতেই

হবেনা, স্বামীজি।—বলে সগৌরবে স্মিতমুখে শ্যামলী সেখান থেকে চলে গেল।

পূর্ণিমার উৎসব অতি পরিচ্ছন্নভাবে শেষ হয়ে গেল। প্রায় দুহাজার লোক গোবিন্দজীউর প্রসাদ পেয়েছে। অনেকেই উৎসবে যোগদান করেছিল। কিন্তু সুধাংশু আসেনি। কেবল অপিসের একটি লোক মারফৎ [illegible] কাছে একখানা চিঠি সে পাঠিয়েছিল—"প্রিয় স্বামীজি, আপনাদের উৎসব সার্থক হোক। শ্যামলীর বর্তমান ভবিষ্যতের সকল ভার আপনাদের হাতে নিয়েছেন—এই আমার সকলের বড় আনন্দ। তার জীবনের সকল কাহিনী আপনি অবগত আছেন। তার জীবন মধুময় হোক, কমলদলের মতো সে যেন গোবিন্দজীউর চরণের কাছে বিকশিত হয়ে থাকে। ইতি। অনুগত সুধাংশু।"

সমস্ত দিবারাত্র অক্লান্ত নৃত্য-গীত করেও শ্যামলীর শরীর সুস্থ ছিল। একটি দিনের মধ্যেই তার নৃত্যকলার খ্যাতি ও সঙ্গীতের যশ নগরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। পরের দিন সকালের সংবাদপত্রেও এই সংবাদটি ছাপা হোলো। কৌতূহলী জনসাধারণের কোনো কোনো প্রতিনিধি এরই মধ্যে তার সম্বন্ধে নানা খোঁজখবর নিয়ে গেছে।

শ্যামলীর কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিলনা—থাকবার কথাও নয়। জাগরণক্লান্ত চোখে নিদ্রার কিছু আবেশ ছিল, কিন্তু আলস্য পরিহার করে সে গেল নিত্য নৈমিত্তিক প্রভাতস্নানে। এর পরে তার জপ, কণ্ঠীপূজা, তিলক সেবা—সবই বাকি। তারপর মেয়েদের সাধন সঙ্গীত শেখানো, পড়াশুনার আয়োজন—এবং আরও কত কি। সময় তার একটুও হাতে নেই। স্নান সেরে সে যাবে মন্দিরে।

বেলা নটা নাগাৎ মন্দিরে গিয়ে ঢোকবার আগে একটি মেয়ে এসে জানালো, একজন মহিলা এসেছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করতে। শ্যামলী ফিরে এসে বাইরের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালো। একজন অতি সুশ্রী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা এসে বসেছিলেন একখানা চেয়ারে। তাকে দেখে বললেন, স্বামী আত্মানন্দর সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি। তিনি কোথায়?

শ্যামলী স্মিতমুখে বললে, তিনি মন্দিরে আছেন, আমি ডেকে দিই।

শ্যামলী চলে যাচ্ছিল, ভদ্রমহিলা ডাকলেন—তুমি কে, ভাই?

আমি? আমি এই আশ্রমের দাসী।

এখানে কি মেয়েরাও থাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাদের আলাদা মহল আছে ওদিকে। আপনি বসুন, আমি ডেকে দিই।—শ্যামলী চলে গেল।

আত্মানন্দজী মন্দিরে বসে ফুলের ডালা সাজাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রমহিলা নতনমস্কার করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

কে মা তুমি?

আমার পরিচয় বোধ হয় আপনার অজানা নয়—এই বলে মহিলাটি একটি কাগজের টুক্‌রো স্বামীজির হাতে দিলেন।

আত্মানন্দজীর মুখের চেহারা ক্ষণকালের মধ্যেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, সুধাংশুবাবুর স্ত্রী তুমি, মা? এ যে সাক্ষাৎ ভগবতী! আমরা সন্নিসি ফকির মানুষ, তোমাকে কেমন করে অভ্যর্থনা জানাবো, মা? তুমি যে রাজমহিষী! কই, পার্বতীর পাশে ভোলানাথকে তো দেখছিনে?

পদ্মাবতী বললে, তিনি আজ ভোরের গাড়িতে আসানসোল গেছেন, কাল আসবেন। আমি আপনার এখানে এসেছি আমার চাকর আর ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু আমি এসেছি প্রাণের দায়ে, অনেক দুঃখে।

সে কি মা? যে-মহাপ্রাণ ব্যক্তির স্ত্রী তুমি, তোমার তো কোনো দুঃখ থাকার কথা নয়!

এমন সময় শ্যামলী পুনরায় এসে দরজ... ...মনে দাঁড়ালো।

পদ্মাবতী তাকে দেখে ঈষৎ সঙ্কুচিত হতেই স্বামীজি ফিরে তাকিয়ে বললেন, ও-মেয়েটি এখানকার আ...সিনী। তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার বক্তব্য বলো মা?

পদ্মাবতী প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। বললে, দেখুন, আজ কুড়ি বছর পরে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বিরোধ বেধে উঠেছে, তার প্রতিকারের আর কোনো উপায় পাইনি বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

আমি অতি নগণ্য, তোমার কী উপকারে লাগতে পারি, বলো মা?

আত্মদৃঢ়তা সহকারে পদ্মাবতী বললে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে আপনার এখানে এসেছি তাঁকে না জানিয়ে। পুণ্যের ঘরে পাপের বাসা হবে, সেই ভয়ানক বিপদ থেকে কেমন করে স্বামীকে আমি রক্ষা করবো, আমাকে বলে দিন্।

আত্মানন্দজী তার মুখের দিকে তাকালেন।

পদ্মাবতী বললে, আপনার সামনে এসে নিজের মুখে অযথা স্বামীর নিন্দে করে যাবো, এতবড় অধর্ম আমি করবো না। তিনি ছোট হবেন, তাঁর মান খোয়া যাবে—তার আগে আমি নিজের মৃত্যুকামনা করবো। কিন্তু যা নোংরা আর পাপ, যা অধর্ম আর ঘৃণ্য, তা যদি আমার সোনার সংসারে সিঁধ দিয়ে ঢুকে সর্বনাশ করতে চায় তাকে আপনারা কী চোখে দেখবেন?

তাকে আমরা নিন্দেই করবো, মা।

আমার স্বামীকে আমার নিজের হাতে গড়েছি, দাঁড় করিয়েছি, কাজে নামিয়েছি।—পদ্মাবতীর চোখ দুটি যেন জ্বলছিল—তাঁর সকল উন্নতির মূলে আমি, তাঁর দুঃখে বিপদে দুর্যোগে ব্যথায় আমি সমানে

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে অংশ গ্রহণ করেছি; তাঁর সেবা করেছি, অন্নজল জুগিয়েছি, সাহস দিয়েছি, পরামর্শ দিয়েছি। আজ অবধি স্ত্রীর কর্তব্যে কোথাও আমার ত্রুটি ঘটেনি। সেই অধিকার নিয়ে আমি এসেছি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মনের বাঁধন তাঁর আর যদি কোথাও থাকে, সে-বাঁধন আমি কেটে দিয়ে যাবো। যেখানে দুর্নীতি, অশুচি, যেখানে কলঙ্ক, সামাজিক লজ্জা, যেখানে কেবল অসৎ প্রবৃত্তি আর দুশ্চরিত্রের মাতামাতি—সেই ভয়ানক সর্বনাশ থেকে স্বামীকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে যাবো। আমাকে আপনি সাহায্য করুন, স্বামীজি।

উত্তেজনায় পদ্মাবতীর দুই চক্ষু আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল।

বৃদ্ধ স্বামীজি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, তোমার দাবি আর যুক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত, মা। যোগ্য স্বামীর তুমি যোগ্য স্ত্রী। সুধাংশুবাবুর পরিচয় আমাদের কাছে গৌরবের, আনন্দের। তোমার সকল কথার পরেও এই বিশ্বাস আমাদের ঘুচবে না, তিনি মহৎ উদারপ্রাণ। কিন্তু মা, মানুষের মনের রহস্য আর জটিলতার কি শেষ আছে? যদি তাঁর আচরণে কোথাও ত্রুটি ঘটে থাকে, তাঁর আত্মবিচারবুদ্ধির ওপর কি আমরা নির্ভর করতে পারবো না? যদি বিশ্বাস করি তিনি বড়, তিনি মহৎ, তবে তো ছোট কাজ তিনি কিছুতেই করবেন না? তুমি আদর্শ স্ত্রী, তাই তোমাকে শান্ত হতে বলি, মা। তোমার আত্মশক্তিতে যদি তোমার একান্ত বিশ্বাস থাকে, তোমার সকল বিপদ কেটে যাবে, মা।

পদ্মাবতী বললে, স্বামীজি, আপনার সান্ত্বনা আমি মাথা পেতে নিলুম। তবু একটা কথা এখান থেকে আমি স্পষ্ট জেনে যেতে চাই। আপনার এই সেবাশ্রমের গোড়াকার আদর্শই হোলো, ধর্ম। কিন্তু এই ধর্মমন্দির থেকে কোন পাপের চক্রান্ত যদি প্রবল হয়ে ওঠে, যদি সেই পাপ কোনো নিরপরাধ মেয়ের ঘরকন্নাকে বিষময় করে তোলে—আপনারা কি তার প্রতিকার করবেন না? একটি পতিতা মেয়ে

যদি আপনাদের এখানে ধর্মের মুখোস পরে বসে আমার স্বামীর শান্ত সংযত জীবনকে বীভৎস নোংরামিতে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলতে থাকে, আপনারা ধর্মের নামে কি তাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলবেন? সেই দুষ্টশক্তির প্রভাব থেকে আমি যদি আমার স্বামীকে মুক্ত করতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হই, আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন না?

আত্মানন্দজী প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। এইবার শ্যামলী বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো। মধুরকণ্ঠে বললে, স্বামীজি, আপনার পূজার সময় চলে যাচ্ছে, আপনি মন্দিরে যান্।

এই যে মা যাই—বেলা হয়েছে বটে—বলে ইঙ্গিতমাত্রই স্বামীজি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

শ্যামলী এগিয়ে এলো, তারপর স্নিগ্ধ হাসিমুখে সাষ্টাঙ্গে পদ্মাবতীর পায়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। বললে, দিদি—?

পদ্মাবতী এতক্ষণে স্পষ্টভাবে শ্যামলীর দিকে মুখ তুলে তাকালো। সদ্যমুণ্ডিত মস্তক, কৃষ্ণবর্ণ, একচক্ষুহীন। মেয়েটির পরনে ফিকা গেরুয়া, বিধবার বেশ, সর্বাঙ্গ নিরাভরণ, গলায় কণ্ঠী, নাকে, কপালে ও চিবুকে মৃত্তিকা তিলক। স্বাস্থ্য কিছু ভালো হলেও মেয়েটিকে কোনোপ্রকারেই সুশ্রী বলা যায় না। মুণ্ডিত মস্তকের দিকে একবার তাকিয়ে পদ্মাবতী প্রশ্ন করলো, তোমার নাম কি, ভাই?

শ্যামলী বললে, আমি আশ্রমের মেয়ে, নাম বলতে নেই। আমাকে দেবদাসী বলে ডাকবেন, দিদি।

তার কণ্ঠের অপূর্ব মাধুর্য আর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে পদ্মাবতী তার দিকে তাকালো।

শ্যামলী বললে, দিদি, আপনার সব কথা আমিও দাঁড়িয়ে শুনলুম। মেয়েমানুষের মন দিয়েই বুঝতে পারি, কী যন্ত্রণায় আপনি এখানে ছুটে এসেছেন। এ আপনার জীবন মরণের সমস্যা, আপনার সকল

ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ, আপনার সন্তানসন্ততি, আপনার সংসার, আপনার সকল ধর্ম—এর সঙ্গে জড়ানো। আপনার কথায় বুঝতে পারি, কী বিপদ আপনার!

এমন স্নেহময় আত্মীয়তায় অভিভূত পদ্মাবতীর দুই চোখে অশ্রু ভেসে এলো। মৃদুকণ্ঠে সে বললে, স্ত্রী অহংকার আমার ঘুচে গেছে, আমি এসেছি হার মানতে, আমার স্বামীকে ভিক্ষে নিতে এসেছি তার কাছে। আমি তার দয়া চাই।

শান্ত হাসিমুখে শ্যামলী বললে, এমন কথা বলতে নেই, দিদি। সে পাতকী, অধম, আপনার ওই দুখানি পাদপদ্মের কাছে মাথা রাখার যোগ্যতাও তার নেই—সে কীটানুকীট। কিন্তু আপনি অনেক বড়, আপনি মহীয়সী! ভিক্ষে চাইবেন, দয়া চাইবেন সেই হতভাগীর কাছে? পথে পথে যে-পাতকী আশ্রয় নিয়ে ঘুরেছে, আঁস্তাকুড় ছিল যার সম্বল,—আপনি তার কাছে চাইতে যাবেন ভিক্ষে?

পদ্মাবতী বললে, সে-মেয়েটা কি এখানে এখন আছে, ভাই?

হ্যাঁ দিদি, আছে সে অভাগী এখানে, এখনো মরেনি! তার সাধ্য কি, অশুচি শরীর-মন নিয়ে সে আপনার সামনে এসে দাঁড়ায়! কিন্তু আমিও আপনাকে সাহায্য করবো, দিদি। আপনার স্বামী কেবল মহৎ নন, তাঁর মতন চরিত্রবান আর পরোপকারীও দুর্লভ। এত বড় বিরাট পুরুষকে কলুষিত করবে কোন্ কুলটার সাধ্য? আপনার স্বামীর পায়ে আঁর কোনোদিন কুশাঙ্কুর না ফোটে, সে-চেষ্টা আমিও করবো, দিদি? ছোট বোনকে আপনি বিশ্বাস করুন, সে আপনার সকল আশঙ্কা দূর করে দেবে।

পদ্মাবতী বললে, এখানে আমার স্বামী কি রোজ আসেন?

না। যতদূর জানি, এই আটমাসের মধ্যে তিনি এসেছেন মাত্র তিনবার। এসেছেন ওই হতভাগীরই জন্যে। যাতে সে ধর্মপথে থাকে,

যাতে তার মনের উন্নতি ঘটে, যাতে সে স্থায়ী আশ্রয় পায়—এই সব দেখাশোনা করতে। তাছাড়া আপনার স্বামী এই আশ্রমের কল্যাণের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি যে মহৎ, কাঙালের দুঃখ যে তাঁর বুকে বাজে!—বলতে বলতে শ্যামলীর আবিষ্ট একটি চক্ষু ছলছলিয়ে এলো।

পদ্মাবতীর চোখদুটি গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, তুমি কে তা জানিনে, তোমার পরিচয় কি, তাও আমার জানা নেই, ভাই। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করছি। তুমি আমাকে এই অপমান থেকে উদ্ধার করো, হয়ত তোমার সাহায্যে আমার সংসার, আমার ছেলেমেয়ে, আমার ইহকাল পরকাল সব সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচতে পারে।—তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

শ্যামলীর কণ্ঠস্বর অসহ্য হৃদয়াবেগের অশ্রুতে জড়িয়ে এলো। এই ত্রিভুবনের সর্বশেষ আশ্রয়-বিন্দুটিও যেন তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছিল। তার সর্বস্বান্ত জীবনের পরম সান্ত্বনার ক্ষুদ্রতম লক্ষ্যটিও আজ সে হারালো। যেন ওই চারিদিকের শূন্য ব্যোমলোকের অসীম অন্ধ-ধূসরতার মধ্যে তার দিশাহীন প্রাণসত্তা চিরকক্ষহারা ধূমকেতুর মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে তার অবশিষ্ট চোখটিও যেন সাগর-পরিমাণ বেদনাশ্রুতে পলকের জন্য অন্ধ হয়ে এলো।

পদ্মাবতী উৎসাহিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, বেলা গেল, এবার আমি যাই। তা হলে—এ ভার কি তুমি নেবে বোন?

শ্যামলীর কম্পমান হৃদ্‌পিণ্ডটি ছিদ্র হয়ে একটি জড়িত স্বর শুধু বেরিয়ে এলো, নেবো দিদি, আপনি আশীর্বাদ করে যান্।—এই বলে সে যেন পদ্মাবতীর পায়ের কাছে প্রণাম করতে গিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়লো।

আশীর্বাদ করে পদ্মাবতী সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে গেলেন।

*　　　*

*

দিন আষ্টেক পরে কি একটা পর্ব উপলক্ষ্যে সেদিন রয়-ষ্টিভেন্স কোম্পানীর অপিস বন্ধ। সুধাংশু বাড়িতেই ছিল। আহারাদির পর একখানা সংবাদপত্র হাতে নিয়ে সে অজিতকে ইউরোপের যুদ্ধের ভয়াবহ রূপের বর্ণনা করছিল। ফ্রান্সের পতন ঘটে গেছে, হিটলারের প্রচণ্ড বিজয়-অভিযান চলেছে সমগ্র মহাদেশে। ওদিকে উত্তর আফ্রিকায় মুসোলিনীর সাম্রাজ্য পুনর্দখলের জন্য মিত্রপক্ষ সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। একটা শেলাই হাতে নিয়ে পদ্মাবতীও মনোযোগের সঙ্গে সব শুনছিল।

এক সময় বাইরে নরেনের গলার আওয়াজ শোনা গেল, মনিব, আছ নাকি ঘরে?

হ্যাঁ, আছি। এসো।—সুধাংশু সাড়া দিল।

সুধাংশুর সঙ্গে পদ্মাবতীও বাইরে এলো। এসেই দুজনে চমকে উঠলো, নরেনের সঙ্গে পোশাকপরা একটি মেয়ে। সুধাংশু হাসিমুখে বললে, এ কি, নীনা?

নীনা এগিয়ে গিয়ে সুধাংশু ও পদ্মাবতীকে প্রণাম করলো। হাসিমুখে বললে, যাবার আগে দাদা ও বৌদিদিকে প্রণাম করতে এলুম।

নীনার পরনে সামরিক নার্সের পোশাক। মাথায় পিতলের বোতাম বাঁধানো টুপি—পরনে হাইল্যাণ্ডারের মতো খাকি কাপড়ের চমৎকার ঘাঘরা।

সুধাংশু বললে, কোথায় যাবে তুমি?

নীনা বললে, আপাতত যাবো করাচীতে, তারপর সেখান থেকে যেতে হবে ভারতের বাইরে। আমি উইমেনস্ অক্সিলিয়ারী কোর-এ যোগদান করেছি, দাদা।

হঠাৎ এ খেয়াল ?

খেয়াল হঠাৎই আসে, দাদা। আজ ঝড়ের ঝাপটায় জগৎ অশান্ত—আমিই বা কেন গুহার জন্তুর মতো ঘরে ব'সে থাকবো ? লজ্জা, অপমান, আর অনাচার—এদের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে আমি চললুম। কিন্তু বৌদিদি, একটি সুসংবাদ আপনাকে দেবো যাবার সময়ে।

পদ্মাবতী হাসিমুখে এগিয়ে এসে নীনার হাত ধরলো। নীনা বললে, আমরা তিন-আইনে গতকাল দুজনে বিবাহ করেছি। আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে আপনি আশীর্বাদ করুন।

নীনার সঙ্গে নরেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পদ্মাবতীর পায়ের কাছে প্রণাম করলো।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে সুধাংশু-পদ্মাবতী একসঙ্গে বলে উঠলো, এ কি সত্যি ?

নরেন বললে, মনিব, আমাদের সমস্ত স্খলন পতন, অনাচার কলঙ্ক, ত্রুটি-বিচ্যুতি সমস্ত মেনে নিয়ে আমাদের দুজনকে স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা দাও, আমাদের স্বীকার করে নাও। পারবে না ?

নিঃশ্বাস ফেলে সুধাংশু বললে, হ্যাঁ, পারবো।

পদ্মাবতী বললে, বেশ করেছেন, ঠাকুরপো। আমি এই কামনা করি, আপনাদের দুজনের জীবন যেন গৌরবে ভরে ওঠে। মানুষের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়—এইটিই আপনাদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠুক।

বাইরে মোটরের ইলেকট্রিক হর্ণ বেজে উঠলো। নীনা বললে, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কিছু বাজার হাট করতে হবে। এই প্রার্থনা রইলো, কোনোদিন যদি প্রাণ নিয়ে ফিরে সংসার রচনা করতে পারি, সেদিন আমার কুটীরে আপনি পায়ের ধূলো দেবেন, বৌদিদি। দাদা, আজ তবে চললুম।—ওগো, শীঘ্র এসো।

পরস্পর নমস্কার বিনিময় করে নরেন ও নীনা ঝড়ের মতো বারান্দা

পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তাদের পিছনে সুধাংশু ও পদ্মাবতী অভিভূত, বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল।

কতক্ষণ এইভাবে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল কে

পিছন থেকে টেলিফোনের ঝণ-ঝঙ্কারে তাদের দুজন

রিসিভার তুলে কানে নিয়ে অজিত বল

কে

আপনি এসে ধরুন।

সুধাংশু ঘা

ধরে সাড়

আত্মানন্দ বললেন, মাকে অনেকবার মানা করলুম, কিন্তু শুনলোনা।

শ্যামলী বললে, শুনবো কেমন করে? সন্তানকে দূর দেশে পাঠিয়ে মা একা থাকবে কি নিয়ে? তা ছাড়া ডাক দিয়েছেন গোবিন্দজীউ, আমাকে সব ফেলে যেতে হবে। এই আশ্রম, হরিণ, লালমোহন পাখি, ফুলের বাগান, ওই মন্দির, মেয়েরা—সব ভালোবাসার ধনকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলুম, দয়াময়, তুমি ওদের ভার নিয়ো।

সুধাংশু কম্পিতকণ্ঠে বললে, এদের ভার আমি বইতে পারবো, ঠিক জানিস তুই?

পারবে গো, পারবে—তুমি যে বনস্পতি! কতলোক, কত প্রাণ তোমার কোটরে কোটরে আশ্রয় পেয়েছে। তুমি ঠিক পারবে।

পদ্মাবতী শ্যামলীর হাত ধরলো। আত্মগ্লানির অশ্রুতে তার দুই চোখ ভরে উঠেছে। বললে, শ্যামলী, আমাকেও তুমি ক্ষমা করে যাও! আমি আগাগোড়া তোমাকে ভুল বুঝে অন্যায় করেছি, বোন। তোমার এই সর্বত্যাগ করে যাওয়ার প্রকৃত কারণ কি, একথা আমি এখন বুঝতে পেরেছি। আমারই কল্যাণের জন্য, শান্তির জন্য তুমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছ। তুমি যেয়োনা, বোন—এবার থেকে নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে তোমাকে আমি স্বীকার করে নেবো। তুমি যেয়োনা, শ্যামলী।

শ্যামলী বললে, দিদি, কাঙালিনী এবার পরমধনের সন্ধান পেয়েছে, নদীতে তাই এত জোয়ার। তোমার স্বামী হলেন আমার মন্ত্রগুরু, তাঁরই মন্ত্রে পেয়েছি গোবিন্দজীউর আশ্রয়। তিনিই আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, গোবিন্দজীউর কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি মন্ত্রদাতা, ত্রাণকর্তা!—এই বলে সে আর একবার সুধাংশুর পায়ের ধূলো নিল।

পদ্মাবতী বললে, তোমরা কি এখনই যাবে? তবে চলো আমাদের গাড়িতে -স্টেশনে পৌঁছে দিই?

না দিদি, সন্তানের হাত ধরে আমি হেঁটে যেতে পারবো। দয়াময়, এবার হাসিমুখে বিদায় দাও ?

ধরা গলায় সুধাংশু বললে, দিলুম। তোর সাধনা যেন সার্থক হয়, শ্যামলী !

স্বামী-স্ত্রী দুজনে পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েরা ও আশ্রমিকরা সবাই এসে দাঁড়াল। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আত্মানন্দজীর সঙ্গে শ্যামলী হাসিমুখে পথে বেরিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যাবেলায় সুধাংশু যখন বাড়ির ধারে এসে স্ত্রীর হাত ধরে গাড়ি থেকে নামলো, তখন তাদের সহাস্য মুখ দেখে মনে হোলো, তাদের যত চিত্তমালিন্য ও নিরানন্দ—সমস্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাদের নবজীবনে কোনো কলুষ, কোনো অবসাদ আর বিন্দুমাত্র নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাবার মুখে সহসা দেখা গেল, সুরবালা ঝঙ্কার দিতে দিতে নেমে আসছেন। মেয়েকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, ভালো আক্কেল তোর, সেই কখন্ থেকে বসে আছি, তোমার আর আসবার সময় হয় না। ভালো জ্বালা হয়েছে আমার।

শাশুড়ীকে দেখে সুধাংশু নতমুখে সরে দাঁড়ালো। পদ্মাবতী বললে, তুমি কেন এসেছ, মা ?

সুরবালা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, তোর কথা শুনলে গা জ্বলে যায়, পদ্মা।

পদ্মাবতী কঠিন কণ্ঠে বললে, তুমি যাও মা, আমার স্বামীর বাড়িতে আর তোমার আসবার দরকার নেই। মন ভাঙাভাঙির সর্বনেশে খেলায় আর তুমি আমাদের মাতিয়ে তুলো না, তুমি এখনই চলে যাও।—এই বলে সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল। সুধাংশু গেল পিছনে পিছনে।

॥ সমাপ্ত ॥

•••এক•••

এণ্ড স্টিভেন্স-এর অফিস হোলো লালদীঘি অঞ্চলে। অধুনালুপ্ত ...রেল্ মনুমেন্টের দাগটার উপর দাঁড়ালে উত্তর দিকে দেখা যায় ...বর্ণের অট্টালিকা—ওটার নীচের তলায় একটা বড় ব্যাঙ্ক, এবং ...তিনটে তলাতেই রয় এণ্ড স্টিভেন্স-এর একচ্ছত্র আধিপত্য।

...বিস্ময়ের কথা, সুধাংশু রায় অর্থাৎ একজন বাঙালী হোলো ওই ...ার প্রধান অধিনায়ক। অফিসটা পাঁচ বছর আগেও ছিল ছোট, ...ন—হঠাৎ একদিন ওর প্রাণের মধ্যে এলো জোয়ার, রাতারাতি ...ল ফেঁপে উঠলো। আগে ছিল চারজন অংশীদার, কিন্তু ক্রমবর্ধমান সময় ...ত্র-মূল্যে সুধাংশুর কাছে শেয়ারগুলি বেচে মিঃ ইসমায়েল ও ...ভাই প্রস্থান করেছেন। এখন বাকি আছেন স্টিভেন্স সাহেব ...অবিবাহিত, ধর্মভীরু স্টিভেন্স আর থাকতে চান না, এবং সম্প্রতি ...তাঁর শেয়ারগুলির বিনিময়ে একটা গ্র্যাচুইটি নিয়ে বিলেত যাবার ...স্তুত হচ্ছেন। কিন্তু সুধাংশুর পীড়াপীড়িতে তাঁকে থাকতে হচ্ছে ...কিছুদিন।

...ভেন্স বললেন, না, মিঃ রয়, আমাকে বাকি ক'টা দিন এসেক্সের ...রে গিয়ে এবার থাকতে দাও। আর নয়। বাঙালী ব্যবসা ...এই দুর্নাম কত বড় মিথ্যে—এইটি চোখে দেখার জন্যেই আমি ...'রেও যেতে পারিনি।

...শু বললে, এটা আমার প্রতি তোমার শুধু স্নেহ, মিঃ স্টিভেন্স।

স্নেহ তুমিও করেছ, রয়। আমাকে সর্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস করেছিলে। সেই বিশ্বাসই তো ভালোবাসা। দেখে গেলুম তোমার উন্নতি, কত ছোট থেকে কত বড়। বয়স তোমার সবেমাত্র পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে, সামনে তোমার অনন্ত সম্ভাবনা, মিঃ রয়।—এই ব'লে ষ্টিভেন্স সাহেব সুধাংশুর হাতে একটু চাপ দিলেন।

সুধাংশু বললে, একথা ভুলবো না মিঃ ষ্টিভেন্স, তুমিই এর হাল ধরে ছিলে গোড়া থেকে। তুমি না থাকলে সেই ভাটিয়া ক্রোড়পতি পুরণ দরবারির হাতে আমাকে নাস্তানাবুদ হ'তে হোতো। কত ব্যাঙ্কের আর কত মহাজনের চাতুরী থেকে এই কোম্পানীকে বাঁচাতে হয়েছে। তুমি পাশে না থাকলে কত বিপদে পড়তুম।

হাসিমুখে ষ্টিভেন্স বললে, কথাটা ঠিক হোলো না। তোমার ব্যবসার ইতিহাসে কোনোদিন ধূর্ততা আর মিথ্যাচার নেই, মিঃ রয়—কোনদিন তোমার কাছে কেউ ঠকেনি। সেই সুনামই তোমাকে শক্তি দিয়েছে, আমি একথা বিশ্বাস করি, মিঃ রয়।—আচ্ছা, একথা পরে হবে। এখন আর তোমাকে বিরক্ত করবো না।—এই ব'লে টুপিটা তুলে নিয়ে বুড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শিবনারায়ণবাবু এতক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ারে ব'সে সাহেবের মুখে সুধাংশুর সুখ্যাতি শুনছিলেন। এবার বললেন, বাবাজি, তোমার ম্যানেজার সাহেব একথাটি বোধ হয় জানে না, মানকুণ্ডুর পুরনো রায়বংশের ছেলে ছোট কাজ কখনো করতে পারে না। জমীদারী আজ কিছুই না থাক্, কিন্তু বনেদী বংশের রক্তে সভ্যতা আর সংস্কার রয়েছে মিলিয়ে। একথা ত শুনেছি বাবা, তোমার সততা আর সাধুতার জন্যে শেয়ার মার্কেট আর ষ্টক এক্সচেঞ্জের পাড়ায় অনেক জুয়াড়ির নাকি সর্বনাশ ঘটে গেছে।

স্মিতমুখে সুধাংশু বললে, আপনি শুনলেন কেমন ক'রে, কাকাবাবু?

মিসেস নাগ বক্রোক্তি ক'রে বললেন, মিস চাটার্জির কি আজকে রাতে ঘুম হবে? সাহেব নিজে এসে ডিকটেট্ করলেন!

মিস চৌধুরী বললে, ঘুম ভালোই হবে সুষমাদি—যাকে বলে সুখনিদ্রা!

আনা জোন্স হাত থামিয়ে বললে, সম্ভবত মিস চাটার্জি কিছু অনুপ্রেরণাও পেয়ে গেল, তাই না?

মিস চাটার্জি কেবল সলজ্জ ও সপ্রতিভভাবে টাইপ ক'রে যেতে লাগলো। এক সময় শুধু বললে, কাজে উৎসাহ থাকা তো নিন্দের কথা নয়, সুষমাদি।

মিসেস নাগের বদলে মিস চৌধুরীই গলা বাড়িয়ে উত্তর দিল। বললে, আমরা কি নিন্দের কথা বলছি, হৈমন্তী? তুমি ভাই কেবলই বাঁকা কথা কও। বেশ তো, কাজ দেখিয়ে যদি সাহেবের নজরে পড়তে পারো, তোমারই উন্নতি।

মিসেস নাগ এবার বললেন, আমরা পুরনো, তাই পিছিয়ে পড়েছি। তুমি নতুন, বয়স অল্প—তুমি প্রিয় হ'তে পারলে সকলেরই আনন্দ, কি বলো অমিতা?

মিস চৌধুরী ও আনা বললে, নিশ্চয়। ওতে আমাদের কোনো হিংসে নেই!

তিনজন সহকর্মীর কণ্ঠস্বরে দাহ, বক্রতা ও বিদ্রূপ অনুভব ক'রে হৈমন্তী কিছু বলতে আর সাহস করলো না।

কিন্তু—ব'লে আনা জোন্স আবার হাতের কাজ থামালো। পুনরায় হেসে বললে, কিন্তু মিঃ রয় সম্বন্ধে আমি বড় নিরাশ।

সকলেই তা'র মুখের দিকে তাকালো। আনা বললে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে উনি ভয়ানক ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত!

মিস চৌধুরী বললে, পুরুষমানুষের মেজাজ কি সঠিক কেউ জানে?

কেন ?

মিত্তির বললে, জানতে চাও তাই স্পষ্ট ক'রেই বলি। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর স্ত্রীর জ্ঞাতসারেই একটা হারেম্ গড়ে তুলেছিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ হোলো উর্বশীর দেহচ্ছটায়। দেবতারা যখন মর্ত্তে নেমে পাষাণমূর্ত্তি হলেন, তখনও লোভ ছাড়তে পারলেন না। ফলে, দেবদাসীদের আবির্ভাব। এ ছাড়া নরজগতের দিকে তাকাও। গুরু হলেই শিষ্যারা আসেন, কবি হলেই আসেন অনুরাগিনীরা, উঁচুদরের রাজপুরুষরা রাখেন লেডি-সেক্রেটারী। আমাদের মতন দু'চারটি অভাজন যারা আছে, তারা যদি দু'চারটি অবিত্তার প্রসাদ পেয়ে দুঃখের জীবন কাটিয়ে যেতে পারে, তবে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কি জানো সুধাংশু, পৃথিবীর নারীসম্পদের দিক থেকে চিরদিন মুখ ফিরিয়ে থাকা অসুস্থ মনের পরিচয়।

সুধাংশু বললে, কি বকছো পাগলের মতন ?

মিত্তির বললে, বটে, পাগলকেই দেখলে, যুক্তিটা শুনলে না ? আর, সাধু-ফকিরকে লোক বরং সহ্য করে, কিন্তু স্ত্রৈণ পুরুষ জগতের সর্বত্রই অসহ্য ! পুরুষ জাতির কাছে সে অবজ্ঞার পাত্র, আর নারীসমাজের চোখে বিদ্রূপের বস্তু !

তবে কি চরিত্রহীন হওয়াটাই বাহাদুরী ?

নারীজগৎকে সভয়ে এড়িয়ে চলাটাও বাহাদুরী নয়, সুধাংশু।

আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভারটা কানে তুলে নেবার আগে সুধাংশু বললে, আচ্ছা কথা দিলুম, ঘোষালকে যেমন করেই হোক পাকড়ানো চাই—যত টাকা লাগে। আজই চলো সন্ধ্যো ছ'টার পর।

এমন সময় বাইরে থেকে ষ্টিভেন্স সাহেব একবার সাড়া দিলেন।

ইয়েস, কাম্ ইন্।—ব'লে সুধাংশু রিসিভার তুলে নিল কানে। বললে, হ্যালো, ইয়েস—স্পিকিং।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী অসাধারণ সুন্দরী আর পবিত্র, তা জানো?

ঠোঁটের কোণটা একটু বেঁকিয়ে মিসেস নাগ হৈমন্তীর দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে বললেন, তা জেনেও তো অনেকের উৎসাহ দেখা যায়।

মিস চৌধুরী বললে, তা তুমি বলতে পারো না সুষমাদি, স্ত্রী থাকলে কি আর অন্য মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তে নেই!

...দুই...

উনিশ বছর আগে সুধাংশু বিয়ে করেছে, অর্থাৎ প্রায় কিশোর বয়সে। ঘরে তা'র সুন্দরী কল্যাণী মূর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্তত একথা সে জানে, তার প্রলোভনের আর কোনো বস্তু মেয়েদের কাছে কিছু নেই। স্ত্রীর লাবণ্যচ্ছটায় জীবনের উন্নতির পথটা সে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে, শক্তিরূপিনীর কাছে শক্তিলাভ করেছে সে প্রায় বালককাল থেকে। সুতরাং এর বাইরে আর কোনো আকর্ষণ আছে, সে বিশ্বাস করে না। কেবল তাই নয়, সে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, উত্থান আলোড়নসঙ্কুল তা'র জীবন —যে-জীবনের বাস্তব দিকটা তা'র অপরিচিত নয়—সে যে বন্ধুর সংসর্গে প'ড়ে নীচে নামতে যাবে, এমন বালকোচিত চিন্তাবিভ্রম তা'র পক্ষে হাস্যকর।

এই কথাটা মনে ক'রে সে আর নরেন সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর উপর এক প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট্‌ বাড়ির নীচে এসে মোটর থামালো। গাড়ি থেকে নেমে নরেন তা'র ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে চ'লে যেতে নির্দেশ দিল।

বাড়িটায় অসংখ্য ফ্ল্যাট্‌। আন্তর্জাতিক পরিবারের সংখ্যায় ফ্ল্যাট্‌গুলি পরিপূর্ণ। যেন এক প্রকাণ্ড জাহাজের সবাই যাত্রী। এক

ফ্ল্যাটের সঙ্গে অন্যটার কোনো সম্পর্ক নেই। এদিকে কারো মৃত্যু ওদিকে কারো হারমোনিয়মে গান থামে না। এটা অদ্ভুত রাজ্য।

সিঁড়ি বেয়ে দুই বন্ধু চারতলায় উঠে এলো। ইলেকট্রিক বেল বোতাম টিপলো নরেন। ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল, এবং তা পরেই এক হিন্দুস্থানী বুড়ো চাকর এসে দরজা খুলে দিল। দুই ব এলো ভিতরে।

বারান্দা পেরিয়ে তারা এলো এক হাল ফ্যাশনের বড় ড্রয়িং হল-এ। ভিতর মহলের দিকে পর্দা ফেলা। এ-পাশে লাইব্রেরী—কাঁচের আলমারীতে বই ঠাসা। চারিদিকের দেওয়ালে ইটালিয়ন্ পেন্টিং, কয়েকটি বহুমূল্যবান ছবি ঝুলছে। এক কোণে একটি শ্বেতমর্মর মূর্তি—কোন্ এক বিদেশী ভাস্করের। সামনে পাথরের টেবলে কেয়া ও রজনীগন্ধার গোছা। পাশে ধূপদানিতে সুগন্ধী ধূপ জ্বলছে। মেঝেতে পার্শিয়ান কার্পেট পাতা। পর্দার আড়ালে ডাইনিং হল্ অল্প যেটুকু বাইরে থেকে চোখে পড়ে, দেখা যায় নানাপাত্রে বিবিধ বর্নের ফলমূল সাজানো। মীট কেসের উপরে একরাশি পেয়ালা ও কাঁটা-চামচ ঝকঝক করছে।

কোথাও অপরিচ্ছন্নতা, কুরুচি ও অসঙ্গতির চিহ্ন মাত্র নেই। এর আগের দিন সুধাংশু এ গৃহবাসিনীর সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের তারিফ ক'রে গিয়েছিল, এবং নরেন বলেছিল তা'র কানে-কানে, বেশী নয়, আমি ছাড়া আর মাত্র ছয়টি বিশিষ্ট নাগরিক মিস গুপ্তার এখানে পায়ের ধুলো দেন, এবং তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট তারিখ আছে। কা'রো সঙ্গে কা'রো সংঘর্ষ বাধে না।

ব্যবসায়ী সুধাংশু ব'লে বসলো, উপার্জন কত্তো?

আন্দাজ করতে পারি, হাজার খানেকের কম নয়।

গদী আঁটা আরাম কেদারায় দুজনে বসলো। সুধাংশু বললে, কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে ভদ্রঘরের মেয়ে?

নরেন বললে, এখনও তাই বলি।—যাকগে, ওটা নিয়ে আর আলোচনায় কাজ নেই, কলকাতায় এমন অনেক আছে। আমাদের কার্যোদ্ধারটাই আসল কথা।

জুতোর পায়ের শব্দটা নিকটতর হয়ে এলো, এবং তারপরেই একটি তরুণী পর্দা সরিয়ে হাসিমুখে নমস্কার ক'রে এসে দাঁড়ালো।

নরেন সোৎসাহে বললে, মনিবকে ধ'রে আনলুম তোমারই অনুরোধে, মিস গুপ্তা।

মিস গুপ্তা হাসিমুখে বললে, বেশ তো, কমিশন দেবো। তারপর? ভালো আছেন, মিঃ রয়?

সুধাংশু বললে, কারবারি লোক আমরা, কাজ ভালো না চললে ভালো থাকিনে।

মিস গুপ্তা একখানা কেদারায় বসলো। বললে, আমি শুনেছি সব টেলিফোনে। ঘোষাল সাহেব এসেছেন, ও ফ্ল্যাটে আছেন। আসবেন এখুনি।

নরেন বললে, তুমি কিছু বলেছ ওঁকে?

না, আগে থেকে কিছু বললে সতর্ক হয়ে যাবেন। তোমরা তো চতুর কম নয়, কি বলুন মিঃ রয়?

সুধাংশু হেসে বললে, চতুর ব'লেই তো আপনাদের সঙ্গে পেরে ওঠে! বুদ্ধিমান না হ'লে তলিয়ে যেতো।

মিস গুপ্তা হেসে উঠলো।

নরেন বললে, শোনো নীনা, ঘোষালের ভার তুমি নাও। একটা খেই তোমাকে ধরিয়ে দিই, সামনের বছরের গোড়ায় ইলেক্‌শন। ঘোষাল জানে, গত ইলেক্‌শনে আমার হাত ছিল কতখানি। এবারেও সে রিটর্নড্ হতে চায়।

মিস গুপ্তা বললে, কিন্তু চিরঞ্জীলাল ওকে আগেই টাকা খাইয়ে রেখেছে মনে হোলো।

কেমন ক'রে জানলে ?

জানলুম ? নীনা হেসে বললে, গত শনিবারে সোজা এসে আমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলো। বললে, এই রইলো প্রণামী। পাঁচশো টাকার তোড়া। সেদিন নেশার ঘোরে চিরঞ্জীলালের কী সুখ্যাতি !

নরেন ও সুধাংশুর দৃষ্টি বিনিময় হোলো। নরেন বললে, তাহলে কি আশা নেই, নীনা ?

নীনা বললে, একটু আশা আছে। লোকটা আমুদে। যদিও মোটা টাকা জমিয়েছে, তবুও পরের খরচে আমোদ চায়। আর কি জানো ? পঞ্চাশ পেরিয়েছে কিনা, তাই মেয়েমহলে পুরনো চেহারার মিথ্যে সুখ্যাতি শুনলেও আনন্দে ডিগবাজি খায়।

সুধাংশু হেসে উঠলো। বললে, আপনার এক বন্ধুর গলদ আর এক বন্ধুর কাছে বলছেন। নরেনকেই বা বিশ্বাস কি ?

নীনা বললে, বিশ্বাস কারুকেই করিনে, মিঃ রয়। দরকার হলে ঘোষাল সাহেবকেও বলবো নরেনবাবুর গলদ। কিছু মাত্র কৃপণতা হবে না।

সে কি !

নরেন বললে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সুধাংশু। একে ব'লতে পারো গণতান্ত্রিক ঘনিষ্ঠতা। ওঁরা সকলের কাছেই অন্তরঙ্গ !

কিন্তু এটা তো মিথ্যে ! এর মধ্যে যারা থাকে তাদের দম আটকায় না ?

অলক্ষ্যে নরেন সুধাংশুর পাঁজরার কাছে একটা চিমটি দিল, অর্থাৎ তোমার নৈতিকবুদ্ধি আর সততার আদর্শ এখন স্থগিত রাখো ; কাজের দিকে মন দাও।

সুধাংশু চুপ ক'রে গেল।

নীনা বললে, দম আটকাবে কেন ? এখানে সামাজিক দায়িত্ব কারো

নেই, পারিবারিক শুচিতা কিম্বা শয়ন [illegible] দরকারও নেই কারো। মানুষের ভেতরকার শয়তান রাশ আলগা পেয়ে বেরিয়ে পড়লে কেউ নিষেধও করে না। যারা আসে তারা অস্থায়ী বন্ধু—ধুলো বালি নোংরা সবই আনে। যখন চ'লে যায়, কেউ তাদের কথা ভাবেও না। কেবল তাদের পায়ে-মাড়ানো বালি ধুলোগুলো অনাচারে অসাড় হয়ে থাকে।

নরেন বললে, পেরেছে! বক্তৃতায় তোমাদের পেয়ে বসলে তো আসল কাজ মাটি।

বুড়ো চাকর ট্রে-সুদ্ধ চায়ের সরঞ্জাম এনে টিপাইয়ের উপর রাখলো। নীনা বললে, ব্রিজলাল, নতুন পেয়ালা আনো।

দামী গোটা দুই চায়ের পেয়ালা এসে হাজির হোলো। নরেন বললে হঠাৎ নতুন পেয়ালার আমদানি যে?

নীনা বললে, শুনলে হাসবে কিন্তু আনিয়ে রেখেছি মিঃ রায়ের জন্যে।

বলেন কি?—সুধাংশু সোজা হয়ে বসলো।

হ্যাঁ। এটা কিন্তু আমার নতুন কৌশল নয়, বিশ্বাস করুন।

নরেন বললে, নতুন কৌশল নয়, নতুন রস বটে।

নীনা বললে, তবে স্পষ্ট করেই বলি। সুধাংশুবাবুকে প্রথম দেখে মনে হয়েছে, অতি-ব্যবহারের জিনিস ওঁকে দেওয়া চলবে না—। আমার ঘরের যা কিছু সবই তো জন্তু জানোয়ারদের ছোঁয়া—ওঁকে দেবো কেমন ক'রে?

সুধাংশুর সপ্রতিভ মুখ চোখ প্রায় রক্তাভ হয়ে উঠলো। নরেন খুশী হয়ে বললে, গালাগালটা আমার গায়েও এসে লাগলো। কিন্তু এ যে প্রায় রোমান্সের আঁচ পাচ্ছি! এইজন্যেই সুধাংশুর সঙ্গে মেয়েমহলে গিয়ে আনন্দ নেই…মেয়েদের পক্ষপাতিত্ব যেন ওকে পেয়ে বসে।

মিস গুপ্তা নতমুখে চায়ের পেয়ালায় চামচ নেড়ে এগিয়ে দিল। নরেন

বললে, সুধাংশুর ঝগড়াটা তাড়াতাড়ি শেষ হ'লে বাঁচি। খাল কেটে কুমীর আনতে পারলো না, আমারই সর্বনাশ।

নীনা এবার হেসে উঠলো। সুধাংশুও হেসে গা ঝাড়া দিয়ে বললে, আচ্ছা, এবার আমাদের কাজের কথাটা যদি শেষ হয়—কই, ঘোষাল সাহেব কি এখন আসবেন না?

নীনা বললে, যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ স্বস্তি। এলেই তো সেই পুরনো চাটুবাক্য। অবিশ্যি আজকাল তিনি আমার ডালে পা রেখে অন্য ডালের ফল পাড়বার চেষ্টায় আছেন।

কি রকম?—নরেন প্রশ্ন করলো।

সেই যে বলেছিলুম, ওদিকের ফ্ল্যাটে নবদ্বীপের একটা মেয়ে এসেছে, তারই পায়ে ঘোষাল ঘুরছেন মেনি-বেড়ালের মতন।

এ জগৎটা নতুন, বিচিত্র এখানকার মানুষ, অশ্রুতপূর্ব এর ভাষা। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুধাংশু চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

নরেন প্রশ্ন করলো, কেমন মেয়ে?

নীনা বললে, চকচকে কালো, সিপসিপে। বছর চব্বিশ বয়স মনে হোলো। অল্প বয়স কিনা তাই ছটফটে—বুড়োদের প্রাণ আনচান ক'রে ওঠে। মেয়েটা নাচতে গাইতে জানে ভালো। সেদিন ওর কীর্তন শুনলুম।

নরেন হাসিমুখে বললে, কে এমন মেয়ে এলো এই পাড়ায় আমাদের কুল মজাতে? নাম কি?

মিস গুপ্তা বললে, নামটাও বিতিকিচ্ছি—শ্যামলী। তবে ওই চেহারায় কুল মজাবার ক্ষমতা তা'র নেই! কত ছুঁড়িই দেখলুম এ পাড়ায়—হুস ক'রে আগুন জ্বালিয়ে ছাই হয়ে নিবে গেল!

নরেন বললে, চুলোয় যাক। নাচ-গান জানা তো বড় কথা নয়, চেহারাটা ভালো হওয়া দরকার। ভদ্রঘরের মেয়ে নাকি?

মিস গুপ্তা বললে, হ্যাঁ, তাই তো বলে বেড়ায়। মা নাকি বিধবা হয়েছে অল্প বয়েসে। বাপের নিজেরও কিছু গণ্ডগোল ছিল, মেয়েটাকেও ধ'রে রাখতে পারেনি।

ঘোষাল মজলো কিসে? চেহারা তো ভালো নয় বলছ।

নীনা বললে, মজবার লোক ঘোষাল নয়, ওটা কেবল মুখ বদলানো মাত্র। মেয়েটা বার দুই যেন কোন্ সিনেমার ছবিতে নাচগানের অভিনয় করেছে, তাই শুনে ঘোষাল তো পাগল। একে সিনেমার অভিনেত্রী, তায় খবরের কাগজে নাম ছাপা—এর ওপর যদি ভদ্র ঘরের মার্কা থাকে—তুমি বলো তো, ঘোষাল কি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে?

হাসিমুখে সুধাংশু বললে, কালো-কদাকার হ'লেও?

হ্যাঁ। কারণ ভদ্রবংশের বিজ্ঞাপন—আভিজাত্যের ছাপ পড়ে!

কিন্তু আপনিও তো সম্রান্ত ঘরের মেয়ে, মিস গুপ্তা?

নীনা সোজা সুধাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সহজ দৃষ্টিতে বললে, আপনি এ-খবর জানেন শুনে দুঃখিত হলুম, মিঃ রয়। আমার পরিচয় আমি গোপন রাখতে চাই—সেইজন্যে নামটা আগেই বদলে রেখেছি। আমার নাম গুপ্তা বটে, কিন্তু নীনা নয়। যা আমি ক'রে থাকি, সেটা অগৌরবের, আমি জানি।

সুধাংশু বললে, অগৌরব জেনেও এপথে এলেন কেন?

নীনা বললে, শখ! আই-এ পাস করার পরে দেখলুম, বহুপ্রকারের শখ আমার মনে। চেহারাটা চকচকে ছিল একটু, এবং মাথার ওপর অভিভাবক ছিল না। একদিন বুঝতে পারলুম, চেহারাটা ভাঙালে কেবল টাকা নয়, ঐশ্বর্যও কিছু পাওয়া যায়। পথটা খুব সহজ। নরেনবাবু আর ঘোষালদের কৃপায় সৌখীন ধনীরা এলেন মৌমাছির মতন। অভাব কিছু রইলো না।

নরেন বললে, তোমার জীবন-বৃত্তান্ত একটু সংক্ষেপে সারো, নীনা।

নীনা বললে, তার নেই, এ যায়গারে মাথা না ঢুকে ঘোষাল কোথাও যাবে না।—এই বলে সে উঠে পড়লো। অলক্ষ্যে সে একবার তাকালো সুধাংশুর শুভ্র আয়ত ছুটো চোখের দিকে। সে-চোখে কৌতুক, কিম্বা কৌতূহল, অথবা তার প্রতি দয়া—কোনটাই সহজে বোঝা যায় না।

ব্রিজলাল বাইরে অপেক্ষায় ছিল। নীনা বললে, একবার যা তো বাবা, ঘোষাল সাহেবকে খবর দে।

নরেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না থাক্ আমি নিজেই যাচ্ছি—লোকটা নতুনের গন্ধ পেয়েছে, ব্রিজলালের কথায় আসবে না।—এই ব'লে সুধাংশুর আঙুলে আর একটা টিপ দিয়ে নরেন চ'লে গেল। অর্থটা এই দাঁড়ায়, সুযোগ দিয়ে গেলুম, নিজের কাজ গুছিয়ে নাও।

এবার ছুজনে একা প'ড়ে গেল। নীনা বললে, এখানে বসতে আপনার অসুবিধে হচ্ছে, ভেতরে যাবেন?

সুধাংশু বললে, একটুও অসুবিধে নেই, বেশ আছি। কিন্তু রাত হোলো, এবার যেতে হবে।

নীনা হাসলো; বললে, আপনার কথা প্রায়ই শুনি নরেনবাবুর কাছে। আপনার স্ত্রী অপূর্ব সুন্দরী—ছুর্গা প্রতিমা! আপনার হাতের ওই নীলার আংটি তাঁরই দেওয়া, এও জানি। ভাগ্যটা কা'র ভালো তাই ভাবি—স্ত্রীর, না আপনার?

হাসিমুখে সুধাংশু বললে, কেন বলুন তো?

ছবিতে দেখেছি হর-পার্বতী ব'সে রয়েছেন কৈলাস-শিখরে। আর কিছু নয়—মহাযোগীর আধ-ঘুমন্ত ছ'টি টানা চোখ দেখে কতবার মনে হয়েছে, মানুষের পক্ষে এ-চোখ সম্ভব নয়। সেদিন রাত্তে আপনাকে দেখে আমার ভুল ভাঙলো।

সে কি!—সুধাংশু একেবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলো।—বললে,

এমন কথা সকলের সামনে আর বলবেন না। অন্তত নরেন জানলে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। সাবধান!

তার হাসিতে নীনা যোগ দিতে পারলো না। তবু একটু থেমে বললে, ঘোষাল সাহেবকে দিয়ে আপনার কাজ আমি করিয়ে দেবো। কিন্তু আমার বকশিস?

সুধাংশু বললে, কত চান্ বলুন?

যদি বলি, হাজার খানেক?

বললে তাই দিতে হবে। একাজ আমার হওয়া চাই, মিস গুপ্তা।

নীনা বললে, কিন্তু গোপনে চিরঞ্জীলালের কাছে বেশী টাকা নিয়ে যদি আপনার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করি?

সুধাংশু বললে, করলে আশ্চর্য হব না।

হবেন না? কেন?

বিশ্বাসের দাম তো আপনাদের কাছে কিছু নেই!

নীনা চুপ ক'রে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, আপনি নেশা করেন?

সুধাংশু বললে, করি।

স্ত্রী জানেন?

জানেন বৈ কি।

একথা কি তিনি জানেন, একদিন আপনি আমার এখানে এসেছিলেন?

হ্যাঁ, এও জানেন। তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু স্ত্রীর আলোচনা থাক্, মিস গুপ্তা। এখানে ওটা বেমানান। আমার কাজটা আপনি দয়া ক'রে ক'রে দিন—আপনার টাকা আমি দেবো।

নীনা বললে, মেয়েমানুষের হাতে ঘুষ ব'লে টাকা দিতে আপনার লজ্জা করবে না?

নির্লিপ্ত, নীরস ও নিরাসক্ত কণ্ঠে সুধাংশু বললে, লজ্জার কোনো

কারণ নেই। আমি ব্যবসা করি, টাকা নিই। আপনারও এই ব্যবসা, আপনিও টাকা নেবেন।—ওই যে নরেন আসছে।

নরেন এসে বললে, চলো নীনা, তোমার শোবার ঘরে। ঘোষালকে পাকড়ে এনেছি আধঘণ্টার জন্যে। সেই কেলে মেয়েটার কাছ ছেড়ে উঠতেই চায় না।

ভিতর মহলে তিনজনে এসে নীনার বড় শোবার ঘরে ঢুকলো। চারিদিকে কাঁচ আর মেহগনির আসবাব। মখমলের বিছানার ওপর পড়েছে ফিকে সবুজ রঙের আলো। মেঝের ফরাসের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে রয়েছেন ঘোষাল সাহেব। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী। কানের দুইপাশে চুল পাকা, চেহারাটা কালো হলেও শ্রীহীন নয়। নাকটেপা একজোড়া চশমা চোখে। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, ফরাসডাঙ্গার কোঁচানো ধুতি, আঙুলে আংটি। পরিচয়টা দিয়ে রাখলে ক্ষতি নেই। কলিকাতা হাইকোর্টের উনি একজন বিশিষ্ট এডভোকেট। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে থিসিস্ লিখে উনি ডক্টরেট পেয়েছিলেন।

সুধাংশুকে ভিতরে ঢুকতে দেখে ঘোষাল সাহেব উৎসাহের সঙ্গে উঠে বললেন; বললেন, আসুন। নরেনের মুখে অনেকবার শুনেছি আপনার নাম। এখনকার বাঙ্গালী ধনীর মধ্যে তো আপনি একজন। ভাগ্যে আপনার দেখা পেলুম।

সুধাংশু নমস্কার ক'রে পাশে গিয়ে বসলো। নীনা মুখের হাসি টিপে বললে, অভ্যর্থনাটা খুব স্বচ্ছন্দ, কিছু রং চড়েছে দেখছি।

তা যা বলেছ।—ঘোষাল উল্লসিত হয়ে বললেন, আমাদের আনন্দ আর ক'দিন বলো। কি জানেন মিঃ রায়, এই সব জায়গায় আলাপ না হ'লে মানুষকে ঠিক চেনা যায় না। বাইরের সামাজিক জীবনে আমরা মুখোস প'রে থাকি—এখানে আপনাতে-আমাতে কোনো

অকাত নেই। আরো কথা, ওহে নরেন, তোমার বন্ধু সুধাপান করেন তো ?

হ্যাঁ, করেন বৈকি।

বেশ, সার্থক সুধাংশু নাম—তুমি তাহ'লে পরিবেশণ করো, মিস গুপ্তা ?—আমি শুনেছি আপনার কাজের কথা। আমার দ্বারা যতটুকু হয় করবো বৈ কি। চালের অর্ডারটা বেশ মোটা—এক হাজার টন। চিরঞ্জীলাল অবিশ্যি আমাকে ধরেছে এর জন্যে। তবে কি জানেন, বাঙালী আপনি, আপনার দাবিই আগে।

নরেন বললে, আপনাকে আজ পাকা কথা দিতেই হবে ঘোষাল সাহেব।

গেলাসে সোডা ঢেলে মিস গুপ্ত বললে, আপনাকে বাগ মানাতে পারলে আমারও কিছু বকশিস জোটে, ঘোষাল সাহেব।

তোমার বকশিস আবার কি গো ?

আমার বকশিস ? ভালোবাসা !

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠলো। তারপর ঘোষাল সাহেব বললেন, দাঁড়াও, ব্যস্ত হোয়োনা তোমরা। আসছে শনিবার আমাদের গার্ডেন পার্টি, সেখানে আগে কর্তাদের মন বুঝি। তারপরে কথা দিতে পারবো আশা করি।

সুধাংশু বললে, আমার কোটেশনটা কি পাঠিয়ে দেবো ?

না, এখন নয়। দেখি না চিরঞ্জীলালের দরটা—তারপরে আপনাকে জানাতে পারবো।

একটা গ্লাস ঘোষাল সাহেবের হাতে মিস গুপ্তা তুলে দিল। ঘোষাল সাহেব পলকের মধ্যে সেটি গলাধঃকরণ করলেন। নূতন সম্মানিত অতিথিকে সর্বপ্রথম গ্লাস দিয়ে অভ্যর্থনা করতে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়বারেও সুধাংশুকে না দিয়ে সে নরেনের হাতে গ্লাস দিল। আচরণটা তার অভিনব বটে।

উৎফুল্ল কণ্ঠে ঘোষাল সাহেব বললেন, যাক্—এতক্ষণে গোটা তিনেক পেগ সবশুদ্ধ পেটে পড়লো। কি জানেন মিঃ রয়—বলে তিনি সুধাংশুর কাঁধে হাত রেখে পুনরায় বললেন, সারাদিন কোর্টের খাটুনি, তা বাদে কর্পোরেশন—তারপর বাড়ি যাওয়া, স্ত্রীর মান-অভিমানের পালা, ছেলেমেয়েগুলোর চরিত্র বজায় রাখার চেষ্টা করা—সব শেষে এসে শ্রীমতী নীনার একটু চরণামৃত পান!—হ্যাঁ, তা যা বলেছেন—সারাদিন পরে একটু পেটে পড়লে কেমন হয়ে যাই, অনেকটা যেন বিশ্বপ্রেমে মেতে উঠি। আপনি বিয়ে করেছেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছেলেপুলে?

তিনটি। বড় ছেলেটি আসছে বারে ম্যাট্রিক দেবে।

বেশ, বেশ—ঘোষাল সাহেব বললেন, গোড়ার বাঁধুনি দরকার। ঠকে গেল আমাদের ওই নরেনটা। ও নাকি বলে, দেশে সতী সাবিত্রীরা থাকতে আর ও মালাবদল করবে না।—বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পুনরায় বললেন, চললুম গো নীনাদেবী—আজ তো বুধবার, আমার তারিখ নয়!

আসুন।—বলে নীনা নমস্কার জানালো। তারপর একটি পরিপূর্ণ গ্লাস সুধাংশুর দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

সুধাংশু বললে, ওটা আপনার হাত থেকে আমি নিতে পারিনে, মিস গুপ্তা।

কেন? নীনা একটু আহত হয়ে দাঁড়ালো।

ওই যা, ভুলে গেছি—বলতে ঘোষাল আবার অবতীর্ণ হলেন। বললেন, ভালো কথা, মিঃ রয়। আসছে শনিবার দমদমায় আমাদের পার্টি—আপনি পায়ের ধুলো দিলে বড়ই বাধিত হবো। বেশী নয়, জন পঁচিশেক মেয়ে আর জন পঁচিশেক পুরুষ। নারীসম্বন্ধে প্রেজুডিশ নেই

তো? আপনার [illegible] একটা ধ'রে নিয়ে যাবেন, সকলেই খুশী হবো।

—তারপর গলা নামিয়ে বললেন, কর্তারা সবাই থাকবেন। চাই কি, কাজটা ওখানেই হয়ে যাবে। ও কি গো নীনাদেবী, লক্ষ্মণের ফল ধ'রে দাঁড়িয়ে কেন পাথর হয়ে?

নীনা মৃদুকণ্ঠে বললে, আমার হাত থেকে ডান গ্লাস নেবেন না।

কেন? কেন? সে কি, ভদ্রমহিলার অফার গ্রহণ করবেন না?

সুধাংশু সহজ হাসিমুখে ও সবিনয়ে বললে, আমি নরেনের বন্ধু, নরেনের হাত দিয়েই নিতে পারি। ওঁর সঙ্গে তো আমার সম্পর্ক নেই, মিঃ ঘোষাল!

হাসিমুখে ঘোষাল বললেন, এখানে চোখ টিপলেই সম্পর্ক…হেঁ হেঁ—গেলাসটা হাত পেতে নিলেই—বুঝলেন না? যাই হোক, এটা কিন্তু নীনার পক্ষে আঘাত হোলো, মিঃ রয়!

না, মিঃ ঘোষাল, আঘাত কিম্বা অপমানের উদ্দেশ্য আমার নয়—তার চেয়ে অনেক বড় অপমান, যদি ওঁর হাত থেকে ওটা নিই।

নতমস্তক নরেনের দিকে তাকিয়ে ঘোষাল সাহেব একবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন অপমানে থর থর করে নীনা কাঁপছে। তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে তিনি বললেন, দুঃখ করো না, মিস গুপ্তা। তুমি তো দেখেছ এ পথে কত ছেলে আসে নিষ্কলঙ্ক স্বভাব নিয়ে। তারপরে আস্তে আস্তে নামে। যখন চলে যায়, চূর্ণবিচূর্ণ আদর্শ আর মনুষ্যত্ব এখানকার পায়ের ধুলোয় উড়ে বেড়ায়। মিঃ রয় বোধ হয় আনকোরা—তাই বিচারবুদ্ধিটা এখনো সতেজ রয়েছে! আশা ছেড়ো না নীনা, সুফল ঠিকই ফলবে। আচ্ছা, নমস্কার মিঃ রয়, ভুলবেন না কিন্তু শনিবারের কথা।…আপনাকে নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

বলতে বলতে ঘোষাল সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে অন্য ফ্ল্যাটের দিকে চলে গেলেন।

সত্য সত্যই এমন অসম্ভ্রম নীনার কোনোদিন ঘটেনি। হাতের গ্লাসটা সে ড্রেসিং টেবলটার উপর রাখলো, তারপর মুখ ফিরিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বললে, নরেনবাবু, এর পরেও কি আশা করেন, আপনার বন্ধুর কাজে আমার সাহায্য পাওয়া যাবে?

অনেকক্ষণ পরে নরেন এবার কথা বললে, সাহায্য যে করবে, এবং যে পাবে—একথাটা তারাই ভালো জানে, মিস গুপ্তা।

অবিচলিত অথচ কোমল কণ্ঠে সুধাংশু বললে, সাহায্য আমি পাবো, এবং আপনার কাছেই পাবো, মিস গুপ্তা!

কোন্ অধিকারে?

সুধাংশু হাসলো। বললে, আপনাকে ছোট করিনি, আপনার ওপর কোনো লোভ নেই—সেই অধিকারে!

গলাটা নীনার আবার কেঁপে উঠলো। বললে, কিন্তু এই অপমানটা?

অপমান নয়, মিস গুপ্তা। আপনি যদি মিষ্টান্ন দিতেন, খুশী হয়ে হাত পেতে নিতুম।

মদটা কি খাদ্য নয়? ভদ্রলোক খায় না?

খায়, জানি। কিন্তু পরস্ত্রীর মর্যাদা যাকে দিতে চাই, তার হাত থেকে ওটা নেবো না। আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে, একথা আপনিও যদি ভোলেন আমি ভুলতে পারবো না। আচ্ছা, আজকে আমি উঠলুম। —এই বলে সুধাংশু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বিবর্ণ মুখে নীনা বললে, কাজের কথা ছাড়া আপনার মনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, এই আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

হাসিমুখে সুধাংশু বললে, এর আগেও তো একদিন আপনি আমাকে

দেখেছেন। [illegible] ভার আপনার হাতেই দিয়ে গেলুম। নরেন, শোনো একবার। আচ্ছা নমস্কার।

সুধাংশু হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সটান বেরিয়ে গেল। নরেন গেল তার পিছনে পিছনে।

মিনিট পাঁচ সাত পরে নরেন আবার ফিরে এলো। দেখলো, টেবলের উপর হেলান দিয়ে নীনা সেই একভাবে দাঁড়িয়ে। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে নরেন সেই পরিত্যক্ত গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ ক'রে দিল। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে বসে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সে সান্ত্বনার ছলে বললে, আজকের আসরটাই মাটি। এ আমি জানতুম। সুন্দরী স্ত্রীর আঁচলের তলায় যে মানুষ, সে ভদ্র সমাজের অযোগ্য। ওটা বরাবরই অমনি। স্ত্রীলোক দেখলেই ওর নীতিবুদ্ধি জেগে ওঠে, ঠিক যেন ইস্কুল মাস্টার! আর কিছু নয়, আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। —শোনো নীনা—

নরেন তার হাতের মুঠোর ভিতর থেকে কয়েকখানা নোট বার করে বললে, আমার মনিব এই পঞ্চাশটে টাকা তোমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছেন তিনি, এই সামান্য টাকা তার ক্ষতিপূরণ। এও বলে গেলেন, কাজটা হয়ে গেলে একহাজার টাকা অবশ্যই তোমাকে তিনি পাঠিয়ে দেবেন!—শোনো নীনা—

নীনা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। আয়নার ভিতর দিয়ে তার মুখের উপর প্রতিফলিত আলোয় দেখা গেল, তার দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে নেমে এসেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে নরেন বললে, কাঁদছো তুমি, নীনা? তুমি তো কাঁদোনি কোনদিন?

নীনা তার কাছে এগিয়ে এলো। বললে, লোকটা কাঁদাতে জানে, তাই কাঁদলুম। কিন্তু আজকে, দোহাই তোমার, আজকে আমাকে ছুটি দাও—বড় ক্লান্ত আমি।

বেশ তো খুব ভালো কথা। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, সুধাংশু সত্যিই তোমাকে অপমান করতে চায়নি। ও-একটা ভ্রান্ত আদর্শবাদী—মানে, পাগল। রাগ ক'রো না ওর ওপর।—এই বলে নরেন উঠে দাঁড়ালো।

নীনা শান্তকণ্ঠে বললে, না, কোনো রাগ আমার নেই, একথা তাঁকে জানাতে পারো।

কিন্তু এই টাকাটা ?

টাকাটা ঘোষালকে দিয়ো। সে বড়লোক, টাকায় তার লোভ বেশী। —এই বলে নীনা ভিতর মহলে চলে গেল। নরেন একবার থমকে দাঁড়ালো, তারপর নিজের মনে বললে, দেবতারাও জানে না তোমাদের স্বভাব, আমি কোন্ ছার !

এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

সুধাংশুদের বাড়ি ভবানীপুরের দক্ষিণ প্রান্তে। বাড়িটা তাদের পৈতৃক। একালের বালীগঞ্জ অথবা টালীগঞ্জ যখন অরণ্যভূমি ছিল, সেই সময় মানকুণ্ডুর রায়েরা এসে প্রায় ছয় বিঘা জমি এখানে দখল করেন। সেই পিতৃপুরুষ এখন আর নেই, সেই অরণ্য অদৃশ্য হয়ে অধুনা নূতন নগর বসেছে, এবং পুরনো ভিটার আশে পাশে বংশ বৃদ্ধির পর্যায়ে পর্যায়ে নতুন-নতুন ঘর-দালান দাঁড়িয়ে উঠেছে। তবে বড় তরফের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে সুধাংশুর ভাগ এ-বাড়িতে সকলের চেয়ে বেশী। একান্নবর্তী পরিবার, বলাই বাহুল্য, এখন আর নেই। তবে আত্মীয়-পরিজন জ্ঞাতি-স্বজন মিলে বাড়িতে মেয়েপুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী।

গত রাত্রে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে সুধাংশু শুনেছিল, আগামী কাল অর্থাৎ আজ তার ছেলের জন্মদিন। বরাবর এই তারিখটা তার মনে থাকে, কিন্তু এবার এই প্রথম ব্যতিক্রম। পদ্মাবতী বললে, তুমি যেন কী

হয়ে গেছে, এ দিনটাও তোমার ভুল হয়? পনেরো বছরে একবারও খেয়াল করোনি?

সুধাংশু ভারি লজ্জা পেয়েছিল।

আজ সকালে উঠে প্রথমেই সে নরেনকে টেলিফোনে জানিয়েছে, যত বড় কাজই থাকুক, আজ সে বাড়ি থেকে এক পাও বেরোবে না। স্টিভেন্স সাহেব যেন আজ অফিস চালায়। বাইরের চিঠি ও চেক্ আজ সই করলেই চলবে; পেমেন্টগুলো আজ বন্ধ থাক, কারণ জরুরী পেমেন্ট আজ একটাও নেই। বাকি কাজ সারাদিন এখান থেকে টেলিফোনেই সারা যাবে। ওই সঙ্গে নরেনকে সে বেলা একটা নাগাত এখানকার ভোজসভায় অতি-অবশ্য আসতে বলে দিল।

জন্মতিথিতে আনন্দ উৎসবটাই বড়। কিন্তু উৎসবটা ছোট আকারে কোনদিন হয়নি, আজও হবে না। বাড়ির উঠানে আটচালা বাঁধা হয়েছে, সেখানে যজ্ঞ হবে। বাড়ির আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধু পরিচিতের সংখ্যা মিলিয়ে অন্তত আড়াই শো লোকের ভোজের আয়োজন হয়েছে। সমস্ত আয়োজনটাই পদ্মাবতীর নির্দেশক্রমে এবং এখানে সুধাংশুর সম্পূর্ণ সহাস্য আত্মসমর্পণ। গত রাত্রে বাড়ি ফিরে সুধাংশু দেখেছে, পূজার আয়োজন, খাদ্যসম্ভারের ব্যবস্থা বাইরের লোকজন মোতায়েন করা, লোক পাঠিয়ে এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ—পদ্মাবতী ইতিমধ্যে কিছুই বাকি রাখেনি। এ-বাড়ির এখানকার বড় বউ সে—তার সামান্য ইচ্ছাও এখানে আদেশের মতো সকলের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এই পরিবারে তার আসন সকলের উঁচুতে।

সকাল বেলা স্নানের পর নূতন একখানা দামী রাঙা-পাড় তসরের শাড়ী পরে হাসিমুখে পদ্মাবতী স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালো। পরিশ্রমের জন্য নয়, স্নানকালে গাত্রমার্জনার জন্যও নয়—তার যৌবনশ্রী উদ্ভাসিত মুখখানি সর্বদাই আরক্তিম। প্রসাধন সামগ্রী কোনোদিন সে স্পর্শ করেনি,

কিন্তু সদ্যোজাত শঙ্খের মতো তার ললাট শ্বেতাভ। পুরুষকে উৎসুক করে তোলবার মতো কোনো ভাষা তার শান্ত ও প্রসন্ন চোখে নেই— মনে হয়, অনেকটা যেন নির্বাক।

স্ত্রীর লাবণ্যচ্ছটা যেন সঙ্গীতের মতো সুধাংশুর চোখে মোহজাল বিস্তার করলো।' সুধাংশু তার সীঁথিমূলে দীপ্ত প্রদীপের মতো সিন্দুর-বিন্দুটির দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে, কিঙ্করের প্রতি কি আদেশ, শুনি?

পদ্মাবতী বললে, বেলা প্রায় নটা। অজিত গেছে ওর ঠাকুমার সঙ্গে কালীঘাটে, এখুনি ফিরবে। তুমি স্নান করে নাও, তোমাকে আশীর্বাদ করতে হবে।

মা গাড়িতে গেছেন তো?

নৈলে কি বুড়ো মানুষ হেঁটে যাবেন? তুমি যাও, স্নান করো। বলে পদ্মাবতী তার সোনার চুড়িপরা সুন্দর ডানহাতখানা তুলে ঘোমটা নামিয়ে ভিতরে চলে গেল। সদ্যবিবাহিতা তন্বীর মতো তার নধর স্বাস্থ্যশ্রী—উপযুক্ত সন্তানের জননীর মতো চেহারাটা তার নয়। বয়সের চিহ্ন কোথাও পড়েনি।

কিন্তু সুধাংশুর চোখের সামনে থেকে ইন্দ্রজালটা সরে গেল। সংযত ও শান্ত হয়ে সে বসলো। স্ত্রীর লাবণ্য-বিলাসের স্রোতে গত উনিশ বছরের একটি দিনও সে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, এমন মনে পড়ে না। এমন মনে পড়ে না, কোনো নিভৃত অবসরে, কোনো চৈত্র-সন্ধ্যায়, বৈশাখী পূর্ণিমায়, শ্রাবণরাত্রির বর্ষণ-মুখর অন্ধ অমাবস্যায়, অথবা চিত্তের ক্ষণিক চাঞ্চল্যের কালেও পদ্মাবতী তার কাছে প্রণয়ের কোনো গদগদ-ভাষা প্রকাশ করেছে। ওটা পদ্মাবতীর জানাও নেই, এবং ওটা কোথাও ঘটে শুনলে সে একটু কৌতুকই বোধ করে—কারণ, ওটা অসভ্যতা, ওটা হাস্যকর। স্বামীকে ভালোবাসা জানাতে হবে, প্রকাশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে হবে, আদর করতে হবে—এটা প্রণয়িনীর

কাজ, ধর্মপত্নীর কাজ নয়। সে শান্ত, অনুগত, আত্মসমাহিত—কারণ সে স্ত্রী! সেই কারণে এ-জীবনের কোন একটি দিনেও সুধাংশুর সঙ্গে তার তর্ক-বচসা বাধেনি। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ছকোয়া জীবনযাত্রায় বিন্দুবৎ অশান্তিও দেখা যায়নি। সম্ভবত, এমন হতে পারে, যে-সমুদ্র যত গভীর, উপরে সে ততই প্রশান্ত। সুধাংশু শুনে এলো দীর্ঘকাল থেকে, তার স্ত্রীর মতো প্রতিমারূপিনী আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব মহলে কোথাও নেই। সত্য বলতে কি, তারও চোখে পড়েনি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। স্ত্রী তার রূপ সম্বন্ধে কোনোদিন সচেতন নয়, সুধাংশু এ নিয়ে স্ত্রীর কাছে কখনও উল্লেখও করেনি। এমন দৃশ্য এই উনিশ বছরে কোনোদিন তার চোখেও পড়েনি, পদ্মাবতী আয়নার ভিতর দিয়ে নিজেকে লক্ষ্য করেছে। চুল বেঁধেছে চিরদিন সে শাশুড়ীর কাছে।

সহসা বাইরে লোকজনের সমাগম দেখে তাঁর চমক ভাঙলো। সুধাংশু উঠে সোজা কলঘরের দিকে চলে গেল। নিজের চিন্তাবৈকল্য অনুভব করে নিজেই সে লজ্জিত হোলো।

পূজামণ্ডপে গৃহদেবতার সামনে পুরোহিত যজ্ঞ করতে বসেছেন, এমন সময় অজিত গাড়ি থেকে নেমে এলো তার ঠাকুমার সঙ্গে। সুকুমার কিশোর অজিতের চেহারাটি অতি সুশ্রী—যেন সুধাংশুরই তরুণ বয়সের ছায়া তার মুখে চোখে মিলিয়ে রয়েছে। যজ্ঞের মাঝখানে এসে ব'সে গৃহদেবতাকে সে প্রণাম করলো। ঠাকুমা আনন্দাশ্রু চোখে নিয়ে একপাশে বসলেন আসন নিয়ে।

আত্মীয় কুটুম্বে, বন্ধুবান্ধবে, এবং প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষে একে একে এবাড়ি ভরে উঠলো। উৎসবটা অনেকখানি মধ্যাহ্নভোজে কেন্দ্রীভূত। সুধাংশুর মা উঠে এলেন, একে একে সকলকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। স্নানের পর ভদ্রব্যক্তিদের নিয়ে সুধাংশুও তার আসর সরগরম করে তুললো। পদ্মাবতী মেয়েদের নিয়ে ভিতর মহলে গেল

আলাদা আসরে। সেখানে মেয়েদের বসিয়ে রেখে আবার সে গেল অন্যত্র। সে যেন অন্য কিছুতে ব্যস্ত।

বেলা এগারোটার পরেই পুরোহিতের যজ্ঞ শেষ হোলো। অজিত তার চারদিকে সমবেত গুরুজনদের পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। তারপর প্রশ্ন করলো, মা কই, ঠাকুমা ?

ঠাকুমা বললেন, এই যে কোথায় গেল! বৌমা, বলি অ' বৌমা, ছেলেকে আশীর্বাদ করে যাও। বৌমা কোথা গেল রে, সুধাংশু ?

সুধাংশু বললে, এইখানেই তো তার থাকা উচিত ছিল, মা। আশীর্বাদ নেবার জন্যে ডাকাডাকি, কই, তার নিজের গরজ তো দেখছিনে ?

সুধাংশুর মুখের রেখায় কিছু কাঠিন্যের সঞ্চার ছিল।

অজিত ডাকলো, মা, মা, শুনছো ? ও মা—

সমবেত মহিলা ও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আশীর্বাদের সময় মা উপস্থিত রইলেন না, এতে ছেলের মনে আঘাত লাগবে যে। কোথায় গেলেন তিনি ?

একটি মেয়ে বললে, আমাদের বসিয়ে রেখে সেই যে তিনি নিরুদ্দেশ হলেন, আর দেখতে পাইনি।

অজিত এসে সুধাংশুর পায়ের ধুলো নিল। সুধাংশু হাসিমুখে জড়িয়ে ধরলো তাকে বুকে। এমন সময় তার কোলের দুটি মেয়ে মল্লিকা আর চম্পা কোথা থেকে দৌড়ে এলো। ছয় বছরের মল্লিকা এগিয়ে গিয়ে তার দাদার পায়ের ধুলো নিতেই অজিত তার বলিষ্ঠ দুই হাতে দুই ভগ্নীকে কোলে তুলে নিল।

আশীর্বাদ ও শান্তিজলের পরে ঠাকুমা তাঁর নাতি ও নাতনীদের নিয়ে ভিতরে গেলেন খাওয়াবার জন্য।

সুধাংশু গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছিল, একটি মেয়ে ভিড়ের

ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, সুধাংশুদা, আপনার শাশুড়ী এসেছেন যে। বৌদিদিকে নিয়ে তিনি গেছেন তেতলার ঘরে।

ও, তাই নাকি।—বলে সুধাংশু থমকে দাঁড়ালো। খবরটা জানিয়ে মেয়েটি চলে গেল আটচালার লোকসমারোহের দিকে।

শাশুড়ী এসেছেন এ সংবাদটি তার কাছে যথেষ্ট উৎসাহজনক বলে মনে হোলো না। তাদের সকল শুভকাজেই এবাড়িতে তার শাশুড়ীর নিয়মিত আনাগোনা আছে। তিনি নিজের গরজেই আসেন এবং অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই আসেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্কোচ অথবা আড়ষ্টতার বালাই মাত্র নেই। পুরনো জামাই বাড়ির সর্বপ্রকার কাজকর্মে কাক-মুখে খবর পেয়েই তিনি ছুটতে ছুটতে আসেন। কিন্তু আজকে সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি একটু বিরক্ত হয়েই সে যখন গা ঢাকা দেবার জন্য বাইরের দিকে গিয়ে দাঁড়ালো, সেই সময় একটি ছেলে পিছন থেকে এসে বললে, মামাবাবু, মামীমার মা আপনাকে শিগগির ডাকছেন। একবার যান।

সুধাংশুর তখন আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হোলো না। অনেকটা যেন সকলের চোখ এড়িয়ে সে ভিতর মহলে ঢুকে উপরের সিঁড়িতে উঠতে লাগলো।

তেতলার কোণের ঘরটা সাধারণত নিরিবিলি থাকে। এটা সুধাংশুর পড়ার ঘর। এ ছাড়া কাজ কারবারের জরুরী দরকারে তার অর্থনৈতিক পরামর্শদাতারা এই ঘরে এসে তার সঙ্গে গোপনীয় আলাপ-আলোচনা করে। এ ঘরের নানাবিধ কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের মাঝখানে পরিবারের দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আনাগোনা করে, ওটা তার পছন্দ নয়।

সুধাংশু পর্দার কাছে দাঁড়াতেই পদ্মাবতী একটু ঘোমটা টেনে সরে বসলো। এপাশে বিছানাটা দখল করে শাশুড়ী তখন কন্যাকে বসিয়ে

অজস্র, অশ্রান্ত ও অন্তরান্তর আলাপে ঘরখানা মুখর করে রেখেছিলেন জামাই এসে দাঁড়াতেই সজাগ হলেন।

—এসেছ বাবা, এসো এসো; সোনার চাঁদ এসো। কত অহঙ্কার করি তোমায় নিয়ে, কত লোকের মুখে শুনি তোমার সুখ্যাতি। এমন জামাই আমাদের বংশে নেই!

সুধাংশুর মনে প'ড়ে গেল, হাবড়া হাটে যখন সে টুকরো কাপড়ের ছোট দোকান দিয়েছিল, এই শাশুড়ী ঠাকরুন সেদিন জামাতার অধঃপতনে অপমানজনক উক্তি করে বছর দুই এ-বাড়ির ছায়া মাড়াননি সে পনের বছর হোল।

সুধাংশু সংযত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, নীচে মা রয়েছেন, মেয়ের অনেকে এসেছেন, আপনি সেখানে গিয়ে বসতে পারতেন!

শাশুড়ী উঠে বসে বললেন, আর বাবা, সেদিন কি আছে? ভিড়ের মধ্যে গেলেই এখন মাথা ধরে, বুক ধড়ফড় করে। এতখানি পথ এলুম হাঁটতে হাঁটতে—রিক্সাও পেলুম না, মটর-বাসও ছিল না। একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছি। ভয় নেই বাবা—ব'লে তিনি হাসলেন, তোমার মান সম্ভ্রম কি আমি নষ্ট করতে পারি? এসে ঢুকেছি খিড়কি দিয়ে—কেউ দেখেনি, চুপ করে এসে উঠেছি তেতলায়। হ্যাঁ বাবা, বলছিলাম কি, এ বাজারে এত লোক ডেকে এত টাকা নষ্ট করে এমন ভূত ভোজন করাচ্ছ কেন? তুমি জানো তোমার পাশে কেউ দাঁড়াবার নেই!

সুধাংশু বললে, ছেলের জন্মদিন—এতে অপব্যয় করেও তো আনন্দ পাওয়া যায়। তা ছাড়া এসব ওই, ওঁরই আয়োজন—আমি কেবল উপস্থিত থাকি মাত্র।

উত্তেজিত হয়ে শাশুড়ী বললেন, গাধা, বোকা মেয়ে আমার! আজো পয়সা চিনলো না, আজও আপন-পর কে তা জানলো না। ছেলের জন্মদিন! আমারও তো শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে দশ—এগারোটি

হয়েছে—কই, একটার জন্মতারিখও তো আমার মনে নেই! এছাড়াও দুটো নষ্ট হল, একটা মরে গেল—কি করব, ভগবান নিলেন! তাই বলে জন্মতিথিকে বিয়েবাড়ি করে তোলা—এমন তো শুনিনি!—নে মা, ঘোমটা সরিয়ে দে। বিশ বছর হোল বিয়ে হয়েছে—এত লজ্জা কিসের? এত ঘোমটা দিলে মাথার রোগ হয়।

অলক্ষ্যে পদ্মাবতী দেখলো, স্বামী নতমুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে নিজে তার জন্য কিছুমাত্র উদ্বেগ বোধ করলো না। কোনো ব্যাপারে উদ্বেগ তার জীবনেও দেখা যায়না।

কিন্তু শাশুড়ীর সমস্ত কথার উপর দিয়ে সহসা সুধাংশু বললে, তুমি এখানে বসে আছ, অজিত তোমাকে খুঁজছিল আশীর্বাদ নেবার জন্যে।

পদ্মাবতীর হয়ে শাশুড়ী জবাব দিলেন। উচ্চ কলকণ্ঠে হেসে তিনি বললেন, বাবা সুধা, তুমিও ওদের সঙ্গে ছেলেমানুষ হলে? ছেলেকে আশীর্বাদ করবে মা ঢাক বাজিয়ে, লোক দেখিয়ে? কথাটা শুনলেও হাসি পায়। হ্যাঁ, ডাকছিল বটে অজিত নীচের থেকে, আমিই পদ্মাকে যেতে দিইনি। বলি, বোস তুই চুপ ক'রে, ঘটা ক'রে আর আশীর্বাদ করতে হবেনা। আশীর্বাদ করুন বেয়ান ঠাকরুণ, করুক আর পাঁচজন যারা পাবে-থোবে। করুক দেখি অজিতের আজ একটা অসুখ-বিসুখ, ক'জন তোমার পরিজন এসে বুক দিয়ে পড়ে, দেখি তো বাবাজি—?

দীর্ঘ প্রায় বিশ বৎসর কাল এই শাশুড়ীকে সুধাংশু লক্ষ্য ক'রে এসেছে, আজও সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শাশুড়ী অলক্ষ্যে তাঁর কন্যার গায়ে একটা ইঙ্গিতাত্মক চিপ দিয়ে সহসা হেসে বললেন, ভারি ট্যাক ট্যাক ক'রে সত্যি কথা বলি, না বাবাজি? ওই আমার রোগ—

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, এইত বাবা, তুমি নিজের থেকে

একটা খবরও পাঠাওনি? তোমার শ্বশুরের বাত বেড়েছে, তবু এলুম মরতে মরতে। জামাইয়ের দোষ-ত্রুটি ধরতে নেই, তাই থাকতেও পারলুম না। না বাবা—এমন কাজ আর কোরোনা, বাজে টাকাকড়ি আর কখনো উড়িও না।—হ্যাঁ লা, শো'না একটু, সেই তোর রাত থেকে খেটে খেটে হয়রাণ হলি—এত বেলা অবধি মুখে একটু জলও পড়েনি। বাবাজি, তুমি নীচে গিয়ে চারটি জলখাবার ওপরে পাঠিয়ে দাওগে। আমিও এখানেই আহ্নিকটে সেরে নিই।

সুধাংশু নতমুখে মুখ ফিরিয়ে যখন পা বাড়ালো, তখন গলা বাড়িয়ে শাশুড়ী পুনরায় বললেন, বেয়ানকে বোলো বাবা, যাবার সময় নমস্কার জানিয়ে যাবো।

নিশ্বাস ফেলে সুধাংশু নীচে নেমে গেল। শাশুড়ী তা'র পথের দিকে একবার গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে প্রবলভাবে তাঁর একটা চোখ কুঁচকিয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে হাসলেন—অর্থাৎ, বাছাধনকে কেমন ঠুকে দিলুম, দেখলি তো?

পদ্মাবতী কোনো জবাব দিল না, কেবল মুখ ফিরিয়ে রইলো।

সুরবালা একবার সন্দেহক্রমে তা'র দিকে তাকালেন। তারপর ভুরু কুঁচকিয়ে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে পদ্মা—?

পদ্মাবতী তাঁর দিকে তাকালো। সুরবালা বললেন, যা জিজ্ঞেস করবো সত্যি বলবি। সুধাংশু আজকাল অন্যমনস্ক, কেন বল্ দিকি? ছেলের কানে বীজমন্তর দিয়ে তোর শাশুড়ী মাগি বোধ হয় আমাদের পর করতে চায়—কেমন? তোমার ওই লজ্জিত ছেলেটিও দিদিমা-দাদামশায়ের কাছ ঘেঁষতে চায় না, দেখছো তো? মাঝখুড়ুর রায়বংশের রক্ত—পেটের ছেলেকেও বিশ্বাস ক'রো না মা। হ্যাঁ, আর এক কথা সুধাংশু আজকাল এত রাত্ত ক'রে বাড়ি ফেরে কেন, শুনি? খাঁ করেছিস কিছু?

পদ্মাবতী সবিস্ময়ে বললে, কই, না! অনেক কাজকর্ম, তাই ফিরতে রাত হয়।

হুঁ—সুরবালা বললে, কিন্তু আমি অত সহজে পুরুষ ছেলেকে বিশ্বাস করিনে, পদ্মা—তারপর গলা নামিয়ে পদ্মাবতীর কানে কানে তিনি বললেন, তোর জ্যাঠার ছেলে তিনকড়ি আজকাল একটা গাঁজার দোকান নিয়েছে, জানিস তো? সে গিয়েছিল লাইসেন্ করতে আপিস-পাড়ায়। হঠাৎ চোখ পড়েছে তার, একটা মেম-ছুঁড়ি আলাপ করছে সুধাংশুর সঙ্গে গা ঢলিয়ে। খবরটা শুনে আর আমার অন্নজল পেটে যায় না, মা।

পদ্মাবতী স্পষ্টকণ্ঠে বললে, এসব তো ওর নেই মা?

বিরক্ত হয়ে সুরবালা বললেন, আ মর আবাগি! নেই বললেই কি থাকেনা কোনোদিন? বুড়ো হ'তে চললি, আজও এতটুকু জ্ঞানগম্যি হোলো না তোর? আজ বিলিতি মেয়ে, কাল দিশি মেয়ে হ'তে কতক্ষণ? আরো অনেক খবর আমি পাই, মরতে সুড়সুড় ক'রে সব আমারই কানে এসে ঢোকে।

আর কি খবর, মা?

সে সব খবর তোর কানে তুলে তো আর এ-বাড়িতে আগুন জ্বালাতে পারিনে!—বলি এই বাড়িতেই বা কে না জানে শুনি?

এ বাড়িতে? পদ্মাবতী অবাক হয়ে তাকালো—কী বলছ তুমি মা?

সুরবালা বললেন, আকাশ থেকে পড়লি, কেমন? তোর শাশুড়ী শোনেনি?—ছেলের কলঙ্কটা গিলে ব'সে আছে, বুঝিসনে? তোর খুড়শাশুড়ীদের ওদিকে এ নিয়ে কত কানাকানি চলছে, জানিস্?

পদ্মাবতী স্তব্ধ হয়ে তা'র মায়ের দিকে তাকিয়েছিল।

সুরবালা তাঁর গোয়েন্দাসুলভ মুখভঙ্গীর অভিনয়ের দ্বারা পুনরায় ফিসফিস ক'রে বললেন, তোর মামাশ্বশুরের ভায়রাভাই তো থাকে আমাদের

ঘরে। আগামী শনিবারের গার্ডেন-পার্টির আলোচনা এবং বাজারদর নিয়ে সুধাংশুর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে সে এক সময়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সিঁড়ি দিয়ে সে তাড়াতাড়ি নীচে নামবে, ঠিক সেই সময় মাঝপথের বাঁকে দেখা হয়ে গেল পদ্মাবতীর সঙ্গে। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে নরেন বললে, নমস্কার বৌদিদি, আপনার দর্শন না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছিলুম, অনেক ভাগ্যে দেখা হয়ে গেল।

মাথার ঘোমটা টেনে পদ্মাবতী বললে, উনি ছিলেন আপনাদের তদ্বিরে, তাই নিশ্চিন্ত ছিলুম। আমার মা এসেছেন কিনা তাই একটু ব্যস্ত আছি।

নরেন বললে, আপনি আমার মনিবের স্ত্রী—সুধাংশু আমার চেয়ে বয়সেও দুএক বছরের বড়—সুতরাং আপনার পায়ের ধূলো নিলেও আমার মান হারাবার ভয় নেই। কেবল এই কথাই বলতে পারি, পায়ে রাখবেন অনুগ্রহ করে। আচ্ছা, এখন আসি।—এই বলে সিঁড়ি দিয়ে সে নামতে লাগলো।

উপরের সিঁড়ি থেকে হঠাৎ পদ্মাবতী ডাকলো, ঠাকুরপো?

মুখ উঁচু করে নরেন বললে, কি বৌদিদি?

একটু থতিয়ে পদ্মাবতী ঢোক গিললে। তারপর গলা পরিষ্কার করে—অথচ সাহসের সঙ্গে সে প্রশ্ন করলো, মানুষের জীবনে বিশ্বাসের কি কোনো দাম নেই, ঠাকুরপো?

সবিস্ময়ে নরেন তার দিকে তাকালো। এমন গলার আওয়াজ, এমন সহজ ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন, এবং তার দুচোখের আড়ালে এমন বিক্ষোভের সঙ্কেত—এ যেন পদ্মাবতীর পক্ষে অভিনব। বিস্ময়করও বটে।

একটা সিঁড়ির উপর পা তুলে নরেন থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললে, আজ হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন, বৌদিদি?

পদ্মাবতী বললে, পুরুষ মানুষের বাইরের জীবনটা আমাদের জানা নেই, জানা সম্ভবও নয়। কিন্তু চোখের আড়ালে গিয়ে যদি তারা আত্মসম্মান খোয়ায়, তবে সেই ভয়ানক ক্ষতিতো আমাদের নয়, তাদের।

নরেন যেন হকচকিয়ে গেল। এমন মন্তব্যের সূত্রটা সহজে খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু তবু কেমন একটা অপরাধের ছায়া তার মুখের উপর ভেসে উঠলো। সে বললে, সেত বটেই বৌদিদি, কিন্তু আমি তো আপনার কথা ধরতে পারছিনে ?

পদ্মাবতীর মুখের উপরকার লাবণ্য ভিতরের চাপা উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে এলো। বললে, আপনি তো জানেন, এবাড়িতে আজো কারো চরিত্রের অপবাদ কিম্বা বাইরের পাপ এসে ঢোকেনি। এখন থেকে যদি তার বিপরীত কিছু ঘটে, এ-পরিবার কি সেই আঘাত সইতে পারবে ?

হঠাৎ নরেন হেসে উঠলো। বললে, ভাগ্যি আপনার কথার কিছু ধরাছোঁওয়া নেই, তাই রক্ষে। বাড়ি ফিরে অবিশ্যি আপনার কথাটা ওজন করে বিচার করবো। বুঝতে চেষ্টা পাবো, এর আসল সূত্রটা কি! তবে একটা কথা বলতে পারি বৌদিদি, বিয়ে করিনি বলেই যে বুড়ো হইনি তা নয়! বয়স অনেক হোয়েছে। ব্যবসায়ী লোক আমরা, হিসেববুদ্ধিটা প্রবল। অপবাদ অথবা লোকনিন্দা যে-বয়সে ছেঁকে ধরে, অনেক দুঃখ পেয়ে সেই বয়সটা পেরিয়ে এসেছি। আমাদের নৌকো আর অকূলে ভাসবেনা, দেওরের মুখের একথাটা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। আচ্ছা, আসি বৌদিদি।

একটা নমস্কার জানিয়ে নরেন বেরিয়ে চলে গেল। সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মুখে পদ্মাবতী একবার তার পথের দিকে তাকালো, তারপর স্মিতহাস্যে উপরের দিকে উঠে গেল।

স্ত্রীর পায়ের শব্দ পেয়ে সুধাংশু কিছু বলবার জন্য তার ঘর থেকে

বেরিয়ে এলো, কিন্তু পদ্মাবতী ততক্ষণ তেতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেছে। যত বড় প্রয়োজনই তার থাকুক, আজকে পদ্মাবতীর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা হওয়া কঠিন, একথা সে জানে। এবাড়িতে সুরবালার আবির্ভাব ঘটলে পদ্মাবতীর রূপান্তর ঘটে, এ-দৃশ্য সুধাংশু দেখে এসেছে সুদীর্ঘকাল। অন্তত তিনটি দিন পদ্মাবতীর মনটা থাকে মেঘাচ্ছন্ন, এবং সেই আবরণে এমন কোনো ফাঁক থাকেনা—যার ভিতর দিয়ে আলোকের দীপ্তি দেখা যায়। সমস্ত বাড়ির বাতাসটা এমন একটা রহস্যজনক কানাকানিতে থমথম করে যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও ক্লেশকর মনে হয়। সংশয়, অবিশ্বাস, সত্যমিথ্যার জটিল চক্রান্ত, পারিবারিক মনের উপর প্রক্ষিপ্ত একটা কৃত্রিম গ্লানির প্রলেপ—সমস্তটা মিলে সুধাংশুকে ক্লান্ত করে তোলে। এমন অনেকদিন গেছে, সুরবালা এবাড়িতে এসে রাত্রিবাস করেছেন পদ্মাবতীকে কাছে নিয়ে, এবং পদ্মাবতী সারাদিন রাত্রির মধ্যে তার স্বামীপুত্রকন্যা ও শাশুড়ীর কোনো খবরই রাখেনি। এমন দেখা গেছে, ছেলে ও মেয়েরা মাকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে, সুধাংশুর মা বার বার এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখে চুপ করে চলে গেছেন—এবং সুধাংশু নিজে তার জাগরণক্লান্ত দুই চক্ষু নিয়ে বাইরের শূন্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করেছে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এ নিয়ে অভিমান কোনোদিন করেনি। আবার দেখতে দেখতে সেই মেঘ কেটে গেছে। আকাশ মুখর করে আলোর ধারা ছুটেছে, স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে সুধাংশু আবার ফিরে এসেছে।

কিন্তু একটা কথা সুধাংশুর তরফ থেকে এখানে পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। বাসনার রঙে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কটা যতদিন থাকে রঙীন, ততদিন উভয়পক্ষের দাবীটা ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধ। ক্রমে ফেনোচ্ছলতার প্রাবল্য যায় কমে—আসে নিস্তরঙ্গ প্রসন্নতা, দাবী তখন হয়ে ওঠে গভীর। উভয়পক্ষে ভাবের স্থিতি ঘটে, তাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকলেও

বিরহবোধটা উপরিভাগে পরিস্ফুট নয়। স্বামীর পক্ষে সকলের ব
পাওয়া হোলো মন, সুধাংশু তা পেয়েছে। সেই মনের আত্মপ্রকাশ
প্রত্যক্ষ নয় বটে, কিন্তু পুরুষের তৃতীয় নয়ন কোথাও ভুল করেনি
নারীর রূপের কথাটা এখানে সহজে এসে পড়ে। এখানেও সুধাংশু
পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দটা অনেকের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। পদ্মাবতী
দেহলাবণ্যের অতিক্রান্ত সৌন্দর্য এক এক সময়ে লক্ষ্য করে তার ম
সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসতো। সে বিশ্বাস করতো, সর্বশ্রে
পাওয়া সে পেয়ে গেছে এ জীবনে, এর বাইরে কোথাও কি
নেই। তরুণ বয়সে একদা তার পুরুষের প্রাণ যে বাঁধনহারা আনন্দে
পরিপ্লাবিত হয়েছিল, আজ আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় দাঁড়িয়ে তা
সেই নিগূঢ় তৃপ্তিবোধ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। পুরুষের জীবনে এর
একাগ্রতা দুর্লভ সন্দেহ নেই, কিন্তু শান্ত ও সংযত সুধাংশুর পক্ষে এ
স্বাভাবিক।

নীচের থেকে একটা সাড়া পেয়ে তার চমক ভাঙলো। অজি
একবার তাকে ডাকছে।

সুধাংশু তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো। উঠানে দাঁড়িয়ে অজি
বললে, বাবা, ম্যারাপের টাকা আপনি দেবেন বলেছিলেন, সেই লোক
এসেছে। পঁচাত্তর টাকা চায়।

সুধাংশু বললে, তোমার মার কাছে টাকা আছে, এনে দাও।

অজিত কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। বোঝা গেল, মায়ে
কাছে যাওয়াটায় তার আপত্তি। সুরবালা আছেন সেখানে, তাঁ
সান্নিধ্যে যাওয়া যেন ছেলেমেয়েদের পক্ষে তেমন পছন্দ নয়। সুধাং
ছেলের মনের চেহারা আন্দাজ করে তখনই বললে, ওহো, ভুলে গেছি
ওপরে আমার বাক্সে টাকা আছে, এনে দাও। খোলাই আছে বাক্সটা—

অজিত খুশী হয়ে চলে গেল।

পদ্মাবতী হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। সুরবালা বললেন, পেন্নাম থাক্ মা এখন তাড়াতাড়ির সময়।—এই বলে কন্যার চিবুক নেড়ে তিনি তরতর করে নেমে গেলেন।

সুধাংশু একবার মাথা তুলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

রাস্তার ফটকের কাছ পর্যন্ত গিয়ে সুরবালা একবার ফিরে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, ওই যা, ভুল হয়ে গেল। ওরে ওই অজিত, তোর ঠাকুমাকে আমার নমস্কার জানাস ভাই। বলিস, আর একদিন এসে আবার দেখা করবো।

অজিত কথা বললে না। কিন্তু পাশ থেকে মল্লিকা বলে উঠলো, রোজই তো আপনি এই কথা বলে পালিয়ে যান্ দিদিমা।

কী ডেঁপো মেয়ে বাবা তুমি! হবেই তো, যেমন ঠাকুমা, তেমনি নাৎনী!—বলে সুরবালা ফটক পার হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার পরে বৃষ্টি এলো। জানালার বাইরে বর্ষামুখর মেঘময় শূন্যলোকের দিকে চেয়ে সুধাংশু স্তব্ধ হয়ে ব'সেছিল। একটু আগে চাকর এসে চা দিয়ে গেছে, চা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার আলো দিয়ে লক্ষ্মীকে প্রণাম ক'রে পদ্মাবতী এলো তার ঘরে। মুখে চোখে তার অপরিসীম নির্লিপ্ততার ছায়া—এই ঘরদুয়ার, আসবাবপত্র, ওই স্বামী—এসব থেকে তার মন যেন অনেক দূরে। ঘরে এসে টেবলটা সে গোছালো, এলোমেলো কয়েকটা জামাকাপড় গুছিয়ে সে আনলায় তুলে রাখলো। টানা থেকে একবার চিরুণী বার করে মাথার চুলের রাশি আঁচড়ে এলো খোঁপা বেঁধে নিল।

ওকি, চা খাওনি তুমি?

সুধাংশু মুখ ফেরালো। হেসে বললে, চিরকাল পরের হাতেই খেয়ে এলুম, আজ মনে করছি তুমি হাতে করে না দিলে চা খাবো না।

পদ্মাবতী বললে, খুব পাগলামি শিখেছ আজকাল। ওরে, শ্রীমন্ত— ব'লে সে দরজায় এসে চাকরকে ডাক দিল।

শ্রীমন্ত এলো। পদ্মাবতী বললে, আর এক পেয়ালা চা নিয়ে আয় বাবা, ওটা জুড়িয়ে গেছে। নিয়ে যা।

শ্রীমন্ত পেয়ালাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সুধাংশু বললে, চা না হয় আনতে গেল। কিন্তু একথা তো বললেনা, শুধু মুখে চা খাওয়া উচিৎ কিনা?

টানার মধ্যে চিরুণীখানা রেখে পদ্মাবতী সহাস্যমুখে বললে, সে আবার কি? ক্ষিদে পেলে তুমি তো নিজেই চেয়ে খাবে—আমি জিজ্ঞেস করব কেন?

সুধাংশুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। হঠাৎ একটা অপ্রিয় কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। বললে, বিশ বছরের মধ্যে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছ, আমার ক্ষিধে পেয়েছে কিনা?

পদ্মাবতী একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললে, ছেলেপুলে নিয়ে, ঘরকন্না নিয়ে কত ব্যস্ত থাকি, তুমি বুঝি দেখতে পাওনা?

সুধাংশু অল্প একটু হাসলো। বললে, ব্যস্ত! দুটো চাকর, দুটো ঝি, একজন রাঁধুনি বামুন—এ ছাড়া দারোয়ান আছে, দুখানা গাড়ির দুজন ড্রাইভার আছে, বাজার সরকার আছে—এবং সংসারের সকলের মাথার ওপর আছেন মা। তুমি কি খুবই ব্যস্ত, বড়বউ?

সুরবালার কোনো কোনো মন্তব্য বায়ুতরঙ্গে পদ্মাবতীর চারিদিকে যেন ঘুরে বেড়িয়ে গেল। সে বললে, আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো?

সুধাংশু সটান তার মুখের দিকে তাকালো। বললে, যদি কিছু হয়েই থাকে, শোনবার সময় তো তোমার নেই—তুমি ব্যস্ত মানুষ!

পদ্মাবতী কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপর বললে, বাইরের

কাজকর্ম ছাড়া তুমি থাকতে পারোনা আমি জানি। বাড়িতে থাকলে তোমার মেজাজ ভালো থাকেনা।

কে বললে তোমাকে?—সুধাংশু মুখ ফেরালো—কাজকর্ম করে এলুম বাল্যকাল থেকে, ভাগ্য ফেরাবার আগে বিশ্রাম কোনদিন করিনি। তোমার চোখের ওপরেই আমার যা কিছু উন্নতি,—একটু বিশ্রামের লোভ কি আমার নেই বলতে চাও?

স্বামীর সন্দেহজনক ভাবান্তর লক্ষ্য করে পদ্মাবতী তার আয়ত দুই সুন্দর চক্ষু বাইরের বর্ষার দিকে ফিরিয়ে চুপ করে রইলো।

নিজের কণ্ঠস্বরকে সুধাংশু সংযত করে নিল। উত্তেজনাটা এসে পড়েছিল ওষ্ঠপ্রান্তে, কিন্তু সে সচেতন হয়ে গেল। শান্ত কণ্ঠে বললে, এটা তোমার ভুল, বড়বউ! যেখানে তোমার মতন স্ত্রী, যেখানে আমার সোনার ছেলে মেয়েরা—সেখানে আমার মন-মেজাজ ভালো থাকেনা, এ ধারণা ভুল। এ আমার আনন্দের মন্দির!

শ্রীমন্ত চা নিয়ে এলো। পেয়ালাটা তার হাত থেকে নিয়ে পদ্মাবতী স্বামীর হাতে দিল। বললে, আমি যদি ভুল করে থাকি, সে-ভুল তুমি ভেঙে দাওনি কেন?

সুধাংশু সস্নেহ হাসিমুখে বললে, কথাটা ঠিক হোলোনা তোমার, বড়বউ। উনিশ কুড়ি বছরেও তুমি যদি আমাকে বুঝতে না পেরে থাকো, তবে নিজের কপাল মন্দ বলেই চুপ করে যাবো।—এই বলে সে চায়ের বাটিতে চুমুক দিল।

আমি তোমাকে চিনতে পারিনি বলছ?

হ্যাঁ—সুধাংশু বললে, রাগ করোনা বড়বউ—আমার মনের মধ্যে আজো তোমার চোখ পড়েনি!

পদ্মাবতী বললে, কেমন করে জানলে?

সুধাংশু বললে, আজ নতুন জানিনি। জেনেছি অনেক বছর আগে থেকে।

মানে ?

মানে—তুমি আমাকে কোনোদিন বিশ্বাস করোনি।

কম্পিত কণ্ঠে নিশ্বাস রোধ করে পদ্মাবতী বললে, হিন্দুর মেয়ে হয়ে স্বামীকে বিশ্বাস করিনে? তবে কোন্ খুঁটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছি?

গলার মধ্যে সুধাংশুর কি যেন জড়িয়ে আসছিল। কণ্ঠ পরিষ্কার করে সে বললে, বলতে পারিনে, তবে একথা বলতে পারি, আমাকে বিশ্বাস করোনি বলেই আজো আমাকে তুমি চিনতে পারোনি।

পদ্মাবতীর দুইটা চোখ সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। মৃদু কণ্ঠে কেবল বললে, তা হবে!—এবং সুরবালার কয়েকটি কথা স্মরণ করে তখনই পুনরায় যোগ করে দিল, মানুষের সবটা তো চেনা যায়না!

চায়ের বাটিতে একবার চুমুক দিয়ে সুধাংশু একটু হাসবার চেষ্টা করলো। বললে, মানুষ তো সামান্য, বিশ্বাস থাকলে ভগবানকেও জানা যায়, বড়বউ।

পদ্মাবতী মুখ তুলে তা'র দিকে তাকালো। শান্তকণ্ঠে সুধাংশু পুনরায় বললে, তোমার তিরিশ বছর বয়স হোতে চললো, এখন ভালোবাসার কথাটা তোমার কানে হয়ত ছেলেমানুষি শোনাবে। কিন্তু মনের মধ্যে ওই কথাটাই ঘুরে ফিরে আসে, বড়বউ। একথা জানা দরকার বিশ্বাস যেখানে নেই, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা সেখানে দুর্বল—চরিত্রের সততা আর সাধুতা সেখানে সবই ফাঁকি। তোমার কাছে আমার কোনো ফাঁকি নেই, কারণ তুমি স্ত্রী। তাইতো যা কিছু সব দাবী তোমারই কাছে!—এই ব'লে হাত বাড়িয়ে সে সুইচ টিপে আলোটা জেলে দিল।

পদ্মাবতী বললে, আমি কি তোমাকে ফাঁকিই দিয়ে এসেছি?

সুধাংশু বললে, যদি বলি, একটা বিষয়ে পনেরো বছর ধরে আমি তোমার বিশ্বাসের যোগ্য হয়ে উঠিনি ?

উদ্বিগ্ন হয়ে পদ্মাবতী বললে, কোন্ বিষয়ে ?

শুনলে আঘাত পাবে না ?

আঘাত কোনোদিন তুমি দাওনি, আজ দাও। অশান্তির চেয়ে আঘাত বরং ভালো।

তাহলে শোনো—সুধাংশু বললে, তোমার স্বামীর কল্যাণ-কামনার নামে যারা আত্মীয়মহলে অপবাদ রটিয়ে বেড়ায়, তাদের তুমি আজো চিনতে পারোনি। ভদ্রমনকে যারা নিন্দার চক্রান্তে বিষাক্ত করে তোলে, তা'রা তোমার বন্ধু নয়। স্বামীস্ত্রীর ভালোবাসার বাঁধনের মূলকে যারা ক্ষইয়ে দেয়, তারা যত বড় আত্মীয়ই হোক, তারা শত্রু।

বিবর্ণ মুখে পদ্মাবতী বললে, কে তারা ? কা'দের কথা বলছ ?

সুধাংশু বললে, তাদের কথা বলছি, যাদের কাছ থেকে আমার মা পদে পদে অপমান সহ্য করেন, যাদের কাছে আমার ছেলেমেয়েরা অবজ্ঞার পাত্র, যাদের কাছে আমার টাকার থলিটা ছাড়া আমার সবই নিন্দার যোগ্য, এবং—

পদ্মাবতী এবার স্তব্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাকিয়েছিল।

সুধাংশু হেসে পুনরায় বললে, যাদের অসৎ সংসর্গের প্রভাবে প'ড়ে তুমি কোনোদিন স্বামীর ভালোবাসার সত্যকার দাম দিতে শিখলেনা—এতটুকু সেবা কোনদিন ক'রলে না। আমাকে ভুল বুঝোনা বড় বউ, সেবার জন্যে আমি লালায়িত নই। কিন্তু তোমার ধর্মে যারা বাধা ঘটিয়েছে, তাদের কথাই আমি বলছি।

টেবলের কাছ থেকে স'রে পদ্মাবতী জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মুখে চোখে তা'র কঠোর প্রতিবাদের ছায়া ভেসে উঠেছিল। আর কিছু তা'র কাছে দুর্বোধ্য নেই।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুধাংশু ডাকলো, বড় বউ? শোনো—

পদ্মাবতী সাড়া দিল না।

সুধাংশু পুনরায় বললে, পনেরো বছর ধ'রে তোমার মা-বাবার আচরণে আমি ব্যথা পাচ্ছি, সেটা প্রকাশ করা কি অন্যায় হয়েছে?

পদ্মাবতী মুখ ফেরালো। বললে, কিন্তু আমার মুখের ওপর মা-বাবাকে তুমি অপমান করবে, আর আমি বরদাস্ত করবো, বলতে চাও?

কিন্তু তাঁদের জন্যে আমার স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতে চুরি-জোচ্চুরির অপবাদ সইবে, তাও তো আমি বরদাস্ত করতে পারিনে, বড়বউ!

চুরি-জোচ্চুরি! স্বামীর প্রতি বড় বড় চোখ মেলে পদ্মাবতী তাকালো।

সুধাংশু বললে, কোনোদিন প্রকাশ করবো না মনে করেছিলুম। কিন্তু আজ সংযম হারাতে হোলো। টাকা আমি অনেক রোজগার করেছি। তুমি যা খুশি খরচ করতে পারো, যা খুশি দান করতে পারো। সবই তোমার। কিন্তু আজ বিকেলে অজিতের সামনে, মায়ের সামনে তোমাকে যেভাবে অপমানিত হ'তে দেখলুম, তা'তে আমার মাথাটাও মায়ের কাছে হেঁট হয়ে গেল। টাকা বড় নয়, কিন্তু তা'র জন্যে তোমাকে ছোট হ'তে দেখলে আমার সর্বনাশ ঘটে যায়।

মাথা উঁচু ক'রে পদ্মাবতী বললে, তুমি যত বড় ব্যবসায়ীই হওনা কেন, তুমি সেই হাবড়া হাটের পুরনো দোকানদার। লুকিয়ে গরীব মা-বাপকে কিছু-কিছু সাহায্য করি—এ খবর তুমি জানো ব'লেই এতকাল জানাইনি।—হ্যাঁ, লুকিয়েই করি, পাছে বড়লোকদের কাছে গরীবের সম্ভ্রমহানি ঘটে। আজো টাকা দিয়েছি, স্বীকার করতে লজ্জা পাবো না। কিন্তু যত বড় তুমি হও, যত ভালো কথাই তুমি বলো—টাকার জন্যে তোমার জ্বালা ধরেছে, একথা জানলে তোমার টাকা ছুঁতাম না। আমি ক্ষমা চাইছি।

বড় বউ—?

থাক্—বুঝতে পেরেছি!—পদ্মাবতী উষ্ণ চঞ্চল কণ্ঠে বললে, ভাঁড়ার ঘরে ব'সে মায়ে-বেটায় আমার চুরি-জোচ্চুরি নিয়ে কানাকানি করছ— শ্বশুরবাড়ির ইতিহাসে এটা নতুন নয়। আমার মা-বাবাকে তোমরা সবাই মিলে অপমান করবে, আর আমি তোমার গলা জড়িয়ে ভালোবাসতে বসবো—এই তুমি আশা করো?

কী বলছ তুমি, বড়বউ?

আমাকে আর ঘাঁটিয়ো না, এরপর অনেক কথা শুনবে। আমার কাছে সব জলের মতন পরিষ্কার। বলতে বলতে পদ্মাবতী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চার

বাগানে যাবার আগে নরেন বলেছিল, ও সব শকুনিরা সুবিধের লোক নয় হে—মোটা টাকা সঙ্গে রেখো। চাই কি তখুনি-তখুনি কাজ হয়ে যেতে পারে।

কথাটা অযৌক্তিক নয়। সুধাংশু হাজার দুই টাকা খুচরো ক'রে সঙ্গে নিয়েছিল। অর্ডারটা যদি একবার হস্তগত করা যায় তবে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ আসতে বাধ্য। তবে ওই চিরঞ্জীলালকে নিয়েই যত দুর্ভাবনা। ও-লোকটাও আজ যাবে।

অফিসে গিয়ে কয়েকখানা চিঠিপত্র ও চেকে সই ক'রে নরেনকে সঙ্গে নিয়ে সুধাংশু বেরিয়ে পড়লো। বাকি কাজের ভার চাপিয়ে এলো ষ্টিভেন্সের ঘাড়ে। বেচারার ছুটি আর কিছুতেই নেই।

এসব কাজে নিজের মোটর ব্যবহার করলে বাড়িতে কানাকানি হবার

সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ড্রাইভারকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সুধাংশু যখন নরেনের মোটরে উঠে বসলো, বেলা তখন সাড়ে দশটা বাজে। নরেন নিজেই ড্রাইভ ক'রে চললো।

বাগানের আসরে যখন এসে পৌঁছলো তখন সমারোহ আরম্ভ হয়ে গেছে। গাড়িখানা মালীদের জিম্মায় রেখে নরেন ও সুধাংশু সমুখের দীঘি পেরিয়ে বাগানের পাশ দিয়ে ঘুরে উপরে উঠে গেল। রাজপথের সঙ্গে এখানকার এত ব্যবধান যে, কোলাহল যত ব্যাপকই হোক অতদূরে গিয়ে পৌঁছবে না। প্রশস্ত উদ্যানবাটি নির্মাণের অন্যতম কারণই নাকি এই।

এ-জগৎটা সুধাংশুর কাছে অভিনব। বাগানবাড়ির আমোদ-প্রমোদের নামে নানাবিধ নোংরামির কাহিনী মাঝে মাঝে সে যে শোনেনি, এমন নয়। এসব ব্যাপারে যারা অভ্যস্ত, এমন দু'একজন লোকের কাছে এই জাতীয় ইতিবৃত্তের বারম্বার পুনরুক্তি শুনে সে ক্লান্তি বোধ করেছে। জেনেছে, মানুষের সেই আদিম উদ্বৃত্ত যৌন-চেতনার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন এসকল ঘটনায় নূতন বৈচিত্র্য আর কিছু নেই। সুতরাং নিজের কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারলেই এখান থেকে তা'র ছুটি।

দোতলায় চকমিলানো বারান্দায় এসে উঠতেই একটি ভদ্রলোক অগ্রসর হয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। গলায় পাকানো উড়ুনি মালা ক'রে বাঁধা, গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবী হাঁটু অবধি নেমে এসেছে, মাথার দুই দিকের পাকা চুলে কলপ লাগানোর দাগ, চোখে সুর্মার রেখা, হাতে রূপা বাঁধানো ছড়ি, আঙ্গুলে গোটা চার পাঁচ আংটি, বুক-পকেটে রূপার ঘড়ি ও চেন্, পরণে ফরাসডাঙ্গার কালোপাড় ধুতি, এবং পায়ে কালো পালিশ করা এক জোড়া পামসু। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। ভদ্রলোকটি সবিনয়ে দুই বন্ধুকে পথ দেখিয়ে হলঘরের দিকে

নিয়ে গেলেন। নরেন অলক্ষ্যে গোটা দুই টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে কেবল বললে, খবর ভালো তো মল্লিক মশাই?

মল্লিক মশাই দুই হাতে নিজের উড়ুনির মালাটা চেপে ধ'রে সকৃতজ্ঞভাবে বললেন, আজ্ঞে, পায়ে রাখলেই ভালো থাকি, বড়বাবু।—এই ব'লে তিনি আর একটি দলকে অভ্যর্থনা করার জন্য দ্রুতপদে অন্যত্র চ'লে গেলেন।

নরেন এখানে নবাগতও নয়, অপরিচিতও নয়। জীবনে বহু ঘাট ঘুরেছে ব'লেই এ-ঘাট তা'র জানাশোনা। এখানে সমাজনীতির খুঁটিনাটি মেনে চলার দায় নেই বলেই এখানে সে স্বচ্ছন্দ। বন্ধুসমাজ জানে, এই শ্রেণীর জীবনটা কাটিয়ে ওঠবার সময় পায়নি বলেই সে বিয়ে করেনি। তার সংস্কার ও বন্ধনহীন প্রাণের সহজ প্রবাহটা অবাধে সকল সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মপ্লাবিত করে—সেই কারণে বিবাহিত জীবনের সীমাবদ্ধতা তার কাছে অসহ্য।

পশ্চিমের মহলটা যেমন একটু নিরিবিলি ছিল, তেমনি পূবদিকের মহলে পা বাড়িয়ে সুধাংশু যেন থতিয়ে গেল। গোটা তিনেক পাশাপাশি হল্ জুড়ে নরনারীর একটা বিপুল সমারোহ দেখে সুধাংশুর সহসা ইচ্ছা জাগলো, এই নিঃশ্বাসরোধী অবস্থাটার ভিতর থেকে ছুটে সে পালিয়ে যায় রাজপথে—যেখানে অসীম মুক্তি, বাসনার এই প্রমত্ত আলোড়ন যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে নেই। কিন্তু তারপরেই মনে পড়লো নরেনের কথাটা—এখানকার উপরিভাগে বাগানবিলাস বটে, কিন্তু অনেকেই এখান থেকে তাদের আসল কাজ গুছিয়ে চলে যায়, সুতরাং আড়ষ্ট হয়ে থাকার কোনো কারণ নেই।

মোটামুটি হিসেব করে দেখা গেল, অন্তত পঁচিশ জোড়া স্ত্রীপুরুষের সমাগম এখানে হয়েছে। হলের আশপাশে ছোট ছোট সুসজ্জিত ঘর,—রঙীন পর্দার ফাঁকে ফাঁকে ভিতরকার উল্লাসের চূর্ণ হাসির ঝলক অতিশয়

অর্থপূর্ণ। কোথাও কোথাও বিচিত্রবর্ণ রঙীন মখমলের ফরাস পাতা, সেখানে শুয়ে গড়াগড়ি দেবার জন্য বহুসংখ্যক তাকিয়া, আশেপাশে পুষ্পপাত্র ধূপদানি—উপরের চিত্রিত দেওয়ালের গায়ে ইতালীর রমণীগণের বিচিত্র দেহলতাভঙ্গীর তৈলচিত্র। দেওয়ালের কোণে কোণে ছোট ছোট মর্মরমূর্তি স্ট্যাণ্ডের উপর বসানো। মাথার উপরে বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন।

একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল তার বিচিত্র দেহমঞ্জরী দুলিয়ে। হঠাৎ থমকে নরেনকে পাকড়াও করে বললে, একা যে? বন্ধু কই?

সুধাংশুকে দেখিয়ে নরেন বললে, এই তো—

ওমা, পুরুষ মানুষ বুঝি কখনো বন্ধু হয়?—এই ব'লে নরেনের জামার একটা বোতাম খুলে দিয়ে সে পালাতে যাবে, নরেনও অমনি তার খোঁপাটা দিল নেড়ে। আশেপাশে হাসির রোল পড়ে গেল। পলকের মধ্যে সুধাংশু বুঝে নিল, নরেন এখানে জনপ্রিয়।

এক সময় চুপি চুপি নরেন সুধাংশুর কানে কানে বললে, মেয়েরা একাকার হলে সকলের দামই সমান—সকলে একই পদার্থ। আলাদা-আলাদা না থাকলে ওদের চিনতে পারা কঠিন।

হাসিমুখে সুধাংশু বললে, কি রকম?

ওই দেখো নৃত্যশিল্পী মলিনা সেন মিশে গেছে তিনকড়ি দাসীর সঙ্গে—ওটা বস্তির মেয়ে। ওই দেখো বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী মঞ্জরী রায়ের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে রামমণি দাসীর দল!—কথা বলতে বলতে নরেন দূরে কার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে অভিবাদন জানালো।

—আর ওই যে বসে রয়েছে রূপোর ঝুমকো দুলিয়ে, ও মেয়েটি হালো ডক্টর মিসেস বনলতা মিত্রের বোনঝি—পারুল বোস। সম্প্রতি

উনি হাত বদলে বেড়াচ্ছেন। তারপাশে নূরনগরের ছোটতরফের বউ—মেয়েটি বছর দুই আগে প্রেমোন্মাদিনী হয়ে এসে জানবাজারে ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়। ওর বাঁ-দিকে—ওই যে গেলাস ধ'রে আছে—ও-মেয়েটি কে জানো? রায় বাহাদুর অঘোর চৌধুরীর নাৎনী—নতুন এসে ঢুকেছে সিনেমায়—বিলাসীবালার হাতে পায়ে ধরে ডিরেক্টর চাটুয্যের কাছে একটা পার্ট আদায় করেছে। অবিশ্যি চাটুয্যে মশাই তাঁর দানের প্রতিদান পাচ্ছেন। চেয়ে দেখো, কারো সঙ্গে কারো পার্থক্য নেই—একই সাজসজ্জার পারিপাট্য, একই দেহভঙ্গিমা, একই ফ্যাশনের পুতুল, —এবং দেখতেই পাচ্ছ, ইতরভদ্রের উদ্দেশ্যটাও একই।

সুধাংশুর গলা শুকিয়ে এসেছিল। তার নিরুত্তর মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে নরেন লক্ষ্য করলো, একটি বালকসুলভ কারুণ্য বন্ধুর মুখে ফুটে উঠেছে। নরেন সাবধান হয়ে গেল। বললে, আর বেশী তোমায় চেনাবো না। হয়ত এখুনি তুমি বক্তৃতা আরম্ভ ক'রে বলবে, আমাদের সমাজ-জীবনের মূলে ক্ষয়রোগ ধরেছে! সেটি আর করোনা, দোহাই সুধাংশু—মেয়েরা তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখে হয়ত মূর্ছাই যাবে!

সুধাংশু বললে, কিন্তু মানুষ এতে ভেসে যায় কেমন করে? এমন কী এর আকর্ষণ? এর কাছে হার মানবার আছে কী?

সর্বনাশ করেছে!—নরেন বললে, এসো—আর তোমার দেখে কাজ নেই, ভাই। ওই যে ঘোষাল সাহেব ঢুকছে ওর ঘরে—বলতে বলতে সুধাংশুকে সে একপ্রকার টেনে নিয়ে গেল।

ঘোষালের ঘরে এসে ঢুকতেই তিনি অতিশয় আনন্দে সুধাংশুকে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন আসুন মিঃ রয়, সৌভাগ্য আমাদের। কতক্ষণ এসেছো নরেন?

নরেন বললে, এই খানিকক্ষণ আগে। ঘুরে ঘুরে আমার এই বন্ধু রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গলাভের আগে নরক-দর্শন করাচ্ছিলুম।

ঘোষাল সাহেব হো হো ক'রে হেসে প্রায় তাঁর অর্ধসমাপ্ত গ্লাসের উপর পড়িয়ে পড়ছিলেন—সামলে গেলেন। তারপর বললেন, যা বলেছ নরেন, তুমি ঠিক চেনো এদের। তারপর? মিঃ রয়ের জুড়ি কই?

সুধাংশু বললে, জুড়ি?

নরেন তা'র গা টিপে দিল পলকের মধ্যে। তারপর নিজেই সে বললে, সে আর বলবেন না, ঘোষাল সাহেব। বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা শহরের আঁতিপাঁতি খুঁজলুম—শেষকালে বাঁশবনে ডোমকানা! একটিও পছন্দ হোলো না।

ঘোষাল হেসে বললেন, সে কি মশাই, নিরামিষ থাকবেন?

সুধাংশু বললে, আপনাদের পাঁচজনের অনুগ্রহে সে কি আর সম্ভব হবে?

বেশ, বেশ, এই তো চাই।—হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনার কাজের কথাটা ভুলিনি। বড়বাবুকে বলেছি—ওই যে, পাশের ঘরেই তিনি আছেন।—তারপর হেঁট হয়ে পুনরায় তিনি বললেন, চিরঞ্জীলালও ব'সে রয়েছে ওঁর পায়ের কাছে ভক্ত হনুমানের মতন। ভয় নেই, ক'রে দেবো আমি—কথা যখন দিয়েছি—বসুন, এখুনি আসছি আমি—শোনো, নরেন।

নরেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাইরে গেলেন।

মিনিট দুই পরে খুট্ খুট্ জুতার শব্দের সঙ্গে নারীকণ্ঠের গুনগুনানি গানের সুরে সুধাংশু মুখ তুলে তাকালো।

ঘোষাল সাহেব!—ব'লে পর্দাটা সরিয়ে দ্রুতপদচারিণী মিস গুপ্তা এসে ঢুকেই সুধাংশুকে দেখে থমকে গেল।—এই যে, আপনি?

সুধাংশু হাত তুলে নমস্কার জানালো। মুখে হাসি টেনে এনে মিস গুপ্তা বললে, অভাগী আপনার পথ চেয়ে ছিল!

সুধাংশু বললে, তাই নাকি? ঠাট্টা, না সত্যি?

সত্যি গো মশাই। সেদিন কাঁদিয়ে গেছেন, আজ কিন্তু আপনার নিস্তার নেই। এটা সাতশো রাক্কুসীর মুলুক, একা রাজপুত্রের সাধ্য নেই এদের জাল ছিঁড়ে পালায়!—চলুন আমাদের ওদিকে, আজ গানের পরে গান শোনাবো।—মিস গুপ্তা তা'র জলজলে সাজসজ্জা আর রূপরাশি নিয়ে সুধাংশুর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। প্রসাধনের সুগন্ধে ঘর ভ'রে গেল।

সুধাংশু বললে, আপনি কি গানও গাইতে পারেন?

আ পোড়া কপাল! নীনা গুপ্তা দেখতে ভালো এই বুঝি শুধু বন্ধু-মহলে শুনেছেন? রেডিয়োয় তা'র গান শোনার জন্যে পথে-পথে ভিড় জমে যায়, এ বুঝি চোখে পড়েনি? বুঝলুম, কী জ্বালায় জ্ব'লে মেয়েমানুষ আগুনে পুড়ে মরে!—আসুন, নৈলে হাত ধ'রে ওদিকে টেনে নিয়ে যাবো। বাগান-বাড়িতে লজ্জাসঙ্কোচের ধার কেউ ধারেনা!

অগত্যা বিপন্ন সুধাংশু উঠে দাঁড়ালো। বললে, কিন্তু নরেন আর ঘোষাল সাহেবকে না জানিয়েই যাবো?

উত্তেজিত কণ্ঠে নীনা বললে, তা'রা জানে আপনি নাবালক নন্। আসুন—

আগ্রহটা এত গায়েপড়া যে, সুধাংশু প্রথমটা হক্‌চকিয়ে গেল। কিন্তু আড়ষ্টতা এখানে বেমানান, হাস্যকরও বটে। যদি সে প্রতিবাদ করে তবে তা'কে কৌতুকের পাত্র হ'তে হবে। যদি সে কোনো মেয়ের আচরণে আপত্তি জানায়, তবে সে-মেয়ে নাকি ভীষণ অপমান বোধ করবে। এখানকার মেয়ে-মহলে অপমানবোধের চেতনাটা বড় উগ্র—কারণ, সত্যকার সম্মান তা'রা পায়না। কিন্তু নীনার ব্যবহারে আজ সে যেমন বিস্মিত, তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠলো।

কয়েক পা গিয়ে সুধাংশু বললে, সেদিনকার ঘটনার পরে আমার মনে ভয় ছিল, পাছে আপনি কথা না বলেন!

হাসিমুখে নীনা বললে, তবেই আপনি মেয়েমানুষকে চিনেছেন! ঘা দিয়ে গেছেন ব'লেই তো খুঁজে বা'র করলুম।

সে কি, আশ্চর্য করলেন আপনি!

বাঁকা কটাক্ষে নীনা বললে, আপনি অত্যন্ত নতুন, তাই আশ্চর্য হন্। কত বা'র মার খেয়ে প'ড়ে যাই, আবার উঠে দাঁড়াই।—কিন্তু থাক আজ ও-আলোচনা, মিঃ রয়। জানেনতো সেই কবিতাটা—'ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে পড়েনা মনে—।' আসুন, এই যে এদিকে—

মেয়েদের বড় একটা আসরে এনে নীনা সুধাংশুকে বসিয়ে দিল। তাদের ঝলমলে পোশাকে নানা সুগন্ধের আভাস, ফুলের গোছা কারো হাতে, কারো মাথায় জুঁইফুলের মালা জড়ানো। পাউডার, রুজ আর লিপষ্টিক মাখা কতকগুলো মেয়ে—চোখে তাদের প্রলয় কটাক্ষ! বোঝা গেল, নীনা এই দলের নায়িকা।

নীনা বললে, এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। এরা নানা বাগানের ফুল। মালতী, চম্পা, গোলাপ, সূর্যমুখীর দল—নামগুলো শুনে আর কাজ নেই। দেখুন তো কাকে আপনার পছন্দ বেশী?—তা'র কথায় মেয়েরা সবাই হেসে উঠলো।

সুধাংশু বললে, কোনো ফুল কি অপছন্দ হয়?

বাঁচলুম—নীনা বললে, ফুলের গন্ধে আপনার মুখে কথা ফুটলো এতক্ষণে! এবার বলুন কোন্ গানটা গাইব—যা শুনলে অন্তত আমাকে আর ঘৃণা করবেন না?

ঘৃণা! ঘৃণা তো কাউকে করিনে, মিস গুপ্তা!

নীনা বললে, আমাদের কারো ওপর আপনার লোভ নেই, এইটেই তো ঘৃণা! আপনি দয়া করেন, অকারণে টাকা দিয়ে যান্—অত্যন্ত মিষ্টি কথা বলেন, এর চেয়ে ঘৃণা আর কি হতে পারে, মিঃ রয়?

এমন সময় নীচের থেকে হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণ একটি পাথরের রেকাবে কিছু মিষ্টান্ন এবং পরিষ্কার কাচের গ্লাসে শরবৎ এনে হাজির করলো। নীনা তাড়াতাড়ি উঠে পাচকের হাত থেকে খাবার ও জল নিয়ে বললে, মিষ্টান্নও দিতে জানি, মিঃ রয়। কিন্তু এই শ্রদ্ধা আমাদের হাত থেকে কেউ চায় না !

মেয়েরা অনেকে স'রে দাঁড়ালো। সুধাংশু মিষ্টান্নের দিকে চেয়ে বললে, এসব কি করলেন ? এইজন্যে বুঝি ডেকে আনলেন ?

হ্যাঁ, এইজন্যেই। কিন্তু কি হবে মনের কথাটা শুনে। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, আপনাকে আনন্দ দিতে না পারলে আমার কিছুতেই চলছে না—নীনার গলাটা একটু কেঁপে উঠলো।

গোলাপের পাপড়ি বসানো সন্দেশ তুলে সুধাংশু মুখে দিল।

ভয় করে আপনার দিকে তাকালে,—কেন, জানেন ?

সুধাংশু তা'র দিকে তাকালো। নীনা পুনরায় বললে, স্পষ্ট ক'রে যে বলতে পারে, লোভ নেই—এই নোংরামির মধ্যে সেই মানুষকে দেখলে বড় দুর্ভাবনা হয়। বড় অস্থির হয়ে ওঠে মন। মনে হয়, আপনার সংসর্গে এলে বুঝি নিজেরও সর্বনাশ হবে !

খাওয়া শেষ ক'রে সুধাংশু বললে, লোভ না থাকলেও বন্ধুত্ব থাকতে পারে তো, মিস গুপ্তা !

বন্ধুত্ব—! নীনা বললে, মাঝখানে যদি লোভটা দাঁড়িয়ে না থাকে তবে আপনার আমার মাঝখানে বন্ধুত্বের সেতু কোথায় ? লোভ নিয়েই আমাদের জীবন, আসক্তিই আমাদের সর্বস্ব ! এসব যদি ত্যাগ করতে হয় তবে তো চূর্ণ হয়ে যাবো, মিঃ রয় !

এমন সময় তবলচি এলো বাঁয়া-তবলা আর তম্বুরা সঙ্গে নিয়ে। নীনা বললে, যাকগে ওসব কথা। আসুন, আপনাকে গান শোনাই।

তম্বুরাটা নিয়ে নীনা ব'সে গেল। তারযন্ত্রের সঙ্গে তবলার বোল

উঠতেই এধার ওধার থেকে জোড়ায়-জোড়ায় মেয়েপুরুষের দল এসে হাজির হোলো। এখানকার আসরটাই বড়—কারণ, মিস গুপ্তাই আজকের মক্ষিরাণী। ভারিক্কি চালে যে সকল ভদ্রমহোদয় এসে বসলেন, তাঁদের মধ্যে অর্বাচীন তরুণের সংখ্যা একপ্রকার নেই বললেই হয়। কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আইনজীবী, উঁচুদরের সরকারী চাকুরে, পুরনো জমিদার এবং স্টক-এক্স্চেঞ্জের দালালের সংখ্যাই বেশী। অল্প এক আধজন মুসলমান, খৃস্টান ও মাড়োয়ারি ভদ্রলোক ওর মধ্যে ফোড়নের মতো ছড়ানো রয়েছেন। তাঁদের বিনীত ভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তবলা বাঁধা হচ্ছে এমন সময় নরেন এসে দূরে দাঁড়িয়ে চোখ টিপে সুধাংশুকে ডাকলো। সুধাংশু কয়েক মিনিটের জন্য নীনার কাছে ছুটি নিয়ে উঠে গেল। নরেন তা'কে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাত পেতে বললে, হাজার খানেক টাকা শীঘ্র দাও।

সুধাংশু টাকা বা'র ক'রে দিল।

নরেন বললে, এই টাকাটা আজকের এই বাগানবাড়ির খরচ। কাঁঠালটা আজ তোমার মাথাতেই ভাঙা হবে—এইভাবেই বড়বাবুকে ধ'রে ঘোষাল রাজী করিয়েছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, সুধাংশু—

সুধাংশু মুখ তুললো। নরেন অনুযোগের সুরে বললে, যার হাত থেকে সেদিন তুমি গেলাস নাওনি, সেই নীনার জন্যেই এই অর্ডারটা পাওয়া গেল। মেয়েটার নজরে তুমি প'ড়ে গেছ হে। কাল অনেক রাতে নীনা গিয়ে ধরেছিল বড়বাবুকে। বড়বাবু তাকে চিরঞ্জীলালের কোটেশনটা চুপি চুপি জানিয়ে দিয়েছেন। বুঝলেনা, মেয়েমানুষ গিয়ে ধরেছে, বড়বাবু একেবারে কুপোকাৎ।

সুধাংশু আনন্দোজ্জ্বল মুখে বললে, তারপর ?

নরেন বললে, তারপর আর কি। এই হাজার টাকার শর্তে ঘোষালের

কাছে খবরটা আদায় করলুম। সত্যি, নীনা যা উপকার করলো! বেশ বুঝছি, মেয়েটা তোমাকে পাকড়াতে চায়। আমার কপাল ভাঙলো ভাই।

কিন্তু আমাদের কোটেশনটা?—সুধাংশু আসল কথাটা পাড়লো।

এইমাত্র দিয়ে এলুম। চিরঞ্জীলালের চেয়ে টাকায় দুপয়সা কম দিয়ে এইমাত্র চাপরাশির মারফৎ একেবারে বড়বাবুর আপিসে কোটেশনটা দিলুম পাঠিয়ে। ভয় নেই, গত কালকের তারিখ দিয়েছি। সাবধান, দুনিয়ার কেউ যেন এই খবরের গন্ধও না পায়!

কিন্তু জোচ্চুরি হোলো না তো?—সুধাংশু বললে।

নরেন বিরক্ত হয়ে বললে, বাজে বোকোনা, সুধাংশু! যাও, এবার নীনাকে বকশিস দিয়ে খুশী করোগে। আমি এই টাকাটা ঘোষালকে দিয়ে আসি। এক্ষুনি আসছি।

সুধাংশুর অপেক্ষাতেই নীনা তখনও গান ধরেনি। সে যখন এসে পাশে বসলো, নীনা তখনও তম্বুরার তারে টোকা দিতে দিতেই তার কাছে ফিস ফিস করে বললে, এটা জোচ্চুরি নয়, মিঃ রয়।

হঠাৎ বিস্ময়ে সুধাংশু তার দিকে মুখ ফেরালো। গলা নামিয়ে বললে, আপনি কি যাদু জানেন? মনের কথা টের পান্?

নীনা বললে, এটা জোচ্চুরি নয়। অন্যের চেয়ে অল্প লাভে মাল ছেড়ে দেওয়াটাই ব্যবসা—জোচ্চুরি নয়!

এই বলে সুধাংশুর বিস্ময়-স্তব্ধ মুখের উপর তার সুরের আবেশময় দুটি নরম চোখ বুলিয়ে নিয়ে সহাস্যমুখে নীনা গান ধরে দিল। তম্বুরার তারের উপর দিয়ে তার সুন্দর আঙুলগুলি নেচে নেচে বেড়াতে লাগলো।

অসংখ্য শ্রোতা চারদিকে ঘিরে বসে রয়েছে। মেয়েদের উৎসুক ঈর্ষাতুর মুখ অপলক চোখে নীনার দিকে স্থির হয়ে ছিল। কেউ কেউ

অনর্থক অস্থানে বাহবা দিতে লাগলো। কোনো কোনো জুড়ি এই সুযোগে আসর ছেড়ে উঠে গেল তাদের নিরিবিলি বিশ্রামাগারে। অনেকে মুখ টিপে হাসলো।

গানের মাঝখানে নরেন ও ঘোষাল সাহেব কাছাকাছি এসে বসলো। অনেকেই জানে আজকের মক্ষিরাণী হোলো নীনা, নরেনের জুড়ি—ঘোষালের নয়। সেই কারণে শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের অনেকেই প্রশংসমান দৃষ্টিতে নরেনের দিকে চেয়ে কানাকানি করতে লাগলো। কিন্তু নরেন শান্ত, নরেন চতুর—প্রকাশ্য সমাজে চটুলতা প্রকাশ করে নিজের সম্ভ্রমকে সে নষ্ট হতে দেয়না।

কিন্তু নীনার ভ্রূক্ষেপ নেই কোনোদিকে। সুরের তরঙ্গে সে ভেসে চলেছে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে। সুধাংশু স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলো, তার গানে কেন এই আকুলতা, কেন বা এই ব্যাকুলতা। একান্ত করে গান শোনাবার জন্য নীনা তাকেই ডেকে এনেছে, এ গান তারই উদ্দেশে গীত হচ্ছে। এই গানে তার একাগ্র বাসনার যে ঔৎসুক্য রয়েছে—তার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটি নিজের দিক থেকে অপ্রকাশ্য কিছু রাখতে চায় না—এইটিই সুধাংশুর পক্ষে দুর্ভাবনার কথা। কিন্তু যে-উপকার আজ এই মেয়েটির কাছে পাওয়া গেল, তার জন্য অপরিসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে সে চুপ করে বসে রইল। ভালোয় মন্দয়, আলোয় ছায়ায় এই নারীকে তার বিচিত্র মনে হতে লাগলো।

পাঁচ

গান থামলো। কিন্তু গানের শেষ রেশটুকু বাইরের নতুন শরতের আকাশে আতাম্র বাষ্পময় রৌদ্রে যেন থরথর করে তখনও কাঁপছিল।

তম্বুরাটা রেখে হাসিমুখে তাকাতেই নরেন বললে, চমৎকার গেয়েছ আজ। কি বলো, সুধাংশু?

সুধাংশু তার নিঃশব্দ শান্ত ও সংযত হাস্যে সম্মতি যোগ করে দিল।

এমন সময় জনতিনেক চাকর তিনখানা ট্রে-র উপরে অনেকগুলি রঙীন পানীয়পূর্ণ গ্লাস এনে সকলের হাতে বিতরণ করতে লাগলো। তাদের পিছনে পাচক এসে ঝালযুক্ত বাদাম, কড়াই, পাঁপড়, শুকনো মাংসভাজা এবং আরও নানাবিধ সময়োপযোগী আহার্য রেখে চলে গেল। এক একটি গ্লাস প্রায় সকলেই তুলে নিল। বোঝা গেল, মেয়ে-পুরুষ অনেকেই তৃষার্ত!

এপাশে ঘোষাল বসেছিলেন। তাঁর মুখে কিছু বিরক্তির ভাব ছিল। বললেন, ভাল গান শুনতে গেলে ভালো মন থাকা দরকার। সকাল থেকে মশাই, মেয়েমানুষের সঙ্গে দরদস্তুর করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হোলো। ছি ছি, ঝকমারি, স্রেফ কাদা ঘাঁটা! এসব কাজ ভদ্রলোকের নয়। আনন্দটাই মাটি।

সুধাংশু চাপা গলায় বললে, ব্যাপার কি, মিঃ ঘোষাল?

আর মশাই, বলবেন না। কদিন থেকে একটা ছুঁড়িকে নিয়ে হায়রাণ হচ্ছি। নোংরা বস্তির থেকে আমিই তুলে আনলুম, এখন টাকা হাঁকে হাতির মতন। মুখখানা নর্দমা, ভালো কথা বলতে

শেখেনি। যেমন দোকানদার, তেমনি যেয়াড়া। কিছুতেই রাগ মানাতে পারছিনে।

কে মেয়েটি?

নরেন বললে, সেই যে শুনলে, নবদ্বীপের মেয়ে।

সুধাংশুর কোনো কৌতূহল নেই। সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো নীনার দিকে। নীনা বললে, সত্যিই মেয়েটা অত্যন্ত অভদ্র, লোকের মান রেখে কথা কয় না! যেমন চেহারা তেমনি রীত!

ঘোষাল নীনার দিকে চেয়ে বললেন, আজকের ব্যাপারটা মানে-মানে চুকে যাক্, ছুঁড়িটাকে দূর করে দেবো তোমার পাশের ফ্ল্যাট থেকে। একটা জেল-খাটা ছোকরা আছে ওর পেছনে, সেই ব্যাটাই ওকে পথে বসাবে বলে রাখলুম। দাওহে নরেন, একটা গেলাস এদিকে বাড়িয়ে দাও—গলাটা শুকিয়ে গেছে। ছুঁড়িটার সঙ্গে বাজে বকতে বকতে মাথা ধরে উঠেছে।

অনেকেই ধরে বসলো নীনাকে আর একটা গান গাইতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সুধাংশুর কাছ থেকে যে-উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাবার আশা ছিল, সেটা পাওয়া গেল না। সুতরাং নীনা একটু বিমর্ষ হয়েই দ্বিতীয়বার তম্বুরাটা তুলে নিয়ে সুর ভাঁজতে লাগলো। নতুন কয়েক-জন এসে আসরে বসলো, এবং এই ফাঁকে আরও জুড়ি দুই তিন স্ত্রী-পুরুষ গেলাসগুলো হাতে নিয়েই তাদের বিশ্রামকক্ষের দিকে গা ঢাকা দিল। তাদের এই পলায়নের কারণ কারো কাছে, এমন কি সুধাংশুর কাছেও অস্পষ্ট রইল না। কেউ কেউ অস্ফুট ও অর্থপূর্ণ মন্তব্যও ছুঁড়ে দিল।

নীনা তার গানের প্রথম কলিটা সবেমাত্র ধরেছে, এমন সময় সহসা দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে দক্ষিণবায়ুর ঝাপটার মতো একটি মেয়ে ছুটে এলো আসরে নাচতে নাচতে। গানের প্রারম্ভে এমন

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আচরণ অনেকখানি অসামাজিক বৈ কি। নীনা সহসা তার নাচের দিকে চেয়ে গান থামাতে বাধ্য হোলো। সকলেই হতবাক, বিমূঢ়!

মেয়েটি তার সর্বাঙ্গে মোচড় দিয়ে অপরূপ ভঙ্গীতে বাধাহীন বন্যার মতো নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিল। গায়ের রং তার ঘন কালো, কঠিন বেত্রলতার মতো তনু-দেহ—দৃঢ়গঠিত সুশ্রী যৌবন, ললিত লাবণ্যে সুকুমার। সাজসজ্জা কিছু নেই—সাধারণ কালোপাড় একখানা সূতি-শাড়ি, একটি সূতি-জামা। সর্বাঙ্গ নিরাভরণ, অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল হাতের মণিবন্ধে, বাহুতে, গলায়, মাথার খোঁপায় জুঁইফুলের মালা জড়ানো। কপালে চন্দন, নাসাগ্রে তিলক, চোখে কাজল—দর্শক নর-নারীরা এই উৎক্ষিপ্ত উল্কার দিকে বিস্ময়-আহত স্তব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আবেশ-বিহ্বল মুখখানি মেয়েটির টসটস করছে।

উন্মাদিনী সহসা থমকে তার সারাদেহব্যাপী সুরলহরীর সঙ্গে হাতের ও পায়ের আঙুলে তাল দিয়ে গান ধরলো—

"কত মধুযামিনী বিফলে গোঙায়নু—
কত মধুযামিনী—"

তারপরেই মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে পঞ্চমে তুললো—"দেখনু না পিয়মুখচন্দা—কত মধুযামিনী···"

সুধাংশু বিমূঢ় স্তম্ভিত, নিমেষনিহত!

মেয়েটি আবার ধরলো—"দেখনু না পিয়মুখচন্দা—"

কীর্তনের আসর এটা নয়, কীর্তনে অনেকেরই হয়ত আপত্তি ছিল। কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দ প্রতিবাদ, সর্বপ্রকার বিপরীত মন্তব্য ও জড়তা আপন প্রাণবন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে মেয়েটি আবার হাসিমুখে নেচে-নেচে গান ধরলো—"জ্ঞানদাস কহে, বিনয় বচনে, শুন বিনোদিনি রাধা—"

কে একজন মুখ থেকে গেলাস নামিয়ে টিপ্পনী করলো, কিন্তু শ্রীমতী রাধা ছিলেন পরমাসুন্দরী, তুমি যে তা'র উল্টো, ভাই ?

আসরে একটা হট্টগোল উঠলো। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ালো, সুরের আবেশটিতে হাতে হাতে তাল দিয়ে-দিয়ে বললে, ঠাকুর, আমি কালো নই, কৃষ্ণকায়া ! চোখে আমার কৃষ্ণতারকা,—সর্বাঙ্গে কূলহারা কালিন্দীর বন্যা ! আমি কৃষ্ণবিরহিনী, ঠাকুর, তাই তো কালো !

বেশ ভাই, বেশ—ভালো জবাব দিয়েছ !

নীনা আড় চোখে একবার তাকালো সুধাংশুর দিকে। কোনো দিকে সুধাংশুর ভ্রূক্ষেপ নেই—স্বপ্ন সে যেন অভিভূত, বিভোর।

মেয়েটি আবার গাইলো—"যেতে মথুরা নগরে তোরে মানা করে—যতেক কূলের বাধা ! যেতে মথুরা নগরে—"

আসরের একজন ব'লে উঠলো—মথুরায় কেনগো, বৃন্দাবনেই তো বেশ আছ !

মেয়েটি করুণ মধুর কণ্ঠে নিজের বক্ষঃস্থল দেখিয়ে জবাব দিল—ঠাকুর, শ্রীনন্দনন্দনের অভাবে এই বৃন্দাবন আজ অন্ধকার। এই আমার চিরবিরহমন্দিরে চিরবিরহিনী রাধা ব'সে রয়েছেন চিরমাধবের আশায়। কালো কালিন্দীতে কৃষ্ণের ছায়া দেখি, কৃষ্ণপক্ষের দিকে চেয়ে থাকি কৃষ্ণকেশদাম এলিয়ে,—দিন আমার কাটেনা গো।

"তুই যেতে পারবিনে রাই—ওগো রাই গো—
রাই গো—তুই যেতে পারবিনে, রাই—"

আবার একজন প্রশ্নভঙ্গির কণ্ঠে বললে, কেন, রাস্তা তো খুব অল্পই শুনেছি—।

হাসিমুখে বিহ্বল কণ্ঠে মেয়েটি বললে, পথ অল্প নয়, ঠাকুর। পথ অনন্ত, অনন্ত বাধা ! কিন্তু প্রেমের তপস্যা সেই অনন্ত বাধা পেরিয়ে যায়। জ্ঞানদাস বলেছেন—

"তুই যেতে পারবিনে রাই,
ওরে, কূলের কালি না মুছিলে কূল—
কূল ত্যজিতে পারবিনে রাই—
যতেক কূলের বাধা।—
ওরে, প্রাণ দিয়ে যদি—"

মেয়েটির দীর্ঘ পঞ্চম তান, এই মণ্ডপের আসর, এই লালস-বিলোল আবহ-পরিবেশ, চারিদিকের কদর্য ইশারা-ইঙ্গিত, বাইরের বাগানে শরৎকালের ওই সোনালী আলো সমস্তটাই অতিক্রম করে দূর থেকে দূরে করুণ কান্নার মতো ছুটে যেতে লাগলো।

আসরটা এতক্ষণে স্তব্ধ হোলো। তার মাঝখানে সেই আত্মবিস্মৃতা, বিবশা, আলুলিতা উন্মাদিনী শীর্ণ তীব্র কণ্ঠে আবার গেয়ে উঠলো—

"ওরে প্রাণ দিয়ে যদি প্রাণনাথে পাস
তবু তুই ছাড়বিনে রাই।—
যতেক কূলের বাধা—!"

সুধাংশুর অপলক দৃষ্টি স্বপ্নাতুর চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। সুরের খাদে নামিয়ে এনে মেয়েটি আবার ধরলো—

"নব—নব অনুরাগিনী চলিছে—
দেখো দেখো—"

নৃত্যকলাবতী এগিয়ে গেল এক একজন শ্রোতা ও শ্রোত্রীর কাছে। কেউ দিলে তার হাতে ফুল, কেউ দিল মালা, কেউ হাত ধরে সোচ্ছ্বাসে নেড়ে দিলে, আবার কেউ বা দিল বাদাম কড়াই ভাজা।

"নব—নব অনুরাগিনী চলিছে—
দেখো দেখো—"

গাইতে গাইতে মেয়েটি এগিয়ে এলো এদিকে। সুধাংশু তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো। হঠাৎ গান থামিয়ে মেয়েটি তার

মুখের ওপর চোখ রেখে বলে উঠলো, বাবারে, কী চোখ তোমার গো? কী কালো! কৃষ্ণসাগরে ডুবে মরতে আমার সাধ যায়।—'সব—নব অনুরাগিনী চলিছে—' বলতে বলতে সে হেলে দুলে গেল অন্যত্র। চেহারার প্রশংসায় সুধাংশু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। নীনা ঘাড় ফিরালো। সব সময়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে দুই পায়ে ভর দিয়ে অপরূপ ভঙ্গীমায় মেয়েটি আবার নাচতে লাগলো—

"ওরে গুরু গুরুজন ভয়, কিছু নাহি মানয়ে,
চীর নাহি সম্বরু দেহা!"—

স্বরগ্রাম সপ্তম স্বর থেকে নামিয়ে সে আবার নিম্নস্বরে ধরলো—

"দেখো—দেখো, নব অনুরাগিনী চলিছে—"

ঘোষাল সাহেব নরেন ও সুধাংশুর মাঝখানে গলা বাড়িয়ে চুপি চুপি বললেন, চমৎকার গায়, কি বলেন? এই জন্যে ওর অত উৎপাত সহ্য করি, মশাই। দেখছেন, পাগলীর নাচের তাল এতক্ষণে কোথাও একটু কাটলো না।

সুধাংশু ফিরে তাকালো ঘোষালের দিকে। ঘোষাল বললেন, মেয়েটা নোংরামিতে ডুবে থাকে, নৈলে আরোও উন্নতি হোতো!

নরেন বললে, কীর্তন চমৎকার করে—নবদ্বীপের মেয়ে কিনা! কী যেন নামটা বলেছিলেন?

ঘোষাল সাহেব বললেন, শ্যামলী!

সুধাংশুর সমস্ত শরীরের স্নায়ুতন্ত্রীদলের মধ্যে নামটা যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো। সে আর একবার উদার অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকালো শ্যামলীর দিকে। নীনা একবার উদ্বিগ্ন দুর্ভাবনায় চেয়ে দেখলো সুধাংশুর প্রতি, তারপরে আবার তার ঈর্ষাতুর চোখ ফিরে গেল ওই কালো মেয়েটার দেহভঙ্গীর রেখায় রেখায়। সুধাংশুর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে তার পাউডারমাখা মুখও অতিশয় অস্বস্তিতে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল।

শ্যামলীর প্রত্যেকটি গতিভঙ্গী, নৃত্যের কুশলতা, কণ্ঠের আবেগ, চক্ষের বিহ্বলতা—সুধাংশু একাগ্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিল। দৃশ্যটা এক সময়ে নীনার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো। খানিক আগে এই আসরে সে ছিল সর্বাগ্রগণ্যা, এখন যেন সে সকলের এক পাশে প'ড়ে গেছে। খানিক আগে গান গেয়ে সে সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিল, এই কালো মেয়েটা হঠাৎ ছুটে এসে তার কীর্তনের মাধুর্যরসের প্লাবনে সবাইকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এতে তার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন।

এদিকে নরেন নিঃশব্দে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল, নীনা বুঝতে পারেনি। এইবার সে ওপাশে সরে ঝুঁকে পড়ে হাসিমুখে বললে, ভয় নেই নীনা, তোমার জায়গায় তুমি ঠিকই আছ! এসব মায়া মোহ!

নীনা এবার একটু উষ্ণ হয়ে উঠলো। বললে, শুনেছিলুম যে তোমার বন্ধু কাজ শেষ হলেই চলে যাবেন? চাকা ঘুরলো কেন?

চোখ উল্টে নরেন চাপা বিদ্রূপের সঙ্গে বললে, ধার্মিক লোক কিনা, নামকীর্তনে মজে গেছে! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

নীনা আর কিছু বললেনা, মুখ ফিরিয়ে ভিতরের বিক্ষোভটাকে চেপে বিরস মুখে বসে রইলো।

পাগলিনী ইতিমধ্যে আবার সপ্তম পর্দায় তার কোকিল কণ্ঠের স্বর চড়িয়েছিল। নেচে নেচে সে গাইছে সর্বাঙ্গে তরঙ্গ তুলে—

"ঘন আঁধিয়ার ভূজগভয় কত শত—
পন্থ বিপথ নাহি মান।
রাধে গো—পন্থ বিপথ নাহি মান।"—

তখনই সুর নামিয়ে আবার সে নিম্নস্বরে ধরলো—

"দেখো—দেখো, নব অনুরাগিনী চলিছে-"

কীর্তন যখন তার থামলো তখন প্রায় অপরাহ্ন হয়ে এসেছে। এইবার আপাতত এ-আসরটা ভাঙলো। অনেকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়,

অনেকের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই এবং অনেকে অকারণ আলাপের আতিশয্যে আত্মবিস্মৃত হয়েছে। এটি স্বাভাবিক।

ঘোষাল সাহেব একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এক সময় একটি গেলাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা বসো ভাই, আমি একটু ওধারে দেখিগে।—এই বলে তিনি অস্থির পায়ে দক্ষিণ বারান্দার দিকে চলে গেলেন। শ্যামলীই যে তাঁর লক্ষ্য, এটা অস্পষ্ট রইলোনা।

নীনা হেসে সেদিকে তাকিয়ে বললে, আপনার কোনো আশা নেই, মিঃ রয়।

অর্থটা দুর্বোধ্য নয়। সুধাংশু তখনই বললে, আশা তো কিছু করিনি, মিস গুপ্তা?

নীনা একটু থমকে গেল। তারপর বললে, কেত্তন শুনে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন দেখেছি। শ্যামলীকে কেমন লাগলো?

সুধাংশু মুগ্ধ ও প্রশংসমান চক্ষে চেয়ে বললে, অসাধারণ মেয়ে!

আহত মুখে নীনা বললে, তবে এই যে বলেন, মেয়েমানুষের প্রতি কোনো লোভ আপনার নেই?

লোভ নেই বলেই তো সহজে ভালো বলতে পারি, মিস গুপ্তা!

নীনা এবার চুপ করে গেল। আশপাশে তখন কলকণ্ঠীর দল মহা কলরবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওদের মধ্যে ইতিমধ্যেই জানাজানি হয়ে গেছে; আজকে বাগানবাড়ির সর্বপ্রকার ব্যয় বহন করেছেন মিঃ রয়। অনেকে এসে সুধাংশুকে ঘিরে দাঁড়ালো। বললে, টাকা খরচ করে সারাদিন ধরে তো ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করলেন, আমাদের বকশিস কই?

সুধাংশু সহাস্য মুখে বললে, কি চাও তোমরা বলো?

সবাই বললে, চকোলেট, বিস্কুট, লজেঞ্জুস, জরিমোড়া পান, ফুলের তোড়া—

আর একদল বললে, আতর, গোলাপ, চুয়া-চন্দন, তেল-সাবান, স্নো-পাউডার, ক্রীম-শাম্পু—যা চাইব তাই দিতে হবে।

সুধাংশু হেসে বললে, তথাস্তু—তার সঙ্গে মিষ্টিমুখও দেবো। এক ঘণ্টা বাদে সবাই এসে নিয়ে যেয়ো।

গোটা পঞ্চাশেক টাকা বার করে সে নরেনের হাতে দিয়ে বললে, মান রক্ষা করো। একটা ফর্দ করে এখুনি লোক পাঠিয়ে দাও।

আচ্ছা, দিচ্ছি। কিন্তু তুমি আমার মনিব, এবার তোমার একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা আমি করে দেবো। ওঠো তোমরা।

সুধাংশুর সঙ্গে নীনাও উঠে দাঁড়ালো। নরেনের জানাশোনা ব্যবস্থা করা ছিল সমস্তই। একটি সুসজ্জিত ঘরে সুধাংশুকে এনে সে বসালো। নীনাকে তার বন্ধুরা টেনে নিয়ে গেল অন্যত্র গানের ফরমাসে।

নরেন বললে, এই রইলো সিগারেটের টিন। আর এই রইলো বোতল—এই গেলাস আর সোডা। নিরিবিলি বিশ্রাম করো। তোমার মেজাজটা গেছে খারাপ হয়ে দেখছি। হবেই তো।

সুধাংশু বললে, কেন বলো দেখি?

ওই নবদ্বীপের মেয়েটা—!

বলেছ ঠিক। মেয়েটা আশ্চর্য!

পদ্মাবতীর কথাগুলি নরেনের মনে পড়ে গেল। সে বললে, ভয় করে হে, তোমার ধাতে আবার ওসব নেই। সাবধান।

সুধাংশু বললে, আমি নাবালক নই, নরেন।

দেওয়ালের সুইচ টিপে পাখাটা খুলে দিয়ে নরেন বললে, তুমি তারো অধম—তুমি বিবাহিত!

দুই বন্ধুতে খুব এক চোট হেসে নিল। তারপর এক সময়ে আত্মগতভাবে সুধাংশু বললে, ও-মেয়ে কখনো নোংরা হতে পারেনা। যারা বলে, তারা ওকে চেনেনি। অমন গলা, অমন শিল্পী, প্রাণের

ওই অদ্ভুত প্রাচুর্য—ও কিছুতেই ছোট হতে পারেনা। নাচে-গানে এমন মেয়ে-শিল্পী যে-কোনো দেশেই দুর্লভ, নরেন।

নরেন একবার তার দিকে তাকালো। কঠোর কণ্ঠে বললে, মরেছ তুমি!—বলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

সুধাংশু এবার হাসলোনা, চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

সুধাংশু বিশ্রাম নিল ঠিক যেন তপস্বীর মতো। পানীয় আর পানপাত্র পড়ে রইল অবহেলায়—সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। মানুষটা অন্য ধাতের—আমোদ চায়না, অশুচি আনন্দও চায়না। কিন্তু এরই মধ্যে তন্ময় হয়ে সে যেন ভেবে নিল আর একটা কিছু।

কতক্ষণ পরে সে যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো আত্মবিস্মৃত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালো। এদিকটা ততক্ষণে নিরিবিলি, দক্ষিণের বারান্দার ওদিকটাও জনবিরল—জাঁকজমক চটক—কোথাও চোখে পড়েনা। সাধারণত ওদিকটা চাকর-বাকরদের পাড়া, তাদেরই আনাগোনা। সুধাংশু চললো দক্ষিণ বারান্দা পেরিয়ে।

বিশেষ একটি ঘরের দরজার কাছে এসে দেখলো পর্দা ফেলা। সে গলার সাড়া দিল। কিন্তু পলকমাত্র। গলার সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে উগ্র নারীকণ্ঠের জবাব এলো—কে? ভেতরে এসো।

সুধাংশু পর্দা তুলে ভিতরে ঢুকলো। শ্যামলী হাসি মুখে বললে, সাড়া দিয়ে সতর্ক ক'রে আমাদের ঘরে কোনো জানোয়ার ঢোকেনা! তুমি বোধ হয় নতুন?

সুধাংশু হাসলো। শ্যামলী বললে, বসো।

কিন্তু বসবার জায়গা সে এগিয়ে দিলনা। বোঝা গেল অভ্যর্থনাটা মৌখিক। সে নিজে একখানা নড়বড়ে তক্তার উপর ওলটপালট খেয়ে

ব'সে রয়েছে। সর্বাঙ্গের পুষ্পাভরণ তা'র ছিন্নভিন্ন, বিমর্দিত। চোখের আবেশরসে ধুয়ে গেছে তার কালো চোখের কাজল।

সুধাংশু বললে, আমি নতুন, কেমন ক'রে জানলে ?

জানতে হয় না—শ্যামলী বললে, চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ যে ? কি মতলবে ?

আমি তোমার কীর্তনে ভারি আনন্দ পেয়েছি।

ওঃ বুঝেছি—শ্যামলী হেসে উঠলো—সেই পুরনো ভূমিকা আলাপ করবার।

সুধাংশুর বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠলো। বললে, কোনো মতলব নিয়ে আমি আসিনি। খুশী হয়েছি গান শুনে, কিছু উপহার আমি দিতে চাই তোমাকে।

মানে, দাদন দিতে চাও সুদ পাবার জন্যে ?

না।

তবে কি নিঃস্বার্থ উপহারের ছদ্মবেশ ?

এবার সুধাংশু হাসলো—তাও না।

তাহলে তুমি আরো সাংঘাতিক।—আচ্ছা, কী দিতে চাও, দাও।

সুধাংশু হাত থেকে হীরের আংটি খুলে দিল। শ্যামলী তাকালো তা'র মুখের দিকে। বললে, শুনেছি ঘোষালের মুখে তোমার কথা। তুমি বড়লোক, তুমি পাকা ব্যবসায়ী। কিন্তু এই দুর্মতি কেন তোমার ? এ পাড়ায় কেন ?

সুধাংশু বললে, তোমাকে আবিষ্কার করতে পারবো তাই নিয়তি আমাকে টেনে এনেছে।

শ্যামলী বললে, নিয়তি তুমি মানো ?

মানি।

কিন্তু হীরের আংটি উপহার দিয়ে একটা পথের মেয়েকে তুমি

অপমান করতে এলে—এই হৃদয়হীন বুদ্ধিও কি তুমি নিয়তির কাছে পেয়েছ?—শ্যামলী হাঁপাতে লাগলো!

সুধাংশু চমকে উঠলো। বললে, অপমান আমি করতে আসিনি, শ্যামলী!

নির্বোধ, তাই বুঝতে পারোনি।—শ্যামলী বললে, আমরা দয়ার দান নিইনে, কেবল দান-প্রতিদানই বুঝি। যারা নিঃস্বার্থ, উদার, নির্লোভ—তাদের জায়গা দেবো কেন? তাদের চক্রান্তে প'ড়ে গেলে আমাদের সর্বনাশ। তোমার আংটি তুমি নিয়ে যাও।

সুধাংশু মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো স্তব্ধ হয়ে। শ্যামলী পুনরায় বললে, এ-পথে মন ভোলাবার জন্যে এসো না, বরং চমক লাগাবার জন্যে আসতে পারো। তোমার ভয়ানক লোভ, তুমি ভয়ানক ইতর, তুমি টাকার অহঙ্কারে দিশেহারা—এই জানলেই আমরা খুশী, আমরা নিশ্চিন্ত। এর বিপরীত চেহারা কিছু দেখিয়ো না। সত্যি, কি জন্যে এসেছিলে বলো তো?

সুধাংশু শুধু বললে, তুমিই বলো দেখি?

শ্যামলী বললে, থাক্, তোমার মনের কথা মনেই রাখো, মনের কারবার আমরা করিনে। কিন্তু তুমি নতুন, তাই একটা কথা বলে রাখি, আমরা অনেক নীচে নেমে গেছি, আমাদের সঙ্গে মিশতে গেলে তোমাকেও নীচে নামতে হবে!

এবার সুধাংশু বললে, কিন্তু তুমি তো নীচে নামোনি!

মানে?

কৃষ্ণবিরহিণী নীচে নামতে জানে না! আমি জানি তুমি সকলের ওপর উঠতে পারো।

কী বলছ?

বলছি তুমি অসাধারণ শিল্পী, তুমি প্রতিভা। তোমার প্রাণশক্তির এই অপমৃত্যু কি তোমার চোখে পড়ে না?

শ্যামলী হেসে বললে, ছিন্নমস্তা নিজের রক্ত দেখেই বেশী আনন্দ পায়!

সুধাংশু বললে, তবে বলবার কিছু নেই। শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলুম তুমি গ্রহণ করলে না—এবার আমি যাই। কিন্তু একটা কথা বলে যাই, যদি এমন কোনোদিন আসে তোমার কোনো কাজে আসতে পারি—আমাকে মনে করো।—এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

তাহলে দাঁড়াও।—বলে শ্যামলী হীরের আংটিটা তার হাতে তুলে দিল। পুনরায় বললে, উপহার চাইনে, দান চাই। এই একটু আগে আমার প্রিয় বন্ধু আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেছে—এখানে মুজরো করতে এসে যা বকশিস পেয়েছিলুম, সেই ডাকাতের হাতে তুলে দিতে হয়েছে। তুমি কিছু টাকা দিয়ে যাও।

সুধাংশু কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে বললে, কিন্তু এ-টাকাও তো সেই ডাকাত কেড়ে নেবে।

নিক্—শ্যামলী বললে, যে যত ইতর আর স্বার্থপরই হোক না কেন, সে আমার প্রিয়।

এত উৎপীড়নের পরেও তুমি তাকে ভালোবাসো?

উৎপীড়নই তো ভালোবাসার পরীক্ষা! যে-বসন্ত সব পাতা ঝরিয়ে দেয়, সর্বস্বান্ত করে—সেই ঋতুরাজের দয়াতেই তো আবার গাছের প্রাণে প্রাণে জোয়ার আসে!

কে সে?

সে এক চণ্ডাল! জলে পুড়ে গেলুম তার জন্যে!

এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। তারপরেই দরজার পর্দাটা একটু তুলে ধ'রেই বাইরে থেকে মিস গুপ্তা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো! হাসির অর্থ হোলো, তুমি যে সুবিধে পেলেই ডুব দিয়ে জল খাও, এইটুকু জেনে আমি আনন্দিত।

নীনা চ'লে যাচ্ছিল, সুধাংশু এলো বেরিয়ে। বললে, চলুন, আমিও যাবো।

কয়েক পা গিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কণ্ঠে নীনা বললে, যা হোক আপনার একটা উপায় হ'য়ে গেল। মেয়েটা ইতর, কিন্তু ওরই সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা—নতুন বটে! আপনার রুচি এত নীচে নামবে আশা করিনি।—তা'র কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও কঠিন।

বটে!—এইবার সুধাংশু হো হো ক'রে হেসে স্পষ্ট ক'রে কথা বললে,—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে নির্বোধ ব'লেই আপনারা ধ'রে নিলেন। কিন্তু বোধ হয় অত নির্বোধ আমি নই। আমি ব্যবসাদার। কিন্তু ব্যবসাদারও চিড়িয়াখানা দেখতে এসে কিছু বাজে খরচ ক'রে যায়, এতে তা'র গায়ে লাগেনা। কোনো জন্তু দাঁত খিঁচোয়, কোন জন্তু বা এসে গা চাটতে চায়—দুটোই সমান কৌতুকের। আর রুচির কথা?—সুধাংশু আবার হাসলো—ওটা আপাতত আপনাদের মুখে না শুনলেও আমার চলবে, মিস গুপ্তা?—চলুন, যাওয়া যাক্।

সুধাংশুর ব্যক্তিত্বের এই প্রবলতর দিকটা অপরিচিত ছিল। নীনা থমকে গেল।

এমন সময় নরেন এসে মাঝপথে দেখা দিল। সুধাংশু বললে, তোমাদের আসর এবার ভেঙেছে, সুতরাং আর নয়। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

নরেন বললে, চলো, তিনজনেই যাই। মিস গুপ্তাকে আমি পৌঁছে দেবো। ওঁর চরণ বন্দনার পালা আজ আমার ওপরে।

সুধাংশু হাসিমুখে বললে, বেশত, তাহ'লে আমাকে বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। ওখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে আমি বাড়ি যাবো।

মুখখানা কালো ক'রে নীনা ওদের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামতে লাগলো। সুধাংশুর কাছে বিদায় নেবার সাহসও তা'র হোলো না।

এদিকে শ্যামলীর শূন্য রিক্ত ঘরে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে প্রেতছায়ার মতো দল পাকাচ্ছিল। একথা সে কল্পনা করেনি, এই লোকটা নীনার বন্ধু। হঠাৎ এটা আবিষ্কৃত হবার পর ঘৃণায় তা'র নাসা কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। লোকটার সমস্তটাই প্রতারণা সন্দেহ নেই, এবং বৈরাগ্যের অভিনয়ের ফাঁকে কেবল শিকারীর মতো তা'কে মাংসখণ্ডের লোভ দেখিয়ে খানিকটা খেলা ক'রে গেল। লোকটার প্রকাশ্য উদারতার পাশে একটা প্রখর হিসাবী লেকেনদার প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, এটা একেবারে প্রত্যক্ষ।

শিকারীর উপমাটা মনে করতে গিয়ে জন্তু শব্দটা যেন তা'কে পেয়ে বসেছিল। কতক্ষণ ব'সে ব'সে সে যে কীর্তন ভাঁজলো কিছুই তা'র হুঁশ নেই। অন্ধকারে কখন তার অর্ধনিমীলিত দুই চোখের কোণ বেয়ে করুণ কীর্ত্তনের আবেশরস গড়িয়ে এসেছে, সেদিকেও তা'র ভ্রূক্ষেপ ছিলনা। কেবল তা'র মনে হচ্ছিল, চারিদিকের এই অজানা অচেনা বাগানবাড়ির গুহা-গহ্বর থেকে রক্তলোভাতুর বন্যজন্তুর দল ছাড়া পেয়ে এদিক ওদিকে বেরিয়ে পড়েছে। এক সময়ে সে যেন স্পষ্ট অনুভব করলো, অমনি একটা ভয়ানক কালো জন্তু কখন এই তক্তার উপরে উঠে হুমড়ি খেয়ে তা'র গলা টিপে ধরেছে। ভয়ার্ত কণ্ঠে সে ব'লে উঠলো, কে, কে তুমি?

ঘোষাল সাহেব বললেন, চুপ—আমি, চেঁচাসনে।

ছয়

ইলেকট্রিক বেল্-এর আওয়াজটা শুনেই নীনা ছুটতে ছুটতে গিয়ে দরজাটা খুললো।

—এই যে, আসুন—আপনার পায়ের ধুলোয় ঘর দো'র আমার ধন্য হোলো। কিন্তু কী নিষ্ঠুর আপনি, মিঃ রয় ?

অন্দরমহলের দিকে এগিয়ে সুধাংশু বললে, নতুন ক'রে আবার নিষ্ঠুর হলুম কেন ?

নীনা বললে, নয়ত কি ? মেয়েমানুষ না হয় রাগের মুখে দুটো কড়া কথাই বলেছি, তাই ব'লে আপিসের দারোয়ানকে দিয়ে আপনি আমার বকশিসের টাকা পাঠাবেন ?

তাই জন্যেই টাকা ফেরৎ পাঠালেন ?

নিশ্চয় ! টাকা বড় নয়, হাজার টাকার দামই বা কতটুকু ? আপনি হাতে ক'রে আমাকে টাকা দেবেন, সেই টাকারই তো দাম বেশী !

—আসুন—

সুধাংশু বললে, মনের জোর আপনার কম নয়। আমাকে ঠিকই আপনি আসতে বাধ্য করলেন।—কিন্তু—এই ব'লে সে এদিক ওদিক তাকালো।

নীনা বললে, কি চান বলুন ?

চাইনে কিছু। কই, আপনার এখানে আজকে তো আর কাউকে দেখছিনে ?

ওঃ—ব'লে নীনা হাসলো। বললে, না, আজকে আর কেউ আসবেনা। পৃথিবীর কাছে আজ আমার ছুটি। আপনি আসবেন ব'লেই ভূত-প্রেতের দলকে আজ ঢুকতে দিইনি।

সুধাংশু বললে, তাহ'লে তো আপনার খুব ক্ষতি হবে!

ক্ষতিই কেবল আপনার চোখে পড়লো?—নীনা অলক্ষ্যে একবার নিশ্বাস ফেললো। পুনরায় বললে, যদি বলি ক্ষতি হবে না?

ক্ষতি নয়ত কি?—সুধাংশু বললে, এক হাজার টাকা যার কাছে কিছুই নয়, তা'র দৈনিক উপার্জনটা ভাববার কথা বৈ কি। আর তাছাড়া—

সুধাংশু বললে, আমাকে আজ শিগগিরই ফিরতে হবে। দয়া ক'রে টাকাটা আজই আপনি নিন্। সঙ্গে এনেছি।

নীনা বললে, টাকাই আপনি দিতে এসেছেন জানি, আর কোনো দরকারে আসেননি তাও জানি। কিন্তু আজ আপনি একা এলেন, দুঃসাহস কম নয়ত?

সুধাংশু বললে, নিজের ওপর বিশ্বাস থাকলে সাহস আপনি বাড়ে, মিস গুপ্তা!

আপনার স্ত্রী নিশ্চয় জানেন, আপনি এই রকম আত্মবিশ্বাসী?

হ্যাঁ, জানেন বৈ কি।

আপনি একজন মেয়েকে এক হাজার টাকা ব[illegible]স দেবার জন্য তা'র ঘরে এসে ঢুকেছেন, এখবরও তাঁকে বলবেন তো?

একথা তিনি আগেই শুনেছেন আমার মুখে।

নীনা একবার থমকে গেল। তারপর বললে, বাগানবাড়িতে গিয়ে সেদিন সবাইকে লুকিয়ে শ্যামলীর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছেন, আপনার স্ত্রী একথা শুনে কি বললেন?

সুধাংশু হাসলো। হেসে বললে, আপনার মনে একটা ক্ষোভ জমেছে দেখছি। না, স্ত্রী সে খবর এখনো শোনেননি।

নীনা বললে, শোনেননি কেন? তাহলে বলুন স্ত্রীর কাছে আপনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী নন?

সত্যবাদী কিনা তা তিনি পরীক্ষা করেন নি। আমি তাঁর সন্দেহ থেকে মুক্ত।

নীনা হেসে উঠলো। বললে, সে কি? অবাক করলেন আপনি! মেয়েমানুষ হয়ে স্বামীকে সন্দেহ করেননা, এ কি সম্ভব?—নিন্, একটু ভালো হয়ে বসুন। আজ আমার একটা কি কথা মনে হচ্ছিল শুনবেন? শুনলে হয়ত আপনার হাসি পাবে।

সুধাংশু বললে, বেশত, সারাদিন খেটে-খুটে এসেছি, যদি আপনার কথায় একটু হাসতে পারি, মন্দ কি?

আপনার কথাই ভাবছিলুম দুপুরে বসে—নীনা বললে, ভাবছিলুম যারা ঘৃণার পাত্র, তারা তো কোনো মানুষকে ঘৃণা করেনা! আপনার মতন লোকও যদি আমাদের ঘৃণা করে, তাহলে আমাদের দাঁড়াবার ঠাঁই কোথায়?

সুধাংশু তার দিকে তাকালো। বললে, আপনাকে ঘৃণা করি, একথা কে বললে?

কেউ বলেনি, কেবল অনুভব করেছি আপনার কাছাকাছি এসে। বাড়ি বয়ে আপনি টাকা দিতে এসেছেন—দয়ার এই দানকে আপনি বলছেন বকশিস। মিঃ রয়, আপনি বলতে পারেন, অনেক নীচে যে পড়ে রয়েছে, আর অনেক উঁচুতে যে উঠেছে—দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা কি কেবল ঘৃণার? কেবল ঘৃণা আর বকশিস—মানুষের কাছে এছাড়া কি আমাদের আর কিছু পাওনা নেই?—এই ব'লে নীনা মুখ ফিরিয়ে নিল।

সুধাংশু চুপ ক'রে গেল কিয়ৎক্ষণ। এই নারীর মুখে মার্জিত ভাষার ব্যতিক্রম কোনদিন ঘটেনি। একথা স্বীকার্য, এ মেয়েটি বুদ্ধিমতী—কেবল বুদ্ধিমতী নয়, চতুরাও বটে। শিক্ষার পালিশ এর মুখে চোখে, কথায় ভঙ্গীতে এমন ভাবে প্রকাশ পায়—যেটাকে খুব সাধারণ ব'লে মনে হয়না। একদিন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ছিল এটাও যেমন এই নারী ভুলতে পারেনা তেমনি আজ এই দুর্নৈতিক জীবনকে কোথাও গোপন রাখতেও সে রাজী নয়। কোনো নবাগত এবং নূতন পরিচিত বন্ধুকে এরা নিজেদের ঊর্ণনাভে এইভাবে জড়িত করে কিনা সুধাংশুর জানা নেই। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট, সুধাংশুর চিন্তাধারার উপর আধিপত্য করার, প্রভাবিত করার, এবং সর্বপ্রকারে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে তোলার যে সূক্ষ্ম শিল্পকলা, এ মেয়েটির মধ্যে তা'র অসাধারণ চেহারা দেখা যায়। অথচ তা'র এই ভ্রান্তি এবং অধ্যবসায়ে সুধাংশু সজ্ঞানে পলকের জন্যও ইন্ধন প্রয়োগ করেনি। এই শ্রেণীর নারীর পক্ষে সকলের বড় প্রয়োজন হোলো অর্থ ও বিলাস, কিন্তু এই মেয়েটি সুধাংশুর কাছে তা'র কোনটাই হাত পেতে চায়নি—বরং বারম্বারই প্রত্যাখ্যান করেছে। হয়তো এর পিছনে উদ্দেশ্য আরও গভীর এবং কলাকুশলময়, কিন্তু এর বহিপ্রকাশটি এতখানি সৌজন্য ও শালীনতায় ভরা যে প্রশংসা না ক'রে থাকা কঠিন।

এমন সময়ে ব্রিজলাল নতুন পেয়ালায় চা নিয়ে এলো। পেয়ালাটি হাতে করে এগিয়ে দিয়ে নীনা হেসে এক সময় বললে, আমাদের নামে পৃথিবীর সব যুগের মানুষরাই ভয় পায়। আমরা সমাজনীতির তলায় সিঁধ কাটি, লোকের ঘর ভাঙি, মানুষকে পথে বসাই, সবাইকে পাপে ডুবোই। কিন্তু আমরা যে পুরুষ জাতের বিপ্লববুদ্ধিরই সৃষ্টি, একথা

ক'জন মানে বলুন? আমরা যদি না থাকতুম, কত ভদ্রঘরের নৈতিক শুচিতা নষ্ট হোতো, কত পরিবার কলঙ্কের দায়ে উচ্ছন্নে যেতো, কত নিরপরাধ মেয়ে পথে বসতো। অথচ ঘৃণার পাত্রী হলুম আমরা, আমাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ!

সুধাংশু বললে, আপনাদের পক্ষে আরো যুক্তি আছে সন্দেহ নেই কিন্তু যুক্তি যত বড়ই হোক, এ পথে এসে উভয়পক্ষই নীচে নেমেছে, ওপরে ওঠেনি। মানুষের আদিম উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি এখানে প্রশ্রয় পেয়ে দুরন্ত হয়ে ওঠে, তাই দেখে আপনারা হাততালি দেন্। এই আগুনে পোড়বার জন্য পতঙ্গের দল ছুটে আসে চারিদিক থেকে, আপনাদের লক্‌লকে বাসনার শিখা জ্বলতে থাকে দাউ দাউ করে।

নীনা বললে, পচা মড়া রোগের বীজাণু ছড়ায়, চারিদিক দুর্গন্ধে ভরে তোলে, শকুনিরা সেই মড়া খেয়ে ফেলে। আপনি কি বলতে চান্, শকুনিদের কোনো দাম নেই? তারা শুধুই ঘৃণ্য?

সুধাংশু বললে, দাম আছে যতক্ষণ তারা লোকালয়ের বাইরে শ্মশানঘাটের পাশে থাকে। কিন্তু তারা যদি উড়ে এসে গৃহস্থের বাড়ির আনাচে-কানাচে জায়গা নেয়, তখন সবাই তাদের যমদূত বলে তাড়া করে। এই বলে সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

নীনা ফস করে একসময়ে প্রশ্ন করলো, আপনি যেদিন শ্যামলীর ঘরে ঢুকে তাকে টাকা দিয়েছিলেন, সেদিনও কি আপনার এই মনোভাব ছিল?

সুধাংশু হাসিমুখে তার দিকে তাকালো। বললে, আপনার সন্দেহটা বুঝতে পারবোনা, এমন ছেলেমানুষ আমি নই। কিন্তু মিথ্যার কারবার আমার নয়, এটা আপনাকে জানিয়ে রাখি। শ্যামলী টাকা সেদিন চেয়েছিল, তাই টাকা দিয়েছি। যদি সে নাও চাইতো, অথচ আমি দেবার সুযোগ পেতুম, তাহলেও তাকে অনেক টাকা দিতে পারতুম।

উৎকণ্ঠ হয়ে নীনা বললে, নিঃস্বার্থভাবে ?

সুধাংশু একটু ভাবলো। পরে বললে, হ্যাঁ, তাই।

কেন ?

নীনার কণ্ঠে প্রবল উদ্বেগ এবং প্রবলতর ঔৎসুক্য লক্ষ্য করেও সুধাংশু বললে, তাকে দেখে খুশী হয়েছি, সেই কারণে।

কিন্তু তাকে দেখে আপনার মতন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের খুশী হবার তো কিছু নেই! সে পাগল, সে নির্লজ্জ, নোংরা তার কথাবার্তা, ইতর তার আচরণ, অর্থলোভী সে,—আর চেহারার কথা বলতে গেলে তো হাসাহাসি পড়ে যায়—এমন মেয়ের ওপর খুশী হওয়া তো অসুস্থ মনের পরিচয়, মিঃ রয় ?

সুধাংশু চুপ করে চা খেতে লাগলো স্মিতমুখে। নীনা তার কণ্ঠে আরো কিছু সাগ্রহ উত্তাপ যোগ ক'রে বললে, আপনার স্ত্রীর উল্লেখ এখানে খুবই অশোভন। কিন্তু আমি শুনেছি, তিনি মহীয়সী। তাঁর রূপে দেবীপ্রতিমা হার মানে সেকথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু তিনি সকল গুণের অধিকারিণী। আপনি মনে মনেও তাঁর প্রতি কোনো অবিচার অথবা অসম্ভ্রম করতে পারেন, একথা আমার মতন পতিতার পক্ষেও কল্পনা করা কঠিন।

সুধাংশু হেসে উঠে বললে, তবু শ্যামলীকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি এটা খুব আশ্চর্যের কথা, তাই না ?

নীনা বললে, মুগ্ধ হওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব !

কিন্তু পুরুষের মনের ক্ষুধা বিচিত্র, মিস গুপ্তা !

মানলুম। নীনা বললে, কিন্তু যে-ক্ষুধা আপনাকে নীচে নামাবে, আপনার সম্ভ্রম, মর্যাদা নষ্ট করবে—তাকে আপনি প্রশ্রয় দেবেন ? এতে আপনার আত্মসম্মানের প্রশ্ন আছে, মিঃ রয় ?

সুধাংশু আবার কঠিন হয়ে হাসলো। বললে, সেটা আমাকে মনে

করিয়ে দেবার দরকার নেই, মিস গুপ্তা। কয়েকদিন ধরেই এলুম এ পল্লীতে, সেদিন সারাদিন রইলুম বাগানে সকলের মাঝখানে। কিন্তু আমি সুতাই বলবো, এই মেয়েটির আশ্চর্য আবির্ভাব আমাকে অভিভূত করেছে। ওকে দেখে মনে হয়েছে, একমাত্র ওই মেয়ে জীবন্ত, ওর মধ্যে অনন্ত প্রাণধারা, অদ্ভুত প্রতিভাশক্তি!

ঘাড় ফিরিয়ে নীনা বললে, কিন্তু আপনার এই শ্রদ্ধার দাম ওর কাছে কতটুকু তার খবর নিয়েছেন? সেদিন আপনার দেওয়া টাকা সে কাকে যেন বিলিয়ে দিয়েছে, তা জানেন? এরপরেও আপনি—?

হাসিমুখে সুধাংশু বললে, এরপরেও শ্রদ্ধাটা অটুট থাকে কিনা এই আপনি জানতে চান্! কিন্তু তার অন্যায় কোথায়? সে জানে আমি নাকি আপনার দলের লোক, সে জানে পুরুষ মাত্রেই লোভী, কুশলী, স্বার্থপর; সে জানে কোনো পুরুষই স্ত্রীলোকের দাম দিতে জানেনা—সুতরাং অপমান যদি সে করে থাকে করেছে সেই কুকুরদের; আমাকে নয়।—আচ্ছা, এবার আমি উঠবো, মিস গুপ্তা।

নীনা চমকে উঠলো। বললে, উঠবেন? কই, আপনার সঙ্গে কোনো কথা হোলো না তো?

বেশ, আর একদিন দেখা হবে।—বলে পকেট থেকে একখানা চেক্ বার করে সুধাংশু বললে, এই নিন। এটা দানও নয়, বকশিসও নয়—এ আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন—উপহার! যদি আর দেখা নাও হয়, এই কথাটা মনে রাখবো—আপনার অনুগ্রহে আমি সত্যি সত্যিই উপকৃত।

নীনার গলাটা একটু কেঁপে উঠলো। বললে, আপনার কি একবারও সন্দেহ হয়নি যে, টাকা আমি চাইনি? টাকায় আমার দরকার নেই?

সুধাংশু উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো। বললে, এমন মিথ্যে সন্দেহ করবো কেন, মিস গুপ্তা?

যারা আপনার যোগ্য মর্যাদা দিতে চায়, আপনি বুঝি টাকা দিয়ে তার প্রতিদান দেন?

না—সুধাংশু বললে, কিন্তু এখানে দিই—যেখানে টাকায় মনুষ্যত্ব কেনাবেচা চলে, যেখানে টাকার বদলে ভালোবাসার কারবার।

কিন্তু আমি তো টাকা চাইনি, চেয়েছিলুম বন্ধুত্ব।

বন্ধুর সংখ্যা আপনার কম নয়, মিস গুপ্তা। তাছাড়া আমার বন্ধুরা আসেন আপনার এখানে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, আমার পক্ষে আনাগোনা সম্ভব নয়!

নীনা একটু কঠিন কণ্ঠে বললে, একটি মেয়েকে লাথি মেরে চলে যাবার চেষ্টাই কি চরিত্রবান সাজবার পদ্ধতি মিঃ রয়?

সুধাংশু থমকে দাঁড়ালো। বললে, দুশ্চরিত্র আমি হতে পারিনি, সেটা আমার অক্ষমতা। কিন্তু শুনেছি আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে, শিক্ষিত—মার্জিত। অদ্ভুত জীবনযাত্রায় আপনি নেমে এসেছেন। এখন আপনি কয়েকজন পুরুষের খেয়ালের খেলা! তারা নাকি আপনাদের এখানে ভালোবাসা পেতে আসে। জানে মিথ্যে, জানে হাস্যকর, জানে এর চেয়ে ছেলেমানুষী আর কিছু নেই—তবু নেশার সঙ্গে নেশার যোগে তারা এই বস্তুটার কল্পনায় নাকি আমোদ পায়। আমি এতে আমোদ পাইনে, সেটা তো আমার অপরাধ নয়!

আমোদ নিশ্চয় শ্যামলীর কাছে আপনি পেতে চান

সেটা আমোদ নয়, মিস গুপ্তা [illegible]!

নীনা তিক্ত হাস্যে বললে, অত্যন্ত আশা ভঙ্গ হবে আপনার। কারণ শ্যামলীর মতন জঘন্য মেয়েমানুষ জানে কি, আমোদ আর আনন্দে কত তফাৎ? তা ছাড়া আপনি সেদিন থেকেই তার কাছে ঘৃণার পাত্র! যদি কোনোদিন সেখানে আনন্দ পেতে চেষ্টা করেন, টাকা দিয়েই পেতে হবে। আর সে-চেষ্টা করতে গেলে আপনি ঠকবেন!

সুধাংশু এবার হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, আপনার কথা সত্যি হলেও দুঃখিত হবোনা। নাবালকরাও একথা জানে, এপাড়ায় এসে ভদ্রলোকরাই ঠকে যায়। আচ্ছা, নমস্কার!

সুধাংশু সটান বেরিয়ে ড্রয়িং রুম পেরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় এলো। কিন্তু তখনও নীনা তার সঙ্গ ছাড়েনি—সে সঙ্গে সঙ্গে এলো সিঁড়ির কাছে। এক সময় পিছন থেকে যেন বিপন্নকণ্ঠে সে বললে, শেষকালে আমার একটা কথা রাখবেন, সুধাংশুবাবু?

নিজের নামটা প্রথম তা'র মুখে শুনে সুধাংশু ফিরে তাকালো। অন্ধকারেও নীনার চোখ দুটোকে কেমন যেন অসহায় মনে হোলো।

নীনা বললে, আপনার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হোলো এগুলো যেন নরেনবাবুর কানে ওঠেনা!

সুধাংশু বললে, আপনার এ-অনুরোধ আমি বোধ হয় রাখতে পারবোনা, মিস গুপ্তা।

পারবেন না?

না। কারণ একথাটা তো তাদের আমি সহজেই বলতে পারবো, আজ সন্ধ্যায় আমার ভগ্নীর সঙ্গে ব'সে ঘণ্টাদুই আলাপ ক'রে এসেছি।

ভগ্নী!

হ্যাঁ—সুধাংশু তা'র দিকে চেয়ে শান্ত হাসি হাসলো। পুনরায় বললে, গোড়া থেকে এই আমার মনের কথা, এই সম্পর্কটাই তুমি অন্তরের সঙ্গে মেনে নিও, নীনা।—ব'লে সে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে হন্ হন্ ক'রে নেমে গেল।

নীনা স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়ালো। অকস্মাৎ আচমকা একটা প্রবল আওয়াজের পর কান দু'টোর মধ্যে যেমন তার প্রতিক্রিয়া হয়, নীনা

যেন সেই প্রকার বিমূঢ় হয়ে রইলো। ওই একটা শব্দ পৃথিবীর আর সকল শব্দমানতাকে ডুবিয়ে ঝিম ঝিম ক'রে তা'র দুই কান ভ'রে বাজতে লাগলো। হঠাৎ মনে হোলো, তা'র সর্বশরীর, সমস্ত মন এবং সমস্ত রক্তকণিকাগুলি যেন কদর্য অশুচিতায় ভ'রে উঠেছে। কিন্তু সে পলকের জন্য। তারপর তা'র সমগ্র চেতনাকে অভিভূত ক'রে এক-প্রকার বিচিত্র অনুভূতি তা'র গভীর সত্তাকে নূতন আলোকধাঁধাঁয় আচ্ছন্ন ক'রে অন্ধকারে তাকে দিশাহারা ক'রে তুললো।

···সাত···

ব্যবসায়ীর জীবনধারা স্বভাবতই আঁকাবাঁকা চলে—তার উত্থান-পতনের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনটা অভ্যস্ত। কিন্তু, বলা বাহুল্য, অভ্যস্ত ব'লেই তা'র বৈচিত্র্য কম। এতদিন পরে সুধাংশুর জীবনপ্রবাহে যদি সহসা একটা আবর্ত দেখা দিয়ে থাকে, সেটাকে দৈব ঘটনা বলতে পারা যায়।

সঙ্গীত জগতে সে অপরিচিত, এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে সে অজ্ঞ। কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রীটের কলকোলাহলময় জনস্রোতের আশেপাশেও যদি কোথাও কারো কণ্ঠের গানের একটা কলি তার কানে আসে তবে সে উৎকর্ণ হয়, যদি কীর্তনের কলি শোনে তবে কথাই নেই—উন্মুখ হয়ে ওঠে। এটা তা'র পক্ষে একটা বৈচিত্র্য বৈ কি, এটা নতুন ক্লাস। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন স্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিল, অনেকদিন আগে শুনেছিলুম তুমি নাকি গান জানো, একটা গাইবে?

পদ্মাবতী মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা'র মানে?

মানে—গান শুনতে চাই, গান আমার খুব ভালো লাগে, বড়বউ।

কই, একথা আগে তোমার মুখ থেকে শুনিনি তো?

শোনোনি, কারণ ইচ্ছেগুলো মনের গুহায় অনেক সময় লুকিয়ে থাকে, হয়ত যুগযুগান্তর পরে হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়ে। গান, কেত্তন—এসব আমার এত ভালো লাগে আগে কি জানতুম?

পদ্মাবতী বললে, এখন জানলে কেমন ক'রে?

সুধাংশু থমকে গেল। প্রশ্নটা সুস্পষ্ট, হয়ত বা অর্থপূর্ণ। কিন্তু সোজা উত্তরটা এড়িয়ে সে বললে, বড়বউ, অনেককাল ধ'রে পরিশ্রম করলুম, একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়েও তুললুম—পারিবারিক জীবনটাও একপ্রকার গুছিয়ে তুলেছি। কিন্তু কি জানো, নিজের দিকে কোনোকালে চোখ পড়েনি, ভেতরটা যেন কেমন শুকনো মনে হয়।

সম্প্রতি পদ্মাবতী স্বামীর চিত্তবৈলক্ষণ্যের একটা আভাস পাচ্ছিল কিছুদিন থেকে। সুধাংশুর স্বভাবের অলিগলি তা'র জানা ছিল, সমস্ত লক্ষণগুলি ছিল তার পরিচিত। কিন্তু এমন চেহারাটা অভিনব বৈ কি। হয়ত মানুষের অন্তর-জগতের রহস্যটা অগম্য, তাই মনে ক'রে পদ্মাবতী এ নিয়ে কোনো অস্বস্তি বোধ করেনি। কিন্তু হঠাৎ একবার সেই রহস্যময়তার সঙ্কেত যখন স্বামীর আন্তররহস্যপথ বেয়ে ছিটকে বাইরে আসে, পদ্মাবতীর মুখে চোখে একটা অনির্দিষ্ট ভাবনা দেখা দেয়। আজ সেই ভাবনাই প্রকট হয়ে উঠলো।

পদ্মাবতী বললে, তোমার কি কাজকর্ম ভালো লাগছেনা?

সুধাংশু বললে, কাজকর্মটাই জীবন—সেটা ভালো না লাগা মানে মনের অসুস্থতা। কিন্তু তা নয় বড়বউ, আমি ভাবছি এর পরে কি আর কিছু দেনাপাওনা নেই? মানুষ কি কেবল কাজ নিয়েই খুশী থাকবে।

পদ্মাবতী বললে, একথা কেন? তোমার কাজ, তোমার সংসার, তোমার এত ঐশ্বর্য, তোমাকে ঘিরে এত লোক অন্নসংস্থান করছে, আমরা সবাই তোমার দিকে চেয়ে বেঁচে রয়েছি—এই তো তোমার আনন্দ!

সুধাংশু বললে, না বড়বউ, ধরতে পারোনি।

কেন ?

তোমার মতন যার স্ত্রী সে ভাগ্যবান—

বাধা দিয়ে বড়বউ বললে, থামো—স্ত্রীর সুখ্যাতি স্ত্রীর মুখের কাছে করলে কেবল লজ্জা করেনা, ভয়ও করে। ওকথাটা আর তুলোনা।

সুধাংশু হেসে বললে, আমার উচ্ছ্বাসকে বাধা দিয়ে দিয়েই তুমি আমাকে উত্তাল করে তুলেছ। দু' একটা ভালোবাসার কথা তুমি সইতে পারোনা, বাগানে গিয়ে চাঁদের আলোয় বসে দু'কথা বললে তুমি তাকে বলো পাগলামি, একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে তোমার লোকনিন্দের ভয়। যদি তোমাকে সমাদর জানাতে যাই তাহলেও তুমি আড়ষ্ট হয়ে ওঠো। কিন্তু জানো তো, পুরুষ মানুষের প্রাণশক্তির ফেনা ফুটতে না পারলে গুমরে মরে, বড়বউ। সেটার ফল অনেক সময় ভালো হয় না।

সেদিনকার আলোচনাটা ওখানেই থেমে গেল। কিন্তু আলাপটা থামলেও অস্বস্তিটা পদ্মাবতীর মনে রয়ে গেল। তার চোখের সামনে এই যে একটা মস্ত বড় সংসার—দাসদাসী, আত্মীয়পরিজন, সুখ দুঃখ—সমস্তর সমন্বয় নিয়ে এই যে একটা সমাজ—এর ভিত্তি হোলো তাদের স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণবুদ্ধির উপর; কারণ সংসার ও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্রয় হোলো মানুষের মন। সেই মন যদি টলে, যদি সংশয়ের আঘাতে সেই মন আহত-প্রতিহত হয়, তবে জীবনের স্থিরতা আর নিশ্চয়তা কোথায় ? এই দুর্ভাবনাটাই পদ্মাবতীকে কিছুকাল থেকে পেয়ে বসেছিল।

একদিন সে প্রশ্ন করে বসলো, তুমি তো আমার কাছে কোনদিন কোনো কথা গোপন করোনি ?

সুধাংশু বললে, না বড়বউ !

পদ্মাবতী মুখ তুলে বললে, তুমি কি নীনা গুপ্তাদের ওখানে প্রায়ই যাও?

তোমার একথার মানে?

মানে সহজে বুঝতে পারো। তোমার মনে নিরানন্দর জন্ম হোলো কেন, সেই কারণটা যদি খুঁজে বেড়াই, তবে দোষ কি?

সুধাংশু হেসে উঠলো। বললে, বড়বউ, এখানে তুমি হার মানলে। নিজের 'পরে তোমার বিশ্বাস কম, কিন্তু তোমার 'পরে আমার বিশ্বাস অনেক বেশী। বয়স আমার কম হয়নি, নিজে আমি কারবারি লোক, সুতরাং লোভের পরিণামটা অনায়াসে বুঝতে পারি।

পদ্মাবতী বললে, স্পষ্ট করে কথাটার উত্তর দাও।

স্পষ্ট করেই দেবো। নিরানন্দ আমার এসেছে কিছুকাল থেকে। কিন্তু তাই ব'লে আঁস্তাকুড়ে আসন পেতে আনন্দ চাইবো, তোমার এত বড় অসম্মান কিছুতেই হতে দেবো না বড়বউ। ও-ভয় তুমি করো না। আর নীনা গুপ্তা?—সুধাংশু হেসে বললে, হ্যাঁ সত্যি—নীনা গুপ্তা আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিল—মেয়েটি সত্যিই আমার উপকার করেছে, —কিন্তু তাকে যে-কথা দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছি, সেই দৃঢ়তা তোমারই কাছ থেকে পাওয়া। তাকে বলেছি, নীনা, তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যাখ্যা আলাদা—সুতরাং ভাই-বোনে সেই বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়। তুমি জানো বড়বউ, মেয়েটি সেই থেকে আমাকে দাদা বলে, মনে প্রাণে।

স্বামীকে পদ্মাবতী বিশ্বাস করে বৈ কি। সুতরাং যে-দুর্ভাবনার গুরুভার বোঝাটা ছিল চেপে, সেটা অনেকখানি যেন হালকা হয়ে গেল।

অফিসে এসে যখন সুধাংশু পৌঁছল তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। আজ তার শরীরটা ভালো ছিল না। নরেন গেছে বিদেশে একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের টাকা আদায় করতে। অফিসে কাজ জমে গেছে

অনেক। ঘণ্টা দুই ধরে সই-সাবুদ, কাগজপত্র নাড়াচাড়া, টেলিফোন আর কর্মচারী মহলে উপদেশ বিতরণ—এই সব নিয়ে চললো। তারপর তার ঘরে চাপরাশি এসে ঢুকে সেলাম জানালো। বললে, একজন বাবু এসে সকাল থেকে বসে রয়েছে।

মুখ তুলে সুধাংশু বললে, কে?

নাম বলেন নি, হুজুর।

ডেকে আনো।

চাপরাশি বেরিয়ে গেল, এবং একটু পরেই একটি যুবক এসে ঢুকলো তার ঘরে। নমস্কার করে একপাশে দাঁড়ালো।

সুধাংশু শান্তকণ্ঠে বললে, কি চাই?

সে বললে, আমার নাম বিনয়। আপনিই কি মিঃ রয়?

হ্যাঁ, বসুন চেয়ারে।—তারপরেই একটু থেমে সুধাংশু বললে, সম্প্রতি চার পাঁচজন কেরাণী আমাদের অফিসে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন কোনো কাজ তো খালি নেই! আপনি কি কাজ করতে পারেন?

বিনয় বললে, আজ্ঞে, আমি চাকরির চেষ্টায় আসিনি।

ওঃ, তবে?—সুধাংশু তার মুখের দিকে তাকালো। চেহারাটা তার সুশ্রী, স্বাস্থ্য ভালো। এবং কেবল তাই নয় সাধারণ বাঙালী ছেলের পক্ষে এমন রূপবান ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হওয়া অনেকটা দুর্লভ। চোখ দুটো টানা, বড় বড়, এবং উদার।

বিনয় একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে একখানা চিঠি বা'র করে সুধাংশুর দিকে এগিয়ে দিল। চিঠিখানা খুলে পড়তে পড়তে সুধাংশুর মুখখানা কঠিন ও নির্মম হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু মুখের ভাব গোপন করে সে বললে, টাকা কি শ্যামলীর নিজের দরকার?

বিনয় বললে, আপনার কাছে বলতে লজ্জা পাই।

আপনার সঙ্গে শ্যামলীর কতদিনের আলাপ?

আমারই সঙ্গে সে বছর চারেক আগে নবদ্বীপ থেকে এখানে চলে আসে।

সুধাংশু প্রশ্ন করলো, আপনি বিয়ে করেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার তিনটি ছেলেমেয়ে।

কিন্তু একটি মেয়ের টাকাকড়ি শোষণ ক'রে আপনি নিজের সংসার চালান, নেশা করেন, জুয়া খেলেন, মন্দ পথে টাকা ওড়ান—এতে আপনার আত্মসম্মানে বাধে না? আপনি তো ভদ্রসন্তান।

বিনয় বললে, আপনি যা বললেন এটা কিন্তু শ্যামলীর মনের কথা নয়!

কি রকম?

সে আমাকে গালাগালি দেয় বটে কিন্তু যথাসর্বস্বও দিয়ে দেয়।

সুধাংশু প্রশ্ন করলে, তার মানে?

বিনয় হাসলো। বললে, আপনার মতন তিরস্কার আমি অনেকের মুখে শুনেছি। অনেক ঈর্ষার কাঁটা আমি মাড়িয়ে গেছি। কিন্তু কি জানেন, একটি মেয়ে দিনরাত আমার কাছে পড়ে সর্বস্বান্ত হ'তে চায়। তার গান, তার কীর্তন, তার টাকাকড়ি, তার জীবন-যৌবন—সব আমার হাতে তুলে না দিলে তার আনন্দ নেই—

এই কথাগুলো বাইরের লোকের কাছে বলতে আপনার বাধে না?

বিনয় বললে, না, সত্যিই বলেই বাধে না। অনেকবার আমি তাকে ছাড়তে চেষ্টা করেছি, অনেকবার তাকে আঘাত করে দূরে যেতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। মেয়েছেলের প্রচণ্ড আসক্তির বাঁধন জানেন তো? তারা মরে, কিন্তু বাঁধন কাটেনা।

সুধাংশু বললে, আপনার নামে যে সব দুর্নাম আছে, সে কি সব জানে?

বিনয় বললে, হ্যাঁ, সমস্তই সে জানে। আমি তিনবার জেল খেটেছি

চুরি-দারির দায়ে, কেউ কেউ আমার জন্যে পথে বসেছে এমন বদনামও আমার আছে। কিন্তু শ্যামলী সেগুলো রঙে-রসে নিজের কাছে মনোহর করে তুলেছে। উৎপীড়ন সে সয়েছে আমার হাতে অনেক আমি যে হীন সে জানেনা তা নয়—কিন্তু তবু আমাকে ছেড়ে দেয়নি।

সুধাংশু বললে, তাহলে এটাকা সে আপনারই জন্যে চেয়েছে?

বিনয় হাসিমুখে বললে, নিশ্চয়!

যদি টাকা না দিই?

তাহলে চলে যাবো—পীড়াপীড়ি করবো না। সে শুধু জানবে, আপনি একজন ব্যবসাদার। আপনি বদান্যতার প্রতিদান চান। সে অন্য চেষ্টা পাবে।

সুধাংশু বিনয়ের মুখের দিকে তাকালো। লজ্জা অথবা আড়ষ্টতার আভাসমাত্র ছোকরার মুখে চোখে নেই। একটা স্পর্ধিত সরলতার সঙ্গে সে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে বললে, আপনার সঙ্গে শ্যামলীর আলাপ হয়েছিল একথা শুনেছি। আপনি তাকে কথা দিয়েছেন, অভাব অভিযোগের সময় আপনাকে জানাতে, আপনি সাহায্য করবেন। যদি না করেন সে কেবল হাসবে। জানবে আপনি শতকরা নিরানব্বইয়েরই একজন!

সুধাংশু বললে, এত তার নিজের অভাব নয়!

বিনয় হাসলো। বললে, স্ত্রীলোকের মনের অলিগলি বোধ হয় আপনার জানা নেই। একটা কথা বোধ হয় বোঝা আপনার পক্ষে কঠিন, আমার অভাব মানেই তার অভাব,—আমাকে বাদ দিয়ে তার আর কোনো মানবধর্ম নেই।

সুধাংশু বললে, বুঝতে পারি সে আপনাকে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু আপনি? আপনি তাকে কী চোখে দেখেন শুনি?

এ প্রশ্ন ওঠেনা, মিঃ রয় ?

কেন ?

পুরুষের প্রভুত্বের কাছে যে-মেয়ে নতজানু থাকে, সেই মেয়েই পুরুষের দয়া পায় !

সুধাংশু বললে, আমি জানতে চাই আপনি শ্যামলীকে ভালোবাসেন কিনা।

বিনয় হেসে উঠলো। বললে, আমি জেল-খাটা আসামী, নেশাখোর, জুয়াড়ি, পরস্বাপহারী—আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি কিনা, আপনার মতন বুদ্ধিমান লোক একথা জানতে চান কেন? বরং জিজ্ঞেস করুন, আমি তাকে কতটুকু কম উৎপীড়ন করি।

তাহলে আপনি বিশ্বাসঘাতক বলুন ?

বিনয় বললে, পৃথিবীর কোনো পুরুষ কোনো মেয়ের কাছে বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে জানেন ?

ক্ষণকালের জন্য সুধাংশু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর ড্রয়ার খুলে পঞ্চাশটি টাকা বার করে বিনয়ের হাতে দিয়ে বললে, নিয়ে যান।

টাকা নিয়ে বিনয় উঠে দাঁড়ালো। তারপর সহসা সে প্রশ্ন করলো, এ টাকা আপনি দিলেন কেন, মিঃ রয় ?

সুধাংশু বললে, তার মানে ?

আপনি কি নিঃস্বার্থভাবে দান করছেন ?

অনেকটা।

আপনি কি শ্যামলীর সম্পর্কে কোন আশা রাখেন ?

অবশ্যই।

কিন্তু যদি আপনার আশা ভঙ্গ হয় ?

হবেনা—আমি জানি।

বিনয় বললে, আমি যদি বাধা দিই ?

সুধাংশু হেসে বললে, আপনি চণ্ডাল তাই প্রবৃত্তির খেলা ছাড়া আর কোনো খেলা আপনার জানা নেই। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে আপনি পৌঁছতেও পারবেন না।

বিনয় হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিজের কথাটা সুধাংশুর নিজের কানের মধ্যেই কিয়ৎক্ষণ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। টাকা সে দিল কেন—বিনয়ের এই প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে তার মনে হচ্ছিল। নিঃস্বার্থভাবেই সে দিয়েছে, কিন্তু নিঃস্বার্থতার নিরীখ কি তার নিজেরই স্পষ্ট জানা আছে ? আজকে যার কীর্তনে সে মুগ্ধ হয়েছে, আগামী কাল তার মিষ্টবাক্যে এবং আচরণে সে মুগ্ধ হবেনা, একথা কে বলবে ? ব্যবসায়ী প্রকৃতি তার, লেন-দেন কারবারেই সে অভ্যস্ত। বিনয়ের হাতে তুলে দেওয়া এই টাকাটা সে যে আর একজনের বিবেকের কাছে গচ্ছিত রাখলো না—একথা কি সে নিজেই হলপ করে বলতে পারে ? তাছাড়া শ্যামলীর সম্পর্কে সে কী আশা পোষণ করে ? একজন পতিতা, নষ্টচরিত্রা নারী সম্পর্কে কোন কল্পনাকে সে প্রশ্রয় দিতে পারে ? তার ভালোবাসা পাওয়া, তার হৃদয় জয় করা, তাকে মুগ্ধ করা, —এর কি কোন দাম আছে ? অর্থলালসায় যে কাঙালিনী আত্মবিক্রয়ের জন্য সর্বদা প্রস্তুত, তার সঙ্গে হৃদয়ের খেলা ? তাছাড়া প্রবৃত্তির খেলা ভিন্ন আর কোন্ খেলা জমতে পারে বারনারীর সঙ্গে ? যদি তার সঙ্গে কোনোকালে ঘনিষ্ঠতা হয়, তবে সেখানে প্রবৃত্তির খেলাই তো সেতুবন্ধ !

নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের আত্মপ্রতারণাকে বিচার করে অতি করুণায় সুধাংশু হাসতে লাগলো। উঁচু গলায় বিনয়কে দুটো কথা শুনিয়ে সে বললে, সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে আর কা'রো পৌঁছানো সাধ্য নয় ! তার একথার অর্থ কি ? বিনয় বিত্তহীন, আর সে সুধাংশু রায়—

বিত্তশালী। অর্থের প্রাবল্যে পাত্তাঁর মনকে অভিভূত করা যায়, এই কথাই কি জোরের সঙ্গে সে বিনয়কে শুনিয়ে দিল? শেষ অবধি ভালোবাসার কারবারে এক দাগী জেলখাটা আসামীর সঙ্গে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে?

সেই পুরনো কথাটাই আবার তার মনে পড়লো। ঘরে তার মহীয়সী লক্ষ্মীস্বরূপিনী স্ত্রী! রূপের রঙের ক্ষুধা তার নেই, বাসনার পিপাসা অপর কোথাও সে অনুভব করেনি; স্বভাবের পেলবতা, আচরণের মাধুর্য, গুণগরিমার অনির্বচনীয় শুচিতা—নারীর এই গুণগুলির সহিত সুদীর্ঘকাল ধরে সে পরিচিত। আজ সেই কল্যাণরূপিনী স্ত্রীকে সরিয়ে অন্য কোনোদিকে তার দৃষ্টি পড়ার কথা নয়। তার জীবন নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ।

দিন কয়েক পরে সুধাংশুর টেবলের উপর ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে কানে ধরে সুধাংশু সাড়া দিল, হ্যালো, কে?

টেলিফোনে নারীকণ্ঠে জবাব এল, আমি, তোমার ভগ্নী।

কে, নীনা?

উত্তরে হাসির ঝলক ভেসে এল বায়ুতরঙ্গের মতো। নীনা বললে, অভাগী বোনের বাড়ি পায়ের ধুলো দেওয়া কি এত বড় পাপ?

সুধাংশু ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, সেকি কথা? বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলুম—যাবো বৈ কি তোমার ওখানে!

নীনা বললে, বিশেষ দরকার, কবে আসবে?

আসছে কাল বিকেলে।

ঠিক এসো কিন্তু, ভুলবেনা তো দাদা?

না বোন, ঠিক যাবো আমি।

স্টিভেন্স সাহেব কাগজপত্র নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। তার পিছনে

পিছনে এলো দুটি মেয়ে-টাইপিস্ট। সুধাংশু রিসিভারটা রেখে দিয়ে কয়েকখানা চিঠিপত্রে সই ক'রে দিল।

একটি মেয়ে কাজ নিয়ে বেরিয়ে গেল, মিস চ্যাটার্জি রইল দাঁড়িয়ে। ষ্টিভেন্স একটু হেসে বললে, আমার আর্জিটার কি করলে?

সুধাংশু হাসিমুখে বললে, কোন আর্জি?

ও, তুমি তবে আমাকে ছুটি দিতে চাওনা, কেমন?

আবার সেই ছুটির কথা? ছুটি নিয়ে করবে কি শুনি?

ষ্টিভেন্স বললে, ইউ নটি ফেলা! আমাকে বাড়ি যেতে তুমি দেবেনা বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে রেখো আমি একদিন চুপি চুপি পালিয়ে যাবো —এই বলে বুড়ো রাগে গস গস করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোন বাজলো। রিসিভার তুলে নিয়ে বললে, হ্যালো, ইয়েস—স্পিকিং…

হাতে একখানা কাগজ নিয়ে মিস চ্যাটার্জি নিঃশব্দ নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

সুধাংশু ফোনে বললে, কত? সাত আনা এক পাই? কিন্তু চমনলালের দর এক পাই বেশী।…না, আমরা ও দরে পারবোনা। অল রাইট্‌!—সে ফোন ছেড়ে দিল।

কাগজখানার দিকে তাকিয়ে সুধাংশু বললে, বসুন, কি বলছেন?

একটা কথা বলছিলুম আপনাকে।—বলে মিস চ্যাটার্জি কুণ্ঠিতভাবে চেয়ারে বসলো। তার মুখের একপাশে চুলের ঝাঁকের মধ্যে থেকেও একটু রক্তাভাস দেখা গেল।

সুধাংশু তার দিকে তাকাল।

মিস চ্যাটার্জি বললে, আমাকে অনুমতি করুন, আপনার কাজে আমি জবাব দিতে চাই।

সে কি, কেন?

মিস চাটার্জি চুপ ক'রে রইল।

সুধাংশু বললে, আপনি এক বছর কাজ করলেন। কাজও শিখেছেন ভালো, মাইনেও বেড়েছে আপনার। তবে যাবেন কেন?

মুখ তুলে এবার হৈমন্তী বললে, একটা বিশেষ কারণেই আর আমার এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

সুধাংশু বললে, এখানে কি আপনার কেউ অমর্যাদা করেছে?

আজ্ঞে না, মোটেই না।

আপনি চাকুরী জীবিকা নিয়েছেন, উপার্জন করতে নেমেছেন, এখানে কাজ না করলেও অন্যত্র আপনাকে কাজ করতে হবে। কিন্তু এখানকার চেয়েও তো অন্যত্র আপনার অসুবিধে হতে পারে!

হৈমন্তী এবার লজ্জানম্র মুখে বললে, আজ্ঞে, কাজ আর আমি কোথাও করবো না।

সুধাংশু বললে, কেন বলুনতো?

হৈমন্তী কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে রইল। তারপর জড়তা কাটিয়ে সলজ্জভাবে বললে, এই মাসের পঁচিশ তারিখে আমার বিবাহের ঠিক হয়েছে—সুতরাং —এই বলে সে সুধাংশুর হাতের কাছে তা'র কাগজখানা এগিয়ে দিল।

কাগজখানায় কিয়ৎক্ষণ চোখ বুলিয়ে সুধাংশু তার সহাস্য মুখ তুলে বললে, এ অবিশ্যি আপনার ব্যক্তিগত কথা। তবে আপনার মতন একজন প্রকৃত কর্মীকে ছাড়তে আমাদের একটু কষ্টই হবে। যাই হোক, আটদিনের জন্য আপনাকে আর কষ্ট করে আনাগোনা করতে হবে না। আপনাকে আজই ছুটি দিচ্ছি।

হৈমন্তী বললে, কিন্তু—

সেজন্য আপনার দুশ্চিন্তা নেই। আপনি এ মাসের মাইনে পুরো পাবেন, এবং আপনার বিয়ের খরচের জন্য আর একমাসেরও নিয়ে যান।

সহসা হৈমন্তীর উজ্জ্বল মুখে ধন্যবাদের ভাষাটা এসে পৌছলো না।

কেবল বন্ধুত্বে, আমি এতটা আশা করিনি, স্যর। কিন্তু এ-অনুগ্রহ পাবার অধিকার কি আমার আছে?

সুধাংশু বললে, আছে বৈ কি। ভগ্নীর বিয়েতে ভায়ের হাত থেকে যৎকিঞ্চিৎ উপহার নিলে অধিকারের কথা ওঠে না। আপনি কাজ গুছিয়ে নিনগে, আমি এখুনি চেক্ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নত নমস্কারে তার মনের সমস্ত কৃতজ্ঞতাটুকু ঢেলে দিয়ে হৈমন্তী আরক্ত হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন পরে লোকজটলার মাঝখান থেকে বেরিয়ে রয় এণ্ড ষ্টিভেন্স নামক বিরাট কারবারের মালিক সুধাংশু রায়ের সহসা মনে হোলো, সে বেকার। নীচে নেমে সে দেখলো তার গাড়ি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই সে বললে, তুমি ফিরে যাও, আমার যেতে দেরি আছে। ব্যাঙ্কে কাজ সেরে যাবো।—এই ব'লে পূবদিকের বড় রাস্তাটা ধরে সে হন্ হন্ করে চলতে লাগলো।

সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। রাজপথে লোকারণ্য। তার ভিতরে এসে সুধাংশু যেন হাঁপ ফেলে বাঁচলো। বিলাতগামী এক জাহাজের একটা বড় অর্ডার সম্পর্কে তদ্বির-তদারক করার আজ কথা ছিল, সেই জরুরী কাজটাও আজ হয়ে উঠলো না। নরেন আজও এসে পৌঁছয়নি, তাকে একটা টেলিগ্রাম করার কথা। শেয়ার মার্কেটে তার যে এজেণ্ট গিয়েছে, তার রিপোর্ট আজ নেওয়া হোলো না। কেবল তাই নয়, তার নিজের বাড়ির জন্য আজ পদ্মাবতী হাতে কিছু টাকা দেবার দরকার ছিল, তাও স্থগিত রইলো।

নিরুদ্দেশভাবে কিছুক্ষণ ধরে সে চলতে লাগলো। একথা অস্পষ্ট নয়, বিনয়ের মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনাটা ছিল তার মনে মনে। বিনয় প্রতারক, বিনয় লোভী, বিনয় দুষ্টপ্রকৃতি। কিন্তু বিনয়ের মন্তব্যগুলি যেন তারই অন্তরের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি। শ্যামলী

তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, শ্যামলী তাকে অভিভূত করেছে! কিন্তু মাঝখানে যে-বস্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে সে কি লোভ, সে কি মোহ? শ্যামলীর অনুরোধে বিনয়কে সে টাকা দিল, তার সেই বদান্যতা কি প্রকৃতই শ্যামলীকে খুশী করার জন্য? কী পাবে সে শ্যামলীর কাছে? পথের একজন পতিতার কাছে সাধারণত কী পাওয়া যায়?

কালো দুটি বড় বড় চোখ, ঋজু নিটোল কঠিন দেহ যেন বেত্রলতা, ঘনশ্যাম মুখখানির চতুর্দিকে কালো এলো চুল যেন অমাবস্যার ধারা, কণ্ঠে সঙ্গীতের আনন্দমাধুর্যস্রোত—শ্যামলীকে তার আশ্চর্য লেগেছে। তার নাচের আনন্দ সুধাংশু দেখেছে বসে বসে, তার কণ্ঠের কীর্তনরসসাগরে অবগাহন করেছে,—তার তো তুলনা নেই! সে পতিতা, কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টিতে অতিক্রম করেছে নিজের পারিপার্শ্বিককে। সে দেহোপজীবিনী, কিন্তু তবু তার প্রাণের ঐশ্বর্য তাকে তুলে নিয়ে গেছে কোনো দেহাতিক্রান্ত আধ্যাত্মলোকে।

সুধাংশু শক্তি আহরণ করলো। শ্যামলীকে তার ভালো লেগেছে। সংসারে ভালো লাগার দাম কি এতই কম? বিনয়কে সে টাকা দিয়েছে, টাকা না দিয়ে তাড়ালে কি তার পৌরুষ এতই অব্যাহত থাকতো? যেখানে পদে পদে সংশয়, পদে পদে ভয়, সেখানেই তো অবমাননা। উদারবুদ্ধি যেখানে ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানেই ঈর্ষার জন্ম—একথা কে না জানে। আর—ঈর্ষাকে সে আপন চেতনার পরিধির মধ্যে প্রশ্রয় দেবে—এতখানি হাস্যকর ক্ষুদ্রতা তার তো নেই! সুধাংশু যেন মনে মনে আপন আদর্শকে খুঁজে বার করলো।

তার পাদুটো তাকে অন্যমনস্কভাবে কোথায় টেনে এনেছে এতক্ষণ সে বুঝতে পারেনি। এতক্ষণ পরে সহসা সে চেয়ে দেখলো নীনাদের ফ্ল্যাটবাড়ির নীচেই সে দাঁড়িয়ে। একথা সে ভোলেনি, আগামী কাল

নীনার এখানে তার আমন্ত্রণ। আজ অনাহূত অনাদৃতভাবে তার এখানে আসবার কথা নয়। কিন্তু নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে সে অনভ্যস্ত। আপিস থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারকে এড়িয়ে সে যে নিজের মনে হাঁটতে শুরু করেছিল, সে কেবল এখানেই আসবার জন্য একথা মিথ্যা নয়। সমস্ত মন তার লোভে আতুর হয়ে উঠেছে একটুখানি গান শোনার জন্য। জানে বার বার এ পল্লীতে আসা চরিত্র দুর্বলতার লক্ষণ, জানে বারনারীর দরজায় গানের লোভে আসা দুর্নীতি, জানে এ চৌর্যবৃত্তি পুরুষের চিরদিনের স্বভাবদৈন্যের পরিচয়, এবং এও জানে নারীর এই আদিমতম ব্যবসা পুরুষের অসামাজিক আসক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু তবু সুধাংশু যেন একটা অজানা, অস্পষ্ট ও অন্তর্গূঢ় অনুরাগে অনুপ্রাণিত হয়ে তস্করের মতো নীচের তলাকার অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে এসে দাঁড়ালো।

ফ্ল্যাটবাড়ির উপরতলায় উঠবার পথ একটা নয়। এপাশে ওপাশে নানাদিক দিয়ে প্রবেশপথ চলে গেছে। সেগুলি যেন আসক্তির অন্ধ গুহাদ্বার—হাতছানি দিয়ে যেন কেবল ভিতর দিকেই ডেকে নিতে চায়। পূবদিকের দরজাটা দিয়ে সুধাংশু ভিতরে ঢুকে গেল।

ভিতরে অনেক দিকেই নানা নরনারীর কণ্ঠের অস্ফুট ও অসংলগ্ন কলরব। এখানকার জগতের ভাষা বিচিত্র, আগে সুধাংশুর জানা ছিল না। এখানেও দুঃখ আছে, দুর্যোগ ও দারিদ্র্য আছে, উৎপীড়ন ও অন্তর্জ্বালা আছে। কিন্তু তার বাহ্যপ্রকাশ প্রমত্ত উ[illegible]নায় ভরা।

নীচেটায় আলো কম। সুবিধার কথা এই, অনেক রাতে তালাচাবি পড়ার আগে অবধি এখানে কারো গতিবিধির খবর কেউ রাখে না। দিনের বেলায় হয়ত সুধাংশুকে যারা চিনতে পারতো, রাত্রের দিকে তারা নিরুদ্দেশ। উপর দিকে লক্ষ্য করে সুধাংশু দেখলো, নীনার ফ্ল্যাটটা আলোয়-আলোয় ঝলমল করছে। সে বাঁ-দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে

লাগলো। এ অংশটার গরীবানা চোখের উপরেই প্রকট। সাজসজ্জা আভরণ কম, সম্ভবত ভাড়াও অল্প। এদিকে দোতলায় থাকে শ্যামলী।

কিন্তু শ্যামলীর দরজার কাছে এসে ভদ্রবেশী সুধাংশুকে থমকে দাঁড়াতে হোলো। ভিতরের আলোটা স্পষ্ট, এবং তার আভাসটা বাইরে এসে প'ড়ে সুধাংশুকে তার নিজের কাছেই যেন খানিকটা আড়ষ্ট ক'রে তুললো। সহসা ভিতর থেকে গানের আওয়াজ পেয়ে সে সেখানেই একবার থমকে দাঁড়ালো। কণ্ঠস্বর শ্যামলীর সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় সেই কীর্তন, কোথায় সেই কৃষ্ণবিরহিণীর রসাবিষ্ট কণ্ঠস্বর? এ গান তো সে গান নয়! এ শ্যামলী তো সেই শ্যামলী নয়? বারবনিতা আপন প্রণয়ীকে খুশী রাখার জন্য চিরদিন ধ'রে যে-চটুল ভাষাকে লালসরসের স্বরে রূপায়িত করে, এ তো সেই গান! আনন্দের বদলে আলোড়ন, হৃদয়বেদনার বদলে উন্মত্ততা, আধ্যাত্ম অনুরাগের বদলে চিত্তচাঞ্চল্য! স্বপ্নটা গেল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে।

কৃষ্ণবিরহিণীকে খুঁজতে এসেছিল সুধাংশু, এসে দেখলো বার-বনিতাকে। দিব্যচক্ষে দেখলো বিনয় রয়েছে ভিতরে। এতক্ষণে আপন চিত্তের অন্তঃস্থল অবধি উপলব্ধি ক'রে সে দেখলো, এটা লোভ আর আসক্তির আসর--এখানে সবাই নিতে আসে ছিনিয়ে; এখানে ষোল আনার কারবারে দেনাপাওনাটাই বড়। কিন্তু সে এখানে এলো কী জন্যে! তা'র তো কোনো পাওনা নেই, সে তো বিনয়ের সঙ্গে আত্মঅবমাননাকর প্রণয়-প্রতিযোগিতায় নামেনি! কোনো লক্ষ্য, কোনো কল্পনা, কোনো অভিসন্ধি নিয়ে এখানে আসবার কথা তা'র নয়। যদি এরপর কোনোদিন শ্যামলীর কাছে আসতেই হয়, তবে সে আসবে নিঃস্বার্থ অনুরাগ, নিষ্কলঙ্ক আনন্দ, ও নিষ্কাম ত্যাগবুদ্ধি নিয়ে। নৈলে এই তার শেষ!

সুধাংশু যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনিভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বড় রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ ক'রে এসে সে একখানা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে ভিতরে উঠে বসলো। বললে, ভবানীপুর।

তার ভিতরের নিশ্বাসটার সঙ্গে বাইরের বাতাসটাও ছিল যেন অবরুদ্ধ। বড় একটা সাপ তা'র একাগ্র দৃষ্টিদ্বারা যেমন ছোট হরিণকে মোহগ্রস্ত করে, ওই বারবনিতাদের পল্লীটি যেন তাকে ঠিক তেমনি ক'রে অভিভূত করেছিল। লোভ তার নেই, কিন্তু অবচেতনার ভিতরকার লোভবৃত্তিকে ওরা যেন খুঁচিয়ে তোলবার যাদু জানে। খোলা বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে সুধাংশু যেন বাঁচলো।

কিন্তু অন্ধকার মোটরের ভিতরে বসে রাজপথের আলোকমালার দিকে তাকিয়ে একই নারীর দুই রূপ তার চোখে ভাসতে লাগলো। নৃত্যকলাবতী কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীমতী রাধিকা, এবং অন্যদিকে চটুলস্বভাবা পঙ্কিলপ্রকৃতি একটি বারবনিতা। একদিকে আনন্দদায়িনী সঙ্গীতরূপিনী নারী, অন্যদিকে দেহবিলাসিনী পতিতা!